ব্যবহার ও ভাবসমষ্টির মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা কতক পরিমাণে প্রাচীন জার্ম্মানদিগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য এই সকল চিত্র কতক পরিমাণে কবিকল্পনাসুলভ আদর্শ চিত্র মাত্র—বর্ব্বরদিগের আচার, সংস্কারের মধ্যে ও জীবনপ্রণালীর মধ্যে যে একটা পাশব ভাব আছে, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থরূপে চিত্রিত হয় নাই। এই সকল আচরণপদ্ধতির ফলে সমাজের মধ্যে যে সকল দোষ সংক্রামিত হইয়াছিল আমি কেবল তাহার কথা বলিতেছি না—স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক বর্ব্বর ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থাও আমার মন্তব্যের বিষয় নহে। তাহাদের এই যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্খা, ইহার মধ্যে যতটা স্থূল পাশবভাব আছে, যতটা হৃদয়হীনতা আছে, তাহা থিয়েরীর গ্রন্থ পাঠে ততটা ধারণা করা যায় না। তথাপি যদি আমরা বিষয়টা তলাইয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব এই পাশবতা, এই দেহসর্ব্বস্বতা, এই স্থূলবুদ্ধি স্বার্থপরতার মিশ্রণসত্ত্বেও, স্বাতন্ত্র্যানুরক্তি একটি মহৎ ভাব। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হইতে এই ভাবের উদ্ভব। ইহা দ্বারা মানুষ নিজকে মানুষ বলিয়া উপলব্ধি করে; মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়, মানুষ নিজের স্বাধীন বিকাশে স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

জার্ম্মাণ বর্ব্বরদিগের দ্বারাই এই ভাব ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল। রোমীয় জগতে ইহা অজ্ঞাত ছিল, খৃষ্টীয় চর্চ্চে ইহা অজ্ঞাত ছিল, প্রায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে যেখানেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব দেখিবেন, সেখানেই ইহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পৌরতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ পৌরজনের স্বায়ত্তাধিকার। মানুষ তখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য যুঝিত না, যুঝিত পৌর অধিকার লাভের জন্য। সে তখন একটা জনসংঘের অঙ্গস্বরূপ ছিল, জনসংঘের কল্যাণার্থে নিজের ব্যক্তিগত অধিকার, ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। খৃষ্টীয় চর্চ্চেও সেই এক ব্যাপার। খৃষ্টীয় সংঘের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ, সংঘের বিধানের প্রতি অচলা ভক্তি, সংঘের আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটা তীব্রবাসনা, এই হইল খৃষ্টীয়চর্চ্চভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মূল আন্তরিক ভাব। অথবা এও বলা যায় যে মানুষের আত্মার উপর ধর্ম্মভাবের প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফলে, মানুষের মধ্যে একটা আত্মদানের ভাব, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মের বিধান শিরোধার্য্য করিবার ভাব জাগিয়া উঠিল। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব, সমস্ত বাধাবিপদ অবহেলা করিয়া কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য স্বাধীনতা চর্চ্চার ভাব রোমীয় জগতেও ছিল না, খৃষ্টীয় সমাজেও ছিল না। বর্ব্বরেরাই এই ভাবের বীজ আনিয়া আধুনিক সভ্যতার শৈশব ক্ষেত্রে বপন করিল। ইউরোপীয় সভ্যতার পরবর্ত্তী ইতিহাসে এই ভাবের লীলা এত বিরাট্, এত সহজলক্ষ্য, এত মহাফলপ্রসূ যে ইহাকে ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যতম মৌলিক উপাদান বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

আধুনিক সভ্যতা বর্ব্বরদিগের নিকট অন্য একটি দ্বিতীয় উপাদানের জন্য ঋণী। সেটি হইল আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার মধ্যে সামরিক সহায়তার চুক্তি বন্ধন। এই উপায়ে সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ সমাজের যোদ্ধৃ বৃন্দ মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ পরম্পরার সৃষ্টি হইল যাহার ফলে পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (এবং প্রথম প্রথম একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত সামাজিক সাম্যেরও) কিছু মাত্র ব্যতিক্রম না ঘটিয়াও সমাজের মধ্যে একটা ক্রমবিন্যস্ত

শ্রেণীবিভাগের প্রতিষ্ঠা হইল; এবং ইহা হইতেই পরে "ফিউডালিজ্‌ম্"-আখ্যাপ্রাপ্ত অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব হইল। মানুষের প্রতি মানুষের আসক্তি, বাহিরের কোনরূপ বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও, কোন প্রকার সাধারণ সামাজিক দায় বা কর্ত্তব্যের প্রেরণা-ভাবসত্ত্বেও এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির প্রতি এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির যে নিষ্ঠা, প্রীতি, ভক্তি, তাহারই উপর এই সম্বন্ধপরম্পরার প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন জনতন্ত্রে দেখিবেন কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সহিত স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে সম্পর্কিত নয়, সকলেই পৌররাষ্ট্রের সহিত সম্বদ্ধ; বর্ব্বরদিগের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হইত। প্রথমে, যখন তাহারা দলে দলে ইউরোপের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন দলপতির সহিত তাঁহার অনুচরবর্গের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এই ব্যক্তিগত বন্ধন স্থাপিত হইত। পরে এই বন্ধন আশ্রয়দাতা ভূম্যধিকারীর সহিত অধীন ও আশ্রিত প্রজা বা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ আকারে পরিণত হইল। সুতরাং মানুষে মানুষে স্বাধীন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ এই যে দ্বিতীয় মূলনীতি, ইহা বর্ব্বর দিগের নিকট হইতেই পাওয়া গেল।

এখন একবার জিজ্ঞাসা করি, যখন আমি আরম্ভেই বলিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা শৈশবাবস্থা হইতেই একটা বিচিত্র বিক্ষুব্ধ ও জটিল ব্যাপার, তখন কি সেটা ভুল বলিয়াছিলাম? ইহা কি সত্য নয় যে ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে যে যে উপাদান, যে যে শক্তি একত্র হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনকালেই একত্র দেখা দিয়াছে? আমরা সেই যুগে তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজ দেখিতে পাইলাম (১) রোমীয় সমাজের শেষ চিহ্ন স্বরূপ পৌরসমাজ; (২) খৃষ্টিয় সমাজ; ও (৩) বর্ব্বর সমাজ। এই তিন বিভিন্ন সমাজের গঠন প্রণালী বিভিন্ন, মূলনীতি বিভিন্ন, এবং অন্তঃস্যূত ভাব ও আদর্শ বিভিন্ন। একদিকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতার জন্ত অত্যুগ্র আকাঙ্খা, অন্তদিকে সম্পূর্ণতম বশত্যাস্বীকার; একদিকে সামরিক প্রধানবর্গের আধিপত্য, অন্যদিকে যাজকবর্গের আধিপত্য; সর্ব্বত্রেই পার্থিব ও অপার্থিব শাসন শক্তির একত্র সংস্থান। চর্চ্চের বিধিবিধান রোমীয় তন্ত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যবহারবিধি, বর্ব্বরদিগের অলিখিত রীতিপদ্ধতি—সমস্তই পাশাপাশি রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই নানা বিভিন্ন জাতি, ভাষা, সমাজ, রীতিনীতি, ভাব ও সংস্কারের সংমিশ্রণ বা একত্র সংস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ইহাতেই যথেষ্টরূপ প্রমাণিত হইতেছে যে আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার সাধারণ প্রকৃতি যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা ভুল হয় নাই।

অবশ্য ইহা নিশ্চয় যে এই বৈচিত্র্য ও বিরোধের দরুণ ইউরোপকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই কারণে ইউরোপের উন্নতি হইতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই কারণেই ইউরোপকে এত ঝটিকা দুর্য্যোগ সহিতে হইয়াছে। তথাপি ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ, জাতির পক্ষেও সেইরূপ, বিচিত্রতম সম্পূর্ণতম বিকাশের মূল্যস্বরূপ যে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, সমস্তই সহনীয়। মোটের উপর ইউরোপীয় সমাজের এই জটিলতা, এই সংক্ষোভ ও সংঘাতই, অন্যান্যদেশসুলভ সহজ শান্ত সরলতা অপেক্ষা, মানব জাতিকে উন্নতির পক্ষে অধিকতর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

অজন্তা

অজন্তা যাইবার দুই পথ আছে। জি, আই, পি রেলওয়ের মেন লাইনে জলগাঁও বলিয়া একটি বড় জংসন ষ্টেসন আছে। এইস্থান হইতে Tapti Valley Railway বাহির হইয়া আমালনির ও বারদৌলি দিয়া সুরাটে গিয়াছে। এই জলগাঁও ষ্টেসন নামিয়া মোটরে বরাবর অজন্তা যাওয়া যায়, জলগাঁও হইতে অজন্তা প্রায় ৪০ মাইল দূরে, একটি মোটর ভাড়া করিয়া যাইতে অনেক খরচ পড়ে। সেইজন্য অনেকে এ রাস্তা দিয়া যায় না, তাহারা যায় পাচোরা জংসনে নামিয়া। পাচোরাও জি, আই, পি রেলওয়ের মেন লাইনে একটি জংসন ষ্টেসন। এখান হইতে একটি ছোট রেলওয়ে বাহির হইয়াছে তাহার নাম পাচোরা জামনের রেলওয়ে, ইহা পাচোরা হইতে জামনের গিয়াছে। এই লাইনে পাহুর বলিয়া একটী ছোট ষ্টেসন আছে। এখান হইতে অজন্তা প্রায় ১০ মাইল; সুন্দর পাকা রাস্তা আছে; হাঁটিয়াও যাওয়া যায়, গরুর গাড়ীতেও যাওয়া যায়। গরুর গাড়ীতে মাত্র তিন চারি টাকা খরচ লাগে। কয়েক মাইল যাওয়ার পরই একটী ছোট নদী পাওয়া যায়—ইহা নিজাম রাজ্যের ঠিকানা; এখান হইতে নিজাম রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা ছিলাম ডাকবাংলোতে; যাহারা অজন্তা দেখিতে যায়, তাহারা সকলেই এই ডাকবাংলোতে থাকে। এখান হইতে অজন্তাগুহা তিন মাইলের কিছু উপর; কিন্তু গুহার নিকটে কোন গ্রাম না থাকায় এত দূরেই ডাকবাংলো করিতে হইয়াছে। ডাকবাংলোতে কেবলমাত্র থাকিবার স্থান পাওয়া যায়, রাঁধিবার জন্ম যাহা যাহা দরকার, তাহা গ্রামের বাজার হইতে খরিদ করিতে হয়। এই গ্রামের নাম ফরদাপুর। আহারের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র প্রায় সমস্তই এখানে পাওয়া যায়।

এই ডাকবাংলো ছাড়া এখানে নিজাম বাহাদুরের একটী Guest House আছে। হায়দ্রাবাদ হইতে যেসব বড় বড় অফিসার এখানে আসেন, তাঁহারা এই Guest হাউসেই উঠেন; আর যেমন বুঝিলাম, কোথা হইতে কোন শুভ্রচর্ম্মাবৃত ব্যক্তি আসিলে তিনিও এই অতিথিগৃহেই পদার্পণ করেন, ছোট বাংলোতে সে রকম লোকের পদধূলি প্রায় পড়ে না—বড় বাংলোতেই তিনি বিরাজ করিতে পারেন; কারণ হায়দ্রাবাদ রাজ্যে, বিশেষতঃ রাজ্যের সুদূর পল্লীগুলিতে নিজাম বাহাদুরের "আতিথ্য" পাওয়া প্রায় প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গের একটি birth right বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, সেইজন্য তাঁহারা নিজাম বাহাদুরের এই অতিথিশালাতেই শুভাগমন করিতে পারেন। অতএব ক্ষুদ্র ডাকবাংলোটী বিশেষভাবে কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবর্ণের লীলাস্থল। পীতবর্ণ বলিলাম, কারণ বম্বে হইতে অনেক চীন ও জাপানবাসী অজন্তার এই বৌদ্ধ গুহাগুলি দেখিবার জন্ম প্রত্যেক বৎসরই এখানে আসে। তাহারাও এই ডাকবাংলোতেই উঠে।

ডাকবাংলোতে একদিন মাত্র থাকিবার অনুমতি আছে। কিন্তু আমরা তিন দিন থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম অজন্তাগুহার Curator মহোদয়ের নিকট হইতে। তাঁহার

নাম শ্রীযুক্ত সৈয়দ আহাম্মদ ; ডাকবাংলোর নিকটেই তাঁহার অফিস, তাঁহার নিকট অজন্তাগুহা সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক ও চিত্রাদি আছে। টাকা জমা রাখিলে সে পুস্তকগুলি তাঁহার নিকট হইতে লইতে পারা যায়, যাইবার সময় পুস্তকগুলি ফেরত দিলেই টাকা ফেরত দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত আহম্মদ মহাশয়ের সহৃদয়তায় আমরা পুস্তকগুলি বিনামূল্যেই পড়িতে পাইয়াছিলাম। তিনি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, গুহার চিত্রগুলি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তিনি আমাদিগকে তাঁহার গ্যাসবাতি ব্যবহার করিবারও অনুমতি দিয়াছিলেন। গুহার মধ্যে এই বাতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাতি, হারিকেন বা মোমবাতি ব্যবহার করিবার অনুমতি নাই।

ডাকবাংলো হইতে তিন মাইল দূরে অজন্তাগুহা গুহাতে যাইবার রাস্তাটী ঘুরিয়া বেঁকিয়া পাহাড়ের গা ঘেসিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিয়াছে। রাস্তা পাকা—মোটরগাড়ী বেশ যাইতে পারে ; গরুর গাড়ীর ত কথাই নাই। এখানে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ শীতকালেই লোক আসে, এবং তখনই আসা উচিত, নতুবা কিছু কষ্ট ভোগ করিবার সম্ভাবনা আছে। বর্ষাকালে পাহাড়ী নদীগুলিতে খুব স্রোত থাকে, তখন নদী পার হওয়া কষ্টকর ; কারণ এই ছোট ছোট নদীগুলির উপর কোন পুল সেতু বা সাঁকো নাই, বর্ষা শেষ হইলেই নদীও শুকাইয়া যায় ; তখন মোটরও অনায়াসে যাইতে পারে। আবার গ্রীষ্মকালে এখানে অত্যন্ত গরম, তখন এখানে কিছুতেই আসা উচিত নহে মোটের উপর শীত কালই এখানে আসিবার উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষাকালে, পাহাড়ে, মেঘের ও বৃষ্টির, নদীর ও ঝরণার যে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় শীতকালে তাহা পাওয়া যায় না, তখন নদীও মরিয়া যায়, ঝরণাও শুকাইয়া যায়। তবে মানুষ সব সুবিধাই পাইতে পারে না, এক সুবিধা পাইলে হয়ত দ্বিতীয় সুবিধা জুটে না।

ধন্য সেই বৌদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার যিনি গুহার জন্য এই পাহাড়টী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। পাহাড়টী খাড়া আকাশের দিকে উঠিয়াছে, তাহার তলদেশ দিয়া একটী ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে ; নদীর অপরদিকে আবার তেমনই একটী খাড়া পাহাড় সম্মুখ হইতে গুহাগুলিকে যেন যত্ন করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই দুইটী পাহাড় যাইয়া মিলিয়াছে এক কোণায়, সে স্থানটী খুব উচ্চ। বর্ষাকালে সেখান হইতে জল ঝরণার ন্যায় অনবরত নীচে নদীতে আসিয়া পড়িতেছে ; এই জল লইয়াই এই ছোট নদীটীর উৎপত্তি ; নদীটী দুইটী পাহাড়ের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া বাহিয়া চলিয়াছে। এই নদীটীই গুহাতে পঁহুছিবার একমাত্র পথ। পিছন হইতে আসা যায় না, সম্মুখ হইতেও আসা যায় না ; আবার একদিক পাহাড়ে বন্ধ ; এই ছোট নদীটী দিয়াই এখানে আসিতে হয়, আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। সেইজন্যই বলিতেছিলাম বর্ষাকালে এখানে আসা কষ্টকর—কারণ তখন এই পাহাড়ী নদীতে খুব স্রোত থাকে ; নদীর মধ্য দিয়া আসিতে কষ্ট হয়, তাহাতে বিপদও আছে।

এই প্রকার দুর্গমস্থানে গুহাগুলি প্রায় এক হাজার বৎসর লুকান ছিল, লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে থাকিয়া এই বিশ্ববিখ্যাত গুহাগুলি ধীরে ধীরে বিস্মৃতির করাল কবলে অন্তর্হিত হইতেছিল। পরিব্রাজকাচার্য্য হুয়েন সাং ভারতে আসিয়া অনেকস্থানই দেখিয়া

ছিলেন এবং তাহাদের বিবরণও দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কি জানি কি কারণে তখন তিনি অজন্তায় আসিতে পারেন নাই—সেইজন্য তাহার কোন বিবরণও লিখিয়া যান নাই। তবে তিনি তখন লোকমুখে নিশ্চয়ই অজন্তার কথা শুনিয়াছিলেন; তাই তিনি ইহার কথা উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে ইহা এক প্রসিদ্ধ স্থান, অনেক ভিক্ষু এখানে বাস করেন এবং অনেক ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিতে আসে। তাহার পর কত বৎসর অতিবাহিত হইল, পাঠান গেল, মোগল গেল, অজন্তাও ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। কেহই ইহার কথা কিছু জানিত না, একমাত্র হুয়েন সাংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তেই ইহার একটু উল্লেখ ছিল; ক্রমে ক্রমে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকের নানারূপ সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ এই হারাধনের খোঁজ পাওয়া গেল। এক ইংরেজ শীকারী কর্ত্তৃক দৈবক্রমে ইহা আবিষ্কৃত হইল। তিনি ছিলেন খান্দেশের মাজিষ্ট্রেট, তিনি একবার এই অঞ্চলে শীকার করিতে আসিয়াছিলেন; শীকার করিতে করিতে পথ হারাইয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়েন। পার্ব্বত্য প্রদেশ, জঙ্গলে ও হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ, রাস্তাঘাট কিছুই নাই—তিনি দলভ্রষ্ট হইয়া একাকী পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর পথ দিয়া তিনি যেখানে আসিলেন সেখান হইতে আজ আমরাও এই অদ্ভুত গুহাগুলি দেখিতে পারি। অধিকাংশ গুহাই তখন গাছপালা ও শৈবালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র দুই একটী গুহার প্রবেশদ্বার তিনি আবিষ্কার করিতে পারিলেন। খান্দেশে ফিরিয়া যাইয়াই তিনি বম্বে গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার এক আবিষ্কার সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখিতে লাগিলেন। বম্বে সরকার নিজাম সরকারকে জানাইলেন; তখন নিজাম বাহাদুর এই মাজিষ্ট্রেট মহোদয়কেই এই গুহাগুলির উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। গুহাগুলির উদ্ধারের জন্য নিজাম সরকারকে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে—কিন্তু তাহা না করিয়া কোন উপায় ছিল না; ব্রিটিশ সরকার আভাষে বেশ স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছিল যে নিজাম সরকার গুহাগুলিকে ভালভাবে রক্ষা না করিলে ব্রিটিশ সরকারকে তাহা করিতে হইবে; অর্থাৎ স্থানটী ব্রিটিশের অধীনে আসিবে। গুহাগুলির অধিকারী হওয়া এক মহান গৌরবের বিষয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; নিজাম বাহাদুর তাহা বুঝিয়াছিলেন। গুহাগুলির সংস্কারের জন্য নানা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; এবং যে সকল শিল্পী ইহাদের সংস্কারের জন্য বা চিত্রের নকল লইবার জন্য আসিয়াছিলেন, নিজাম সরকার হইতে তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করা হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার।

দুর্দ্দম

যে আঁধারে কৃষ্ণা রাতি আমায় ঢেকে দিলে,
তারি বিরাট গহ্বর-তলে দাঁড়িয়ে করি গান—
ধন্য তুমি!—কোন্ দেবতা আমায় দিয়েছিলে
অজেয় এই প্রাণ।
গ্রহ যখন নিদয় হ'য়ে বুকে বসায় জাঁতা,
হইনে অধীর, কাঁদিনে ত' কাতর করুণ স্বরে,
অদৃষ্টেরি লাঠির ঘায়ে নোয়াইনে ত' মাথা—
রক্ত যখন ঝরে।
হেথাকার এই অশ্রুজল আর অভিশাপের শেষে
জাগে আবার অজানা সেই অন্ধকারের ত্রাস।—
মহাকালের চোখরাঙানি উড়াই তবু হেসে,
নই যে ভয়ের দাস।
জীবন জাঙ্গাল পদে পদে হোক্ না সে দুর্গম,
এই ললাটে থাক্ না লেখা যতই ভীষণ সাজা—
ভাগ্য তবু আমার অধীন, আমি যে দুর্দ্দম!
আমিই আমার রাজা।

শ্রীমোহিত লাল মজুমদার

ভাষা সমস্যা

বাইবেলে বর্ণিত টাওয়ার অব্ বেবেল (Tower of Babel) গল্পে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তির যে কারণ লিখিত আছে, তাহার মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। তবে বোধ হয় ভাষাবিভিন্নতার ফলে মানব জাতিকে যে প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা স্মরণ করিয়াই বাইবেল রচয়িতা এই গল্পে বলিয়াছেন যে ইহার মূলে রহিয়াছে দৈব অভিশাপ। ডাক্তার মারে বলেন, অতি প্রাচীনকালে সমগ্র জগতে মাত্র একটী ভাষাই প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সেই ভাষা হইতে বহুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। আদিম যুগের প্রবণতা ছিল ভাষাবৃদ্ধির দিকে। যে কারণেই হউক, বহুভাষা উৎপন্ন হইয়া মানুষের ভাবের আদান প্রদানের যথেষ্ট ব্যাঘাত সাধন করিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন দেশের উপর একটী

---

* ইংরাজী হইতে।

রাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার এবং কয়েকটী উৎকৃষ্ট ভাষার অত্যধিক প্রচলনের ফলে অনেক ভাষা লোপ পাইতেছে। বর্ত্তমান সভ্য জগতে ভাষা বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতির জন্য একটী ভাষা সংগঠন। অতি দূর ভবিষ্যতে ইহা যে হইবে না, তাহা বলা যায় না।

এটুকু ঠিক যে এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করা খুবই কঠিন। আধুনিক মানব সমাজে এত ভাষা বর্ত্তমানে যে তাহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা এক প্রকার অসম্ভব। ডাক্তার স্যোম্ জগতের ভাষাগুলিকে ৭৬টী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার এক একটী বিভাগে এত ভাষা যে তাহাদের একত্র করিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। একটী বিভাগের উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম। আর্য্যভাষা বিভাগ :—(ক) ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহ, (খ) ইরাণীয়ান ভাষাসমূহ, (গ) কেল্‌টিক ভাষাসমূহ, (ঘ) ইটালিয়ান ভাষাসমূহ (ঙ) থ্র্যাকিয়ান্ ও আলবানিয়ান ভাষা, (চ) গ্রীক ভাষাসমূহ, (ছ) লেটোস্লাভনিক ভাষাসমূহ, (জ) টিউটনিক ভাষাসমূহ। ইহার এক একটী উপবিভাগের মধ্যেও আবার বহুসংখ্যক ভাষা বিদ্যমান।

ভাষাবিভিন্নতা দেশের জাতীয় ঐক্যসাধনের একটী বিশেষ অন্তরায়। অধিকাংশ স্বাধীন দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটী প্রধান প্রচলিত ভাষা আছে। তবে একটী দেশে অনেক গুলি ভাষার প্রচলন দেখিতে হইলে ভারতবর্ষই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০টী ভাষা কথিত হয়। প্রধান প্রধান কয়েকটী ভাষায় কত লোক কথোপকথন করে তাহার তালিকা দিতেছি :—

হিন্দী	৮ কোটী	২০ লক্ষ	
বাংলা	৪ ,,	৮৩ ,,	৭০ হাজার
তেলেগু	২ ,,	৩৫ ,,	৪০ ,,
মারাঠী	১ ,,	৯৮ ,,	১০ ,,
তামিল	১ ,,	৮১ ,,	৩০ ,,
পাঞ্জাবী	১ ,,	৫৮ ,,	৮০ ,,
রাজস্থানী	১ ,,	৪০ ,,	৭০ ,,
পশ্চিম হিন্দী	১ ,,	৪০ ,,	৪০ ,,
গুজরাটী	১ ,,	৬ ,,	৮০ ,,
ক্যানারিস্	১ ,,	৫ ,,	৩০ ,,
উড়িষ্যা	১ ,,	১ ,,	৬০ ,,
বার্ম্মীজ		৭৮ ,,	৯০ ,,
মালয়ালাম		৬৭ ,,	৯০ ,,
পশ্চিম পাঞ্জাবী		৪৭ ,,	৮০ ,,
সিন্ধি		৩৬ ,,	৭০ ,,
পূর্ব্ব হিন্দী		২৪ ,,	২০ ,,
সাঁওতালী		২১ ,,	৪০ ,,

পাশ্‌তো	১৫ "	৫০ "
আসামী	১৫ "	৩০ "
গন্দ	১৫ "	৩০ "
পশ্চিম পাহাড়ী	১৫ "	৩০ "
কাশ্মিরী	১১ "	৮০ "
কারেন	১০ "	৭০ "
শান্‌	৯ "	
ওরাওন্‌	৮ "	
মুন্দারী	৬ "	
টুলু	৫ "	৬০ "
খন্দ	৫ "	৩০ "
বালোক্‌	৫ "	
হো	৪ "	২০ "
বিহারী	৪ "	২০ "
আরাকাণী	৩ "	৯০ "
মণিপুরী	৩ "	১০ "
ইংরাজী	৩ "	? "

এখানে ইংরাজী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশুক। ইংরাজী যাহাদের মাতৃ-ভাষা কেবল তাহাদেরই সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। ইংরাজীজানা লোকের সংখ্যা ধরিলে আরও অনেক বেশী হইবে। শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই ইংরাজীতে কথোপকথন করিতে পারেন। মাদ্রাজে সামান্ত কুলী মজুরেরাও ইংরাজী ভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারে। ইহাদের সংখ্যাও খুব কম নহে।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক জাগরণের দিনে এই ভাষাসমস্যা ভারতবাসীর মন বিচলিত করিয়াছে। দেশের নেতৃবৃন্দ বলিতেছেন যে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন প্রদেশবাসীগণের জন্য একটী বিশেষ ভাষা নির্দ্ধারণ করা আবশুক। অনেকের মতে হিন্দী এই কার্য্যের জন্ত সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। কিন্তু যে ভাষাকেই এই সম্মানীয় স্থান প্রদান করা হউক, প্রত্যেক ভারতবাসীকেই নিজের প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি কোন ভাষাবিশেষকে এই উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিলে অন্য ভাষাবলম্বীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষার দাবী উত্থাপন করেন, তবে তাহা দেশপ্রেমিকতার পরিবর্ত্তে মনের সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্ষুদ্র ভাষাসমূহের বিলোপ সভ্যতাবিস্তারের একটী প্রধান অঙ্গ। যিনি যে ভাষায় কথোপকথন করেন, তিনি যদি তাহার ত্রুটী সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত রাখিবার জন্ত চেষ্টা করেন, তবে বিলোপের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত ছি । আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা আইরিস্‌ ভাষা

ব্যবহার করিত। স্কট্‌ল্যাণ্ডে কথোপকথনের ভাষা ছিল গেলিক। ওয়েল্‌সে ওয়েলশ ভাষা প্রচলিত ছিল এবং ম্যান দ্বীপে একটী নূতন ভাষা উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আয়ারলণ্ডে শতকরা মাত্র ১৪ জন আইরিস ভাষা ব্যবহার করে। ডি ভ্যালেরা ও তাঁহার সহকর্ম্মী সিন্‌ফিনগণ কিছুদিন উক্ত ভাষা পুনঃ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রিষ্টেট্‌ স্থাপনে তাহার সাফল্যের অংশা নির্ম্মূল হইয়াছে। ১৭০৭ সালে ইংলণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডের সম্মিলনের পর হইতে স্কট্‌ল্যাণ্ড গ্রেট্‌ব্রিটেনের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। এখন উক্ত দেশে শতকরা মাত্র ৫ জন গেলিক ভাষায় বাক্যালাপ করেন। ওয়েল্‌স্‌ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যথেষ্ট জাতিগত প্রভেদ; উভয়ের পূর্ব্বপুরুষ পর্যান্ত এক নহে। যদিও ওয়েলসে এখনও শতকরা ৪৪ জন দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন, তথাপি সে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইংরাজি বলিতে পারেন। ম্যান দ্বীপ হইতে দেশীয় (Manx) ভাষা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ একটা ক্ষমতাশালী ভাষার সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষায় অবনতি ও ক্রমে বিলুপ্তির উদাহরণ প্রায় সমস্ত সভ্যদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ যেন ঠিক ইতিহাসের বলশালী রাজার রাজ্য বিস্তার!

ভারতবর্ষে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার বিলোপ বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়। ইহা যে একেবারে না হইতেছে তাহাও নয়। বিভিন্ন প্রদেশে উপভাষাগুলি ক্রমেই লোপ পাইতেছে। বাংলা ভাষার অনেক উপভাষা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কথিত হয়। কিন্তু ক্রমে কলিকাতার ভাষাই Standard dialect হইয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে।

কিন্তু এইরূপে বহু উপভাষার বিলোপ হইলেও অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষা জীবিত থাকিবে। যে ভাষার সাহিত্য নাই, তাহার ধ্বংস অসম্ভব নহে। কিন্তু যে ভাষাতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহা সহজে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষে বাংলাভাষার জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয়। তাহার পরেই বোধ হয় হিন্দি ভাষার স্থান। সংখ্যা হিসাবেও হিন্দির স্থান বাংলার অনেক উচ্চে। ডাক্তার গ্রিয়ারসন বলেন "Literary Hindusthani as distinct from vernacular Hindusthani is current in various forms as the language of polite society and as a lingua franca over the whole of India proper. It is also a language of literature, both poetical and prose ভারতবর্ষের ভাষাগুলির মধ্যে যদি কোনও একটীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে হিন্দি ও বাংলা ভাষার দাবী সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

এখানে আরও একটা বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। যেমন একটী দেশের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিদিগের মধ্যে কথোপকথনের জন্য একটী রাষ্ট্রীয় ভাষা national language) আবশ্যক, তেমনি বিভিন্ন দেশের অধিবাসিদিগের মধ্যে বাক্যালাপের জন্য একটী আন্তর্জাতিক ভাষাও (international language) অতীব প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষীয় কোনও ভাষাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা স্বরূপ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক ভারতবাসীকে তিনটী ভাষা শিখিতে হইবে—(১) মাতৃভাষা, (২) রাষ্ট্রীয় ভাষা ও (৩) আন্তর্জাতিক ভাষা।

আমরা এখন 'থিওরি' লইয়া আলোচনা করিতেছি। বর্ত্তমানে জগতে কোন আন্তর্জাতিক ভাষা নাই; অদূর ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ। কোন্ ভাষাকে এই মহামান্য স্থান দেওয়া হইবে সে বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ একমত নহেন। অধ্যাপক অটো জেস্‌পারসন বলেন That international language is best which is easiest for the greatest number of men," ডাক্তার সুইটের মতে, প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্য হইতে সুবিধামত একটী ভাষা নির্ব্বাচন করিয়া লইলেই ভাল হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন স্বভাবজ (natural) ভাষা দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব হইবে না সেইজন্য ১৮৮০ অব্দে ভলাপুক্ (Volapuk) ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। তারপর ১৮৮৭ অব্দে রাসিয়ার ডাক্তার জামেনহক্ এস্‌পারেন্টো (Esperanto) ভাষা প্রবর্ত্তন করেন। ১৯০২ অব্দে এই ভাষা ইংলণ্ডে প্রণীত হয় ও ১৯০৭ অব্দে ইহার বিশেষ প্রচলন হয়। একজন ভাষা তত্ত্ববিদ্ বলেন যে Esperanto "is the most reasonable and practicable artificial language that has yet appeared." এই ভাষার প্রসারের জন্য এখনও বহুস্থানে Esperanto society আছে। ১৯০২অব্দে ইডিয়ম্ নিউট্রাল (Idiom neutral) নামে আর একটী আন্তর্জাতিক ভাষা গঠিত হয়। ডাক্তার সুইট বলেন "There can be no doubt Idiom Neutral is the simplest language that has yet been devised and most *easily understood by any educated European.*"

ইউরোপীয়গণ এখনও কোন আন্তর্জাতিক ভাষা গ্রহণ করেন নাই। উপরোক্ত তিনটী ভাষার মধ্যে কোন একটীরও গৃহীত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বর্ত্তমানে প্রচলিত ভাষা গুলির মধ্যে ইংরাজীই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। বাণিজ্য উপলক্ষে ইংরাজী ভাষা অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়। তথা কথিত ''পিজিয়ন্' (pigeon) ইংরাজী—যাহাতে লোকে ব্যাকরণ শুদ্ধির দিকে দৃষ্টি প্রদান করে না—নানাস্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীন ও জাপানেও ইংরাজী যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইংরাজীতে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং মনে হয়, ইংরাজীকে আন্তর্জাতিক ভাষার মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত করিলে বিশেষ অশোভন হয় না।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা এক অথবা বিভিন্ন হইবে সে বিষয়ে বিচার করিয়া বলা সুকঠিন। আমাদের মনে হয়, এ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপের সহজ উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। বিশ্বমৈত্রী সাধন করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য দ্বার উদ্‌ঘাটন করা নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়।

কবিতার স্বরূপ

কলাবিদ মাত্রেই স্রষ্টা। কবি কলাবিদ্; কাজেই কবিও স্রষ্টা। কবির সৃষ্টির ইতিহাস একটু বিভিন্নপ্রকারের। কবি একাধারেই স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। কবি দেখেন, সৃষ্টি করেন এবং নূতন বাণী শুনাইয়া যান। দেখা হিসাবে, সাধারণ মানুষ যা দেখেন কবিও তাই দেখেন; কিন্তু সাধারণ মানবের দর্শনশক্তি অপেক্ষা কবির দর্শনশক্তি একটু উন্নত, একটু তীক্ষ্ণ, একটু কল্পনা-প্রবণ। কবি ভাবুক। ভাবপ্রবণতার রঙিন্ কাঁচের ভিতর দিয়া কবি বাহ্যপ্রকৃতিকে দেখেন। কাযেই বাহ্য প্রকৃতি যেখানে সাধারণের কাছে বৈচিত্র্যহীন, শুভ্র ও দৈনন্দিন, কবির নিকট তাহা বৈচিত্র্যময়, রঙিন্ ও অভিনব। একটী সামান্য লালফুল, যা শত শত নরনারীর নয়নের অন্তরালে তাহার ক্ষুদ্র রক্তিম জীবনের মধুর কয়টী দিন নীরবে কাটাইয়া দেয়, কবির নিকট সে একটা নূতন জগতের ভাবময় সৌন্দর্য্যরাশির বার্ত্তা আনিয়া দেয়। কবির প্রাণবীণায় একটা আঘাতের রেশ বড় মধুর ভাবে বাজিতে থাকে যে আঘাত কবিকে বাহ্য প্রকৃতির ভিতর একটা নূতন রসের সন্ধান বলিয়া দেয়। এই ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাপ্রিয়তা কবিকে সাধারণ মানুষের স্বরূপ হইতে ভিন্ন করিয়া দেয়।

কবির সৃষ্টি কবিতা। কবিতা কলাদেবীর কণ্ঠহারের একটী উজ্জ্বল রত্ন। কবিত্বকে কেন্দ্র করিয়াই জগতের সমস্ত চারুশিল্প বর্ত্তমান। চিত্রকর চিত্র লিখেন, কবিতাকে স্মরণ করিয়া। ভাস্কর মানসী প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন কবিত্বের প্রেরণা লইয়া। শিল্পী শিল্পসাধন করেন কবিতার দিকে চাহিয়া। চারু শিল্পের মধ্যে কবিত্ব না থাকিলে সৌন্দর্য্য থাকে না। সৌন্দর্য্য না থাকিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। সৌন্দর্য্য ও সত্যের মিশ্রণেই কলার উদ্ভব। সেইজন্য, কবিতা, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্যের মধ্যে একটা বড় নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। "কবিতা ভাবময়ী চিত্রকলা; চিত্রকলা মূক কবিতা।" ইহা ফরাসী সাহিত্যিক ভল্টেয়ারের উক্তি। জার্ম্মাণ কবি ও সমালোচক লেসিং এই উক্তির সার্থকতা দেখাইয়া লাওকুয়ান্ প্রবন্ধে কবিতা চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক এই তিনটী চারুশিল্প যেন কলাসরস্বতীর যমজ তনয়া। একই প্রেরণা, কেবল ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তি ভিন্ন। সেইজন্য প্রায়ই দেখা যায়, যে সুন্দর চিত্র দর্শনে কবির কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে। আবার কবির ভাবের নর্ত্তনের ভিতর চিত্রপাত দেখিয়া ভাবুক চিত্রকরের ও ভাস্করের তুলিকা ও যন্ত্র অনুপ্রাণিত হইতেছে; কলাবিদ্যার ইতিহাসে ইহা চিরন্তন কিন্তু অভিনব ব্যাপার।

কবিতার প্রাণ—ভাবপ্রবণতা ও কল্পনা। চিত্রের প্রাণ—ভাবপ্রবণতা ও কল্পনা, ভাস্কর্য্যের প্রাণ—ভাব প্রবণতা ও কল্পনা। শুধু তফাৎ এই, কবিতা সময় চায়, বলিবার জন্য। শ্রোতার কর্ণকে চায় শুনাইবার জন্য। চিত্র ও ভাস্কর্য্য স্থান চায় ফুটিয়া উঠিবার জন্য। দর্শকের চক্ষুকে চায় দেখাইবার জন্য।

ভাবপ্রবণতা, কল্পনা ও অনুভূতি না থাকিলে কবিতার প্রাণ থাকে না। জীবনীশক্তির প্রেরণার পরিবর্ত্তে থাকে মৃতদেহের হিম জড়তা। চিত্র ও কবিতার ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তি

ভিন্ন। কবিতার অভিব্যক্তি ছন্দের ভিতর দিয়া, চিত্রের অভিব্যক্তি রেখার ভিতর দিয়া। ছন্দ ও রেখা কবিতার এবং চিত্রপটে রূপ এবং গতি দান করে। রেখার লীলা না থাকিলে চিত্রে গতি থাকে না। ছন্দের অবাধ স্ফুরণ না থাকিলে কবিতায় সচল গতি থাকেনা। কিন্তু অনেক সময় ছন্দ না থাকিলে কবির কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার আধিক্যে কবিতার রূপের হানি হয় না বটে কিন্তু সচ্ছল গতি না থাকিলে কবিতার অবস্থা হয় "খঞ্জ-রূপসীর" মত। "চলিতে বাধে চরণে!"

ভাবপ্রবণতা ও কল্পনা কবিতার প্রাণ। ভাবপ্রবণতা চিন্তা নয়। চিন্তাশীল কবিতা ভাবপ্রবণ নাও হইতে পারে। ভাবপ্রবণতা কবির নিজস্ব সামগ্রী, দার্শনিকের নয়, বৈজ্ঞানিকেরও নয়। দার্শনিক ভাবপ্রবণ হইলে তাঁহার দর্শন লেখা হয় না, চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকের শুষ্ক বক্ষেও ভাবপ্রবণতার স্থান নাই। ভাবপ্রবণতা কবিরই নিজস্ব। তাই দেখি কবির চক্ষু জলে ভরা। শুধু আর্ত্তের কাতরতা দর্শনে নয়; পথের ধারের অজানা ফুল যখন পথ-চলা পথিকের পায়ের নীচে দীর্ণ হয়, তখন সেই ফুলটীর জন্যও কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কবি ভাবপ্রবণ বলিয়াই কবিতা শ্রোতার প্রাণে বড় শীঘ্র আঘাত করে। একটী সামান্য কবিতা অতি শীঘ্র অনেক বড় কথা বুঝাইতে সক্ষম হয়। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই ভাবপ্রবণতাকে কবিতার মধ্যে অতি উচ্চ স্থান দিতেন। তাঁহার নিকট নির্জ্জনের চিন্তার পর ভাবপ্রবণতার অবাধ উচ্ছ্বাসই কবিত্ব। শুধু ওয়ার্ডসওয়ার্থ নন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের সমস্ত ইংরাজ কবিই ভাবপ্রবণ।

তারপর কল্পনা; কল্পনা না থাকিলে কবিতা উচ্চ আকাশের অনন্ত নীলিমায় অবাধ সঞ্চরণ করিতে পারে না। মাটীর ঘাসের উপরই পড়িয়া থাকে। ইংরাজ কবি শেলি কবিতার ভিতর কল্পনাকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কল্পনার চরম বিকাশই তাঁহার নিকট কবিত্ব। চিত্রে পরিকল্পনা না থাকিলে তাহাতে এমন সচল লীলা থাকেনা; কবিতায় কল্পনা না থাকিলে তাহাতে মোহিনী শক্তির অভাব বোধ হয়।

প্রথমেই বলিয়াছি, কবি স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। দ্রষ্টার কার্য্য পুরণ হয় এই কল্পনার ভিতর দিয়া। কবি শুধু সুন্দর চারু শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার ভিতর দিয়া এমন কিছু বলিয়া যান যা এখন নাই, ভবিষ্যতে হইবে। যার বাণী তিনিই প্রথম দান করেন। কীট্‌সের "হাইপীরিয়ন্", শেলির "প্রমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড" বা রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" শুধু 'আর্টের' অমর নিদর্শন নয়, তাহার অদূর ভবিষ্যতের নূতন যুগের আগমনীরও ঘোষণা। কবির কল্পনা-ঝোরা অফুরন্ত। অফুরন্ত বলিয়াই কবিতার গতি অবাধ। কবিতা চলিতে চায় অবাধে। থামিতে চায় না। কবিতার ভিতর বেশী মাত্রায় চিন্তা বা উপদেশের স্পৃহা থাকিলে কল্পনার উদ্দাম চলাফেরা থাকে না। কাজেই কবিতার উদ্দেশ্য অনেকটা অসিদ্ধ থাকিয়া যায়।

কবিতার উদ্দেশ্য কি? কবিতা—আর্ট—কলা। সমস্ত কলাবিদ্যার যা উদ্দেশ্য কবিতারও তাহাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ আনন্দদান। আনন্দদানের অর্থ ইহা নয় যে কবিতা শুধু হাস্যরসের সৃষ্টি করিবে। কবিতা প্রাণের এমন একটী গোপন তন্ত্রীতে আঘাত করিবে,

যেটা কোন দিন বাজে নাই, কেহ বাজায় নাই। সেই বাজনার মৃদু রেশই প্রাণের রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত করিয়া পুলক উচ্ছ্বাস তুলিবে। ইহাই রসপ্রিয়ের আনন্দলাভ। সৌন্দর্য্যই সেই আনন্দ রস-প্রিয়ের মনে আনিয়া দেয়। কাজেই একরকম ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে আর্টের বা কবিতার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের স্ফূরণ। যাহাতে সৌন্দর্য্য নাই তাহাতে আনন্দ পাওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চিন্তা

কহ মোরে, হে তারকা, প্রসারিয়া আলোকের রেখা
কোথায় চলেছ ভাসি সুনীল আকাশে অবিরাম,
গন্তব্যের সীমা তব আঁখিপথে দিতেছে কি দেখা,
শ্রান্ত পক্ষ সংপুটিয়া যথা তুমি লভিবে বিশ্রাম ?

কহ মোরে, শশধর, হেরিয়াছি সতত যাহারে
উদাসীন পান্থপ্রায় ছায়াপথে যেতে ভেসে ভেসে,
কোন্ দূর অজানিত গুহামাঝে, আলো বা আঁধারে
হে প্রিয়দর্শন যাত্রী, বিরাম লভিবে অবশেষে ?

কহ মোরে, প্রভঞ্জন, আকাশেতে সদা ভ্রাম্যমান,
দরিদ্র অভাগা যেন-নাহি গৃহ নাহিক আশ্রয়—
নাহি কি কোথাও তব শান্তিময় বিশ্রামের স্থান
গভীর অরণ্য কিম্বা সাগরের ফেনিল হৃদয় ?

কহ মোরে, হে তরঙ্গ, আসি রঙ্গে নাচি তালে তালে
গিরিগাত্রে আছাড়িয়া গর্জ্জিতেছ বিরাম-বিহীন,
নাহি কি কোথাও দূরে—চক্রবাল-রেখা-অন্তরালে
কূল কোন যথা তুমি ধীরে ধীরে হইবে বিলীন ?

আর তুমি, রে অশান্ত হৃদয় আমার, কহ মোরে,
তরঙ্গ, উন্মত্ত বায়ু, পরাজিত নিকটে যাহার,
নাহি কি কোথাও স্থান—ইহলোকে কিম্বা লোকান্তরে
যথা আছে তোর তরে—বিস্মৃতি ও শান্তির আগার ?

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ।

---

* Auguste Lacaussade রচিত ফরাসী কবিতার কুমারী তরু দত্ত কৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

বাইবেল ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম উভয়ই প্রেমভক্তির ধর্ম্ম, উভয় ধর্ম্মেরই একই লক্ষ্য—একই সাধনা এবং এক সাধ্য। সুতরাং দুই ধর্ম্মের মধ্যে যে বিশেষভাবে সাম্য দৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? অপর দিকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ সাম্য দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক জাতক হুবহু খ্রীষ্টের parableএ দেখা দিয়াছে—খ্রীষ্টীয় মাতৃমূর্ত্তি বা madonna ও বৌদ্ধ মাতৃমূর্ত্তি মূলতঃ যে এক, কেহ কেহ এরূপও অনুমান করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টীয় বিশপদের দীর্ঘ পরিচ্ছদ (gown) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বেশের অন্য সংস্করণ বলিলে চলে। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে পাপখ্যাপনপ্রণালী বৌদ্ধ পাপখ্যাপনের রূপান্তর মাত্র। মতবাদ ও সংঘগঠনপ্রণালী উভয় ধর্ম্মে এক প্রকারের। Lille তাঁহার India in Primitive Christianity গ্রন্থে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে নানা সমতা দেখাইয়াছেন। ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বৌদ্ধনীতি ও খ্রীষ্টনীতি যে এক, তাহা কতিপয় বক্তৃতায় প্রমাণ করিয়াছেন। বার্ণুফ প্রমুখ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতবর্গও খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বৌদ্ধপ্রভাব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা জানি মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের সীমা লঙ্ঘন করিয়া বোখারা, সমরখন্দ, তিব্বত, চীন, এমন কি ব্যাবিলন (জাতকের বাভের), সিরিয়া ও মিশরদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই বৌদ্ধধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্মের মধ্যে নূতন Essene সম্প্রদায়ের গঠন করে—Essene Judaismই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল। জগতে কোন ধর্ম্মই হঠাৎ উদয় হয় না—সর্ব্ব ধর্ম্মের মূলে একটী ক্রমবিবর্ত্তন দেখা যায়। ধর্ম্ম কখন হঠাৎ গড়িয়া উঠে না—যাহা গড়িয়া উঠিতেছে অবতারেরা তাহাকে সম্পূর্ণতা দিয়া যান। গৌতম বুদ্ধের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম গড়িয়া উঠিতেছিল। বৌদ্ধগণ এজন্য গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে অসংখ্য বুদ্ধের কল্পনা করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বহুপূর্ব্বেই Essene Jewগণ খ্রীষ্টের মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছিল—পুরাতন Semitic ধর্ম্ম হইতে সারগ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে অসার আবর্জ্জনাময় মত ও রীতিনীতি দূর করিয়া দিয়াছিল। মহম্মদের ধর্ম্মে ইহুদী ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টের প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। চৈতন্যদেবের আগমনের বহুপূর্ব্বেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের জন্য সকলই প্রস্তুত ছিল, আচার্য্য অদ্বৈতের কথা সকলেই জানেন; মাধবেন্দ্র পুরী পূর্ব্ব হইতে স্বীয় জীবনে, চৈতন্যদেব সাধনার যে ক্রম অবলম্বন করেন, তাহাও সাধনা করিয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম্মমত আকাশ হইতে উদ্ভূত হয় না—তাহার ইতিহাস আছে, উৎপত্তি ও বিকাশের বিশেষ নিয়ম আছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে রাম না হইতে রামায়ণ হওয়াই স্বাভাবিক—ইতিহাসজ্ঞেরা ইহা বিশেষভাবেই জানেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বাইবেল সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে নানা কথা উঠিতে পারে। প্রথম কথা—উৎপত্তির কথা। কেহ কেহ বলেন—ভক্তির কথা এদেশে পূর্ব্বে ছিল না; ভারতবর্ষ বৈদিক প্রভাবের দেশ—যাগযজ্ঞমূলক ধর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম; যাগযজ্ঞের উপরে যে কথা, তাহা জ্ঞানমূলক। কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহাই ভারতের মৌলিক ধর্ম্ম। ভক্তির কথা এদেশের

কথা নয়—উহা খ্রীষ্টীয় প্রভাব। নারদ এদেশে ভক্তিশাস্ত্রের ঋষি ; তিনি শ্বেতদ্বীপ হইতে এ ধর্ম্ম ভারতে প্রচার করেন। এই শ্বেতদ্বীপ ভারতবর্ষের বাহিরে। সুতরাং ভক্তিধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব। কৃষ্ণের ধর্ম্ম খৃষ্টের ধর্ম্মের সংস্করণ মাত্র। বহুপূর্ব্বে Syrian খৃষ্টানগণ দক্ষিণদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। St. Thomas ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম নেতা। দক্ষিণদেশ হইতে এই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব কালে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। খৃষ্টের জীবন রূপান্তরিত হইয়া কৃষ্ণকথার উদ্ভব হইয়াছে—খৃষ্টের ধর্ম্মের রূপান্তর বৈষ্ণবধর্ম্ম। Growse সাহেব মথুরার ইতিহাসে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মে খৃষ্টীয় প্রভাব আছে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই লইয়া বিচারের পূর্ব্বেই যদি দেখান যায় যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে কতক গণ্ডগোল পূর্ব্বেই মিটিয়া যায়। অনেকেই মনে করেন বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল নীতির সমষ্টি মাত্র (Ethical code)। কিন্তু কালে এই ধর্ম্মে ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব কিরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার সংবাদ অনেকেই রাখেন না। ডাঃ বড়ুয়া বলেন বৌদ্ধধর্ম্মে বহু ভক্তিগ্রন্থ আছে—মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া যে তাহাদের অস্বীকার করিতে হইবে এরূপ হইতে পারে না। অশোকের ধর্ম্ম বিশেষভাবে ভক্তিমূলক, সুতরাং খৃষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্বেই ভক্তিবাদের অনুশীলন এদেশে যথেষ্ট হইয়াছিল। বৈদিকযুগেও ভক্তিবাদ যে আদৌ ছিলনা একথা বলা যায় না। উপনিষদের আনন্দবাদই ভক্তির মূল কথা। সুতরাং এদেশে ভক্তিতন্ত্রের প্রচার যে আধুনিক, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। ভক্তিধর্ম্ম যে খৃষ্টের প্রভাবপ্রসূত—ইহা আমরা উর্ব্বর মস্তিষ্কের অতি বিকৃত কল্পনা বলিয়াই মনে করি। এ বিষয়ে আমরা অন্য প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এই প্রবন্ধে কেবল খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে যে অদ্ভুত সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উভয় ধর্ম্মই ভক্তিমূলক ; উভয়ের সাধ্য ভগবান, সাধন প্রেমভক্তি। বৈষ্ণব চায় প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিতে, খ্রীষ্ট আসিলেন Kingdom of God স্থাপন করিতে। দুই ধর্ম্মে যে কেবল মতের মিল দেখা যায় তাহা নহে, এমন কি কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের যে আখ্যান, তাহাতেও মিল দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট নামের অদ্ভুত মিল ; পুনশ্চ কৃষ্ণের জন্ম কথা ও খ্রীষ্টের জন্মবিবরণে অদ্ভুতভাবে মিলিয়া যায়। কৃষ্ণের জন্মের সময় কংসের অত্যাচার—খ্রীষ্টের জন্মকালে Herodএর অত্যাচার। কংসের অত্যাচারে কৃষ্ণ যমুনার অপর পারে গোকুলে আশ্রয় লইলেন দুর্দ্দান্ত Herodএর অত্যাচারে খ্রীষ্টকে দেশত্যাগপূর্ব্বক মিশরে পলাইতে হইল। কৃষ্ণকে হত্যা করিতে না পারিয়া কংসের অনুচরবর্গগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—হে ভোজেন্দ্র, যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে যে সকল শিশুর বয়ঃক্রম দশদিন অতিক্রম করে নাই এবং যাহাদিগের দশদিন অতীত হইয়াছে—পুর নগর ব্রজাদিতে গমন করিয়া তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিব (ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৪অঃ)। অপরদিকে Herodএর শিশুবধের কথা সকলেই জানেন। ইহার পর খৃষ্টের জীবনের দ্বাদশ বৎসরের কথা আমরা কেহই জানি না। কোন্ গুরুগৃহে তিনি সাধনা করিতেছিলেন কে বলিবে ? ম্যাথু, মার্ক, লুক, জন সকলেই এ বিষয়ে নীরব। তিনি যখন পুনরায় দেশে ফিরিলেন তখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র। এই বালক তখন অগাধ পাণ্ডিত্যের

অধিকারী। তিনি জেরুসালেমে বড় বড় পণ্ডিতদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতেছেন। ইহার কিছু পরেই তিনি ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন।

যীশু যখন ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন তিনি একজন ধর্ম্ম সংস্কারক মাত্র। নূতন ধর্ম্ম প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যীশু যখন প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনি যে কোন নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন, একথা তাঁহারও মনের মধ্যে উদিত হয় নাই। প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্মের জঞ্জাল দূর করিয়া মৃতধর্ম্মে প্রাণ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ফ্যারিসিদের ভ্রষ্টাচার ও ভণ্ডামি তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আচারের অত্যাচার হইতে দেশকে বাঁচাইয়া তিনি দেশকে প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান দিতেছিলেন। Sermon on the Mountএ তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারকরূপে দেখিতে পাই—পরে দেখি তিনি ইহুদি ধর্ম্মের নিগড় ফেলিয়া এক বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। লেভিগৃহে যে দিন তিনি বলিলেন—পুরাতন কাপড়ে নূতন তালি চলে না—সে দিন স্পষ্টতঃই তিনি ইহুদী ধর্ম্মের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment and the rent is made worse. Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles and both are preserved. ফরাসী লেখক রেনানও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। যীশুর মৃত্যুর পর কেবল ইহুদীগণই খৃষ্টান হইতে পারিত, St Paulএর সময় হইতে অন্য সকলেই খৃষ্টান হইতে পারিত। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বজনীন ভক্তিমূলক ধর্ম্ম হইল, পরে খ্রীষ্টে দেবত্ব আরোপপূর্ব্বক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে সাম্প্রদায়িক খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মও প্রথমে সাম্প্রদায়িক। ইহাও ধর্ম্মের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প। ভক্তিশূন্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। জাতিভেদ, বর্ণভেদ—ভক্তির পূতস্পর্শে সকলই ঘুচিয়া যায়। বৈষ্ণব ধর্ম্মও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ন্যায় পতিতপাবন। যীশু যেমন পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন I am not come to call the righteous but the sinners to repentance. বৈষ্ণব আচার্য্যগণ সেইরূপ যবনচণ্ডাল ভেদ না করিয়া সকলকে আশ্রয় দিয়াছেন। পতিতাদের কোন সমাজেই স্থান নাই—কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মে তাহাদেরও অবারিত দ্বার।

ইহুদী ধর্ম্মে ঈশ্বরের যে কল্পনা দেখা যায় তাহাতে তাঁহার শক্তিমত্তা ও ঐশ্বর্য্যের গৌরবই বিশেষ ভাবে প্রকট। জীহোভা—তিনি বজ্র নির্ঘোষে কথা কন—বিধর্ম্মীদের সমূলে উচ্ছেদ করেন; বিপক্ষ বংশ ধ্বংসের জন্য দেশ উৎসন্ন করেন—অত্যাচারের পর অত্যাচারে দুর্জ্জনের নাশ করেন। যাহারা জীহোভার পূজক, তাহারা elect of the lord. ভগবানের অনুগৃহীত জাতি। ঈশ্বর নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সতর্ক—অন্য কোন পূজা মিথ্যা দেবতার পূজা। সমস্ত Old Testamentএর মধ্যে ইহুদীর সহিত অন্যান্য জাতির সহিত সংঘর্ষের ইতিহাস

পাওয়া যায়। Semitic ধর্ম্মের এই প্রভাব—লা এল আল্লাহ্, ঈশ্বর এক, ইহাই মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রস্ফুট হইয়াছে। অপরদিকে ভগবানের ঐশ্বর্য্য—তিনিই সম্রাট, তিনি রাজাধিরাজ, আর সকলেই তাঁহার প্রজা এইভাব ইহুদী ধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্মে ফুটিয়াছে। ধর্ম্মের কথায়—ঈশ্বরই রাজা, ছোট বড় সকল মানুষই সমান। যীশু যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহাতে তিনি semitic ভাব বাদ দিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব (fatherhood of God) ও প্রভুত্ব বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই যে দাস্যভাব ইহাই খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গ। অপরদিকে বৈষ্ণবধর্ম্মে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি নানাভাবই আছে, কিন্তু দাস্য ও মাধুর্য্য ভাবেরই প্রাধান্য অধিক, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দাস্য ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও মাধুর্য্যভাবের অভাব নাই। বাইবেলের Old Testamentএ Psalm গুলির মধ্যে এই মাধুর্য্যভাবের সমাবেশ দেখা যায়—খৃষ্টানদের mysticদের মধ্যেও এই ভাবের সমাবেশ। আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্মে যেমন পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ, বিরহ, সম্মিলন প্রভৃতি নানা ভাবের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে অবিকল ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় ধর্ম্মেই ভাবের অনুশীলন বা রাগানুগ সাধনার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বৈষ্ণবধর্ম্মে, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে, রাগানুগ সাধনার প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে যাঁহারা রাগমার্গে ভগবদারাধনা করিতেন তাহারা "রহস্য-মার্গী" বা mystic বলিয়া খ্যাত। Miss Evelyn Underhill এবং Dean Inge তাঁহাদের পুস্তকে এই সমস্ত ভক্ত নরনারীর বিবরণ দিয়াছেন। আমাদিগের বৈষ্ণবধর্ম্মে ভগবান ও ভক্ত, পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে নায়কনায়িকা কল্পনা পূর্ব্বক মাধুর্য্যরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ভগবান Bridegroom এবং ভক্ত Bride এই কল্পনাপূর্ব্বক এই রাগানুগ সাধনার প্রচার ঘটিয়াছে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ, জীব ও ব্রহ্মের যে গূঢ় মিলন তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে আমাদিগের মধ্যে যে সকল ভাব বিদ্যমান তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা যাহা দেখি তাহারই আমরা কল্পনা করিতে পারি; যাহা আমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত, তাহার কল্পনা আমাদিগের অসাধ্য। এই কারণে ভগবানকে আমরা মাতা, পিতা, পুত্র, সখা, প্রভু, স্বামী প্রভৃতি রূপে কল্পনা করিয়া থাকি। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে এই যে কল্পনা, ইহা ধর্ম্মের ইতিহাসের এক একটী স্তর—ইহার শেষ স্তর ভগবানে নায়কত্ব আরোপ বা মাধুর্য্যরসের সাধনা।

আমরা যে রাগানুগ সাধনার উল্লেখ করিলাম খৃষ্ট যে তাহার প্রচার করিয়াছেন এরূপ বলা যায় না, তবে তাঁহার ধর্ম্মে ক্রমশঃ তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে। খৃষ্টের ধর্ম্মের যে ভিত্তি, বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিও তাহাই—জীবে দয়া ও নামে ভক্তি ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি। খৃষ্টও বলিতেছেন—Thou shalt love the Lord, thy God, with all thy heart and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets (Matt. XXI 37-40). ভগবানই সাধ্য, ভগবানই সাধনা,

ভগবানই সর্ব্বস্ব ; ভগবানের জন্য সকলই ত্যাগ করিতে হইবে ; তিনিই মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র, তাঁহার অপেক্ষা প্রিয় কেহ নাই। তাঁহাকে ভজনা করিলেই মুক্তি। তিনি দয়ালু, দয়া তিনি অবশ্যই করিবেন, কিন্তু ডাকিতে হইবে "দেহি মে, দদামি তে"। পাপীর তিনি শরণং সুহৃৎ ; মানব যত দুরাচারই হউক না কেন, ভগবানের শরণ লইলে তিনি সকল পাপ ক্ষমা করিয়া পতিতকে উদ্ধার করিবেন। যিনি ভগবানের দাস, কোন আচারেই তিনি বদ্ধ হন না—তিনি সমাজ সংসারের সকল নিয়মের অতীত। এই সকল আশার কথা, আনন্দের সংবাদ, মুক্তির বাণী দুই ধর্ম্মের মধ্যেই দেখা যায়।

শ্রীগীতায়—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত যেপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাংগতিং॥
কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাং॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।

খৃষ্টও বলিতেছেন—

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden and I will give your rest. Take my yoke upon you, and learn of me ; for I am meek and lowly in heart ; and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light.

খৃষ্ট ধর্ম্মের মূলকথা—ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের প্রচার fatherhood of God এবং brotherhood of man. খৃষ্ট এই সাধনার একটা ক্রম দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনি ধর্ম্মের (Sermon on the Mount) অধিকারিবাদের প্রথম বিচার করিয়াছেন। ধর্ম্মের রাজ্যে উচ্চ নীচ, মূর্খ পণ্ডিত, জাতি অজাতি, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, (Pharisee Publican) সতী অসতীর বিচার নাই—সকলেই ভগবানের দয়ার পাত্র। তিনি পতিত-পাবন—বিশেষ করিয়া তিনি বার বার বলিতেছেন for I am not come to call the righteous but the sinners to repentance. বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও কথা তাহাই—প্রেমের সকলেই অধিকারী ; ইহার বিপ্রশূদ্র ভেদ নাই ; শাস্ত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। অত্যন্ত আচারপরায়ণ রামানুজ সম্প্রদায় হইতে আচারহীন বাউল সম্প্রদায় সকলেই স্বীকার করেন যে নাম সম্বন্ধে অধিকারবাদ নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় ও বৈষ্ণব উভয় ধর্ম্মেই এই অধিকারিবাদ সম্বন্ধে একটী কথা আছে, তাহাকে আমাদিগের শাস্ত্রে মুমুক্ষত্ব

এবং ইংরেজি পরিভাষায় Soul hunger বলা যায়। জিজ্ঞাসু না হইলে আচার্য্য যেমন উপদেশ দান করেন না, মুমুক্ষু না হইলে গুরু সেই প্রকারে উপদেশ দিবেন না। খৃষ্ট সেই কারণে বলিতেছেন Give not that which is holy unto the dogs; বৈষ্ণব শাস্ত্রে শিষ্যের জিজ্ঞাসু বা আর্ত্তভাব না দেখিলে তাহাকে মন্ত্র দেওয়ার নিষেধ আছে। মুমুক্ষুত্বের দুইটী চিহ্ন, একটী বিষয় বৈরাগ্য ও দ্বিতীয়তঃ প্রাপ্তির জন্য প্রবল আকাঙ্খা। সামান্য বিষয় বাসনা থাকিলে আর ঈশ্বর প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। খৃষ্ট বলিতেছেন—সূচের মধ্য দিয়া বরং উষ্ট্রের গমন সম্ভব কিন্তু, ধনীর পক্ষে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। অন্যত্র No man can serve two masters, for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon. বৈষ্ণব ধর্ম্মেও বিষয় বৈরাগ্য ও ভোগত্যাগের কথা পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে। খ্রীষ্ট বলিতেছেন—জীবনযাত্রার জন্য চিন্তা করিও না, অশনবসনের চেষ্টায় জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিও না; Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your Heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?...And why take thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin. বৈষ্ণবধর্ম্মে এই ভাবটীকে "নির্ভরশীলতা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে যাঁহারা সতত ভগবৎপরায়ণ, ভগবান্ তাঁহাদের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন—তেষাং সততযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। অপরত্র

যেন শুক্লীকৃতাঃ হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন সতে বৃত্তিং বিধস্যতি
ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স ভক্তান্ কিমুপেক্ষতে ॥

শ্রীভগবানে একান্ত নির্ভরশীলতা বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথা। নারদপঞ্চরাত্র, ভাগবতাদি গ্রন্থে শরণাগতি ধর্ম্মের যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহার প্রথম ও প্রধান কথা ভগবানই শরণ, তিনিই সর্ব্বত্র রক্ষা করিবেন, তিনিই অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতা, তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। একান্ত নির্ভরশীল হইয়া তাঁহার শরণ লইলে তিনি পাপ তাপ দুঃখ দারিদ্র্য সকলই ঘুচাইয়া ইহলোক ও পরলোকে আমাদিগের সুখশান্তি বিধান করিবেন। খ্রীষ্ট তাঁহার Lord's Prayerএ এই শরণাগতির ভাবই বিশেষরূপে ফুটাইয়াছেন। তিনি ভগবানের নিকট হইতে প্রতিদিনের অন্নভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে শিখাইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ কখন অন্ন শব্দের উল্লেখ করেন না—তাঁহারা অন্নকে প্রসাদ বলিয়া থাকেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া প্রসাদ না করিলে কাহার সাধ্য অন্নসেবা করে? ঐ প্রার্থনার মধ্যে একটা বড় কথা আছে, তাহা ভগবানের জয়বাদ; তিনি বলিতেছেন—ভগবানের ইচ্ছা স্বর্গমর্ত্ত্য সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিয়া তাঁহার জয়গান করাই বৈষ্ণবের প্রধান কর্ত্তব্য। খ্রীষ্ট প্রার্থনায় বলিতেছেন—

আমরা যেমন পাপীকে ক্ষমা করি তুমিও সেইরূপ আমাদের ক্ষমা করিও। বৈষ্ণব কিন্তু ইহার উপরে চলিতেছেন তিনি বলেন—পাপ পুণ্যের বিচার আমার নহে আমার ভালবাসাই ধর্ম্ম; পাপ পুণ্যের বিচারের কর্ত্তা ভগবান্।

খৃষ্ট ধর্ম্মের যেমন তিনটি প্রধান কথা Faith, Hope ও Charity, বৈষ্ণব ধর্ম্মের তিনটী কথা প্রেম, ভক্তি ও বৈরাগ্য। প্রেম—charityর দ্যোতক, ভক্তি Faith, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলেই ভক্তি জন্মে, সুতরাং Hope বা আশার কথা বৈষ্ণবগণ বিশেষ করিয়া বলেন নাই। প্রেম—ভালবাসার সাধারণ সংজ্ঞা (general term, ঈশ্বরে যে পরম অনুরক্তি তাহাই ভক্তি; সুতরাং প্রেমের যে বিশেষ ভাব তাহাই ভক্তি; আর এই প্রেমভক্তির মূল বৈরাগ্য, কারণ স্বার্থ, ভোগলিপ্সা, মায়া মমতা প্রভৃতি প্রেমভক্তির একান্ত প্রতিকূল।

অনুকূলস্য সঙ্কল্পঃ প্রতিকূলস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ॥

ভক্তির যাহা অনুকূল তাহা করিবার জন্য সঙ্কল্প, তৎপ্রতিকূল বিষয়ের ত্যাগ, ভগবানই রক্ষক—এই দৃঢ় বিশ্বাস, এবং কায়মনোবাক্যে ভগবান যে রক্ষা করিতেছেন এই বিশ্বাস রাখিয়া যাওয়া এবং তাঁহাকে রক্ষকত্বে বরণ করা, ভগবানে আত্মসমর্পণ ও দীনতা, ইহাই শরণাগতিরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্ম। দীনতা বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ; আপনারা সকলেই বৈষ্ণব বিনয়ের কথা জানেন। খৃষ্টও এই দীনতার কথা সুখনিদানের (Beatitude) কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন। তিনি ভগবৎকৃপার অধিকারবিচারে যে সকল গুণের উল্লেখ করিতেছেন সেগুলি ক্রমান্বয়ে—আর্ত্তভাব (poverty of spirit) দীনতা (mourning) বিনয় (meekness), মুমুক্ষুত্ব (hunger and thirst after righteousness) দম ও শৌচ (purity of heart), শান্তভাব (peacemaking), নিগ্রহসহনশীলতা (Blessed are they which are persecuted)—Matt. V 3-10-এই সমস্ত ভাবের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের কথা বৈষ্ণবধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে। উপযুক্ত Beatitudesএর কথা পড়িয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মহাবাণীর কথাই মনে হয়—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

সমাজের অত্যাচারে বহুলোক সমাজ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—মিশনরীরাও বহু চেষ্টা করিয়া অনেককে হিন্দু সমাজের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। আমাদের দেশে করুণার অবতার দয়াল ঠাকুর চৈতন্য দেবের দয়ায় বহু পতিত উদ্ধার হইয়াছিল, এমন কি যবনও বিপ্রজনোচিত সম্মান পাইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—সুতরাং এই পতিতোদ্ধারের কর্ত্তব্য বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণের স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। গৃহে চেৎ মধু বিন্দেৎ কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ—গৃহে যাহার মণিমুক্তার ভাণ্ডার, সে আজ অপরের দ্বারে ভিখারী কেন? আমাদের দেশের বহুলোক অদ্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে—তাহারা কোল, ভিল, সাঁওতাল ওরাওঁ, মুণ্ডারী হইতে পারে—কিন্তু

তাহারা ত এদেশের লোক। অন্ত্যজ হউক, চণ্ডাল হউক—মানব মাত্রেই প্রেমভক্তির অধিকারী। গৃহে এই প্রেমভক্তির ধর্ম্ম থাকিতে সাতসমুদ্রের পার হইতে বিদেশী আসিয়া ঘরের ভাইকে ছিনাইয়া লইয়া যায়—ইহা বড় আশ্চর্য্য। কোন প্রকার আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। কোন প্রকার আচার ও বিচারের প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার বিধি বন্ধন নাই, কেবল—নাম ভজ নাম পূজ নাম কর সার। এমন সহজ ও সুলভ মুক্তির পথ থাকিতে মানবের অন্য পথে যাইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং আচার বিচারের কঠোরতায় যে স্থলে বিষ উঠিয়াছে, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দেশে যে মাধুর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে সে সকলেই মধুময় হউক—মাধুর্য্যের বর্ষণে সমস্তই সকল অশান্তি ঘুচিয়া প্রেমের মহিমা ফুটিয়া উঠুক

আর একটি কথা—সাম্প্রদায়িক কলহ জগতে বহু অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সকল ধর্ম্মের মূল এক। নদী সকল যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছে—সকল ধর্ম্মই তেমন শ্রীভগবানের করুণাসাগরের দিকে মানব সঙ্ঘকে লইয়া যাইতেছে; সুতরাং আমরা নিজের ক্ষুদ্রদৃষ্টিনিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ ও কলহের সৃষ্টি করিয়া জগতে বহু অশান্তির সঞ্চার করিতেছি। ধর্ম্মের তুলনামূলক সমালোচনায় বুঝা যায় সর্ব্ব সম্প্রদায়েরই প্রবর্ত্তকই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ; সকলেরই বাণী এক—সকলেই মানবের শুভকামী. কিন্তু আমরা আজ তাঁহাদেরই অনুসরণ করিতে গিয়া সম্প্রদায়বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরের মধ্যে দ্বেষহিংসার প্রচার করিয়া সেই মহাপুরুষদিগকেই অপমানিত করিতেছি। সকল ধর্ম্মেরই এক কথা—শ্রীভগবানই লক্ষ্য, তাঁহাকে পাইলেই শান্তি বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং তাঁহার সাধন প্রেম ও ভক্তি। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া মূল বিষয়ে সকলে অবহিত হইবেন ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বংশানুক্রম

'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' 'বাপকা ব্যাটা' প্রভৃতি বাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে উত্তর পুরুষের সাদৃশ্য রহিয়াছে। সাদৃশ্যে একত্ব ও পার্থক্য দুইই সূচনা করে, পূর্ণ একত্ব নির্দ্দেশ করে না। এই উভয়েরই কারণ ও প্রকৃতি আবিষ্কার করা বংশানুক্রমবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ইহার নিজেরই একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু সুপরিচালিত হইলে ফল লাভের আশাও নিতান্ত কম নহে। গৃহপালিত পশু পক্ষীর ও উদ্যানের ফলমূলাদির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মানুষের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। পরিশেষে মানুষের নিজেরই প্রকৃতিগত উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়া এ বিজ্ঞান নিজের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। সেইজন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই আলোচনার দিকে মানবমন আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে

নূতনে নূতন ও পুরাতন

বা গ্রীশে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইয়াছিল বটে। কিন্তু তার সঙ্গে তুলনায় বিগত বিংশতি বৎসরে বংশানুক্রম বিষয়ে যে তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা প্রাচীন আল্‌কেমির তুলনায় বর্ত্তমান কেমিষ্ট্রীর স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। প্রাচীনকালেও গ্রীস্ ও ভারত উভয়ত্রই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চর্চ্চা হইয়াছিল বলিয়া যেমন নিউটনের দাবী এক চুলও কমে না; প্রাচীনেরাও জানিতেন বা কল্পনানেত্রে দেখিয়াছিলেন যে উদ্ভিদেরও অনুভূতি আছে, তাহাতে জগদীশচন্দ্রের মহিমা এক তিলও খর্ব্ব হয় না। কেন না নিউটনের আবিষ্কার তাঁহার তিন নিয়ম, আর জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব আমাদেরই কামারের নির্ম্মিত ক্রেস্কোগ্রাফ্ সাহায্যে উদ্ভিদের অনুভূতির পরীক্ষণ। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কোনই সূক্ষ্ম অনুবীক্ষণ সাহায্যে প্রাচীনকালের মধ্যে এগুলির অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং পুরাতন তত্ত্বও নূতনের সম্মান পাইবার যোগ্য। বংশানুক্রমতত্ত্বকে সেই দৃষ্টিতে দেখিয়াই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

কেন বংশধর পূর্ব্ব পুরুষের সাদৃশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এই তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য নানা মুনি নানামতের অবতারণা করিয়াছেন। সে সকলের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জননপ্রক্রিয়ার আলোচনা প্রয়োজন। উচ্চজীব ও উদ্ভিদে পুরুষ-প্রকৃতির সমাবেশে নূতন জন্ম হইয়া থাকে। পুংবীর্য্য (sperm cell) ও স্ত্রীবীর্য্যের (Ovum or Egg) সমন্বয়ে নূতন জীবের উৎপত্তি। পুংবীর্য্যে লক্ষ লক্ষ জীবাণু (sperm) বর্ত্তমান। এই জীবাণু সকল ডিম্বের নিকটবর্ত্তী হইলে কোন অনির্দ্দিষ্ট জৈব নিয়মে উহাদ্বারা আকৃষ্ট হয় ও ডিম্বকে জড়াইয়া ধরে। যে মুহূর্ত্তে একটা জীবাণু ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করে, সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব কৌশলে ডিম্ব গাত্র এমন কঠিন হয় যে আর কেহ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এখন দুইই মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইহারই নাম প্রাণ। ইহা গর্ভ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সূক্ষ্ম পদার্থটি নিজেকে সদৃশ সহস্র কোষে বিভক্ত করিয়া প্রথমতঃ এক শূন্য গর্ভ গোলকে পরিণত হয়। তৎপর, ফুটবলকে ভাঁজ করিয়া রাখার মত এক গোলাকার বাটির আকার ধারণ করে। ক্রমে বাটির চারধার পুলিপিঠার মত একত্র যোড়া লাগিয়া একটী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, তাহাই এই নূতন জীবের মুখের পত্তন। মুখ যখন হইল তখন শির দাঁড়ার হাড় দেখা দিল, মাথাটা ঘাড়ের উপর বসিল এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে দেখা দিতে লাগিল। দেখিলেই মনে হয় যেন এক অদৃশ্য হস্ত এখানে একটু টানিয়া, ওখানে একটু টিপিয়া পূর্ব্বপুরুষের প্রতিকৃতির আদর্শে তাহারি বংশধরকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছে। কিন্তু এই কারিকরের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কেবল তখনই বোধগম্য হইতে পারে, যখন বুঝা যায়, যে উপাদানে এই সৃষ্টির আরম্ভ তাহা আয়তনে সূচাগ্রের সহস্রভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাই জীব বিবর্দ্ধনের প্রণালী। উদ্ভিদে কিঞ্চিৎ অবান্তর পার্থক্য থাকিলেও মূল সূত্র একই।

জনন প্রক্রিয়া

Zygote

ডার্ব্বিনের সর্ব্বাবয়বী জনন মতে (Pangenesis) শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চর্ম্ম, ও কেশ, অস্থি, মজ্জা, মাংস, পেশী, হৃৎ, যকৃৎ অন্ত্র সকলেই আপনাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম—সহজেই অনুমেয় কত সূক্ষ্ম—অঙ্কুরসমূহ পরিত্যাগ করে। সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গের এই সকল প্রতিনিধিরা রক্তের সঙ্গে প্রবাহিত হইয়া জনন যন্ত্রে

সর্ব্বাবয়বী জনন
Pangenesis

যাইয়া উপস্থিত হয় এবং সকলে মিলিত হইয়া একটী জীব কোষ উৎপন্ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্ত্রী ও পুং বীর্য্যের দুইটা জীব কোষের সমন্বয়ে একটা জীবনের উদ্ভব। সুতরাং সন্তানোৎপাদনে পিতা মাতা উভয়ের কার্য্যকারিতা সমান। পিতৃধারা মাতৃধারার সকল অবয়ব একীভূত হইয়া সন্তানের জন্ম দেয়। কাজেই 'নরানাং মাতুলক্রমঃ' বা বাপকা ব্যাটা দুই ই সমান সত্য। একত্রীকৃত এই অঙ্কুর সমূহের পৃথকীকরণই (Differentiation) যখন সন্তানের পরিবর্দ্ধন, তখন সন্তান যে পিতামাতার সমধর্ম্মী হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যাহা হউক এই ব্যাখ্যায় স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে জীব জগতের উচ্চ জাতির পুরুষ আপনার জীবদ্দশাতে সর্ব্বাবয়বের কোটি কোটি অঙ্কুর সমষ্টি সৃজন করিতেছে। ডারুইনের মত মনস্বী যে এই কল্পনার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা স্পষ্ট অনুভব করেন নাই তাহা নহে। কিন্তু কোন জীবের জীবদ্দশাতে পীড়া বা অতিরিক্ত পরিচালনা বা অব্যবহার বশতঃ অন্তর বা বহিরিন্দ্রিয়সকলের যে বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটে, তাহা যদি সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত (Inheritance of acquired Characters) হইতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাবয়বী জননরূপ কোন ব্যাখ্যা চাই, যাহাতে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের সঙ্গেই জনন যন্ত্রের ঐরূপ একটা নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করা আবশ্যক। এ কথা বলা বাহুল্য, যে বংশানুক্রম সম্বন্ধীয় বিবদমান তত্ত্বসকলের মধ্যে এই উপার্জ্জিত প্রকৃতির উত্তরাধিকারই সর্ব্বপ্রধান এবং এ বিবাদের এখন পর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় না। ডারুইনের সময় ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মতই ছিল, এখন কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক জীবতত্ত্ববিদ্ ইহা স্বীকার করেন।

বীজকোষ প্রবাহ

বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বিশ্মানের বংশপরম্পরায় বীজকোষের স্থায়িত্বের (The Continuity of the germ plasm) মত বহুমান্য Continuity of germ-plasm বলিয়া গৃহীত। তাঁহার মতে পূর্ব্ববর্ণিত প্রাণের এক অংশ (Germ-plasm, অন্য অংশের নাম Sama যাহার দ্বারা দেহ গঠিত), বংশধরের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাহার জীবাণু (Germ cell or sperm cell) নির্ম্মাণ করে, নিজের শরীর নির্ম্মাণে কখনও ব্যয়িত হয় না। বংশধরও আবার সেই অংশটুকু স্বীয় সন্তানকে দান করে, নিজের শরীরে গ্রহণ করে না। এইরূপে বংশ পরম্পরায় তাহা প্রবাহিত হইতে থাকে। বীজকোষ (Germ plasm) বাড়িয়া যায়, পূর্ব্বপুরুষ হইতে পর পর উত্তর পুরুষকে আশ্রয় করে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শরীর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মিত হয় না। কথাটা একটা ফলের দৃষ্টান্তে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। ফলের বীচিটী পুঁতিয়া দিলাম—স্কন্ধ শাখা পত্র পুষ্প ফলে বৃক্ষটি সুশোভিত হইয়া উঠিল। ইহার ফলে আবার বীচি আসিল কোথা হইতে? বৃক্ষ আপনার সর্ব্বাঙ্গ হইতে উপাদান লইয়া বীচি গড়ে নাই। ঐ মূলের বীচিই যদি আপনার প্রকৃতি অবিকৃত রাখিয়া ঐ ফলসকলে যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে যাহা হয়, জননক্রিয়া তাহাই। বীজ কোষের উপর শরীরের কোন হাত নাই। শরীর বীজকোষের আবরণ মাত্র। বীজ কোষের রক্ষণ ও পরিপোষণই ইহার একমাত্র কার্য্য—সন্তানের উপর পিতামাতার দেহযন্ত্রের কোন প্রভাব নাই। এই মত গৃহীত হইলে পিতামাতার

পীড়াজনিত দৈহিক বিকলতা, ব্যবহার, অব্যবহার, শিক্ষা প্রভৃতি জনিত হ্রাস বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি যে সন্তানে সংক্রামিত হইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে কিছুতেই যে বীজকোষের প্রকৃতি বদলাইতে পারে না, এতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে না। বরং এ কথা ঠিক, জননযন্ত্রে অবস্থিতিকালে নানা কারণে বীজ কোষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু শরীর যন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন বীজকোষের মধ্য দিয়া সন্তানে বর্ত্তাইবে না।

এই জনন ব্যবস্থায় সুতরাং দাঁড়াইল এই, যে পিতা মাতার সঙ্গে যে সন্তানের সাদৃশ্য, তাহার উপর পিতা মাতার কোন প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব নাই। একই বীজ কোন বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে এবং পিতাপুত্রের উভয়ের গুণাবলী ঐ একই বীজ কোষের প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। সন্তান পিতামাতার মধ্য দিয়া উহা পাইয়াছে এই মাত্র সম্বন্ধ। সহধর্ম্মী উপাদান হইতে উভয়ের আরম্ভ, সমান অবস্থার মধ্য দিয়া উভয়ের পরিবর্দ্ধন, তাই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্ত্রী পুং বীর্য্যের সমবায়েই সন্তানের উৎপত্তি। মাতা কেবল গর্ভধারিণী নহেন, সন্তানের উপর পিতৃত্বের দাবীও তাঁর যে পিতারই মতন। এই যে দুই ধারার একীকরণে বংশ রক্ষার ব্যবস্থা, ইহা দ্বারা প্রকৃতি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইয়াছেন। যদি এক ধারায় বংশ রক্ষার সম্ভাবনা থাকিত, তবে সন্তান পরম্পরায় একই গুণাবলীর আবির্ভাব হইত। পরিবর্ত্তনের (Variation) দ্বারা বিভিন্ন গুণের আবির্ভাব কল্পনা করিলেও তাহা সুদূরপরাহত হইত। কিন্তু দুইএর সম্মিলনের ব্যবস্থায় কোনও জীবের পক্ষে তাহার জাতির (species) সমস্ত গুণাবলীর উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হইতেছে। মনে করা যাক্ মানব জাতি হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমান ধারায় বিভক্ত। অন্যান্যনিরপেক্ষ হইয়া যদি এক 'পিতৃপুরুষ' সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইত, তবে হিন্দুবংশ চিরদিন হিন্দু গুণাবলীতে, য়ীহুদীবংশ য়ীহুদী গুণাবলীতেই আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু দুইএর সমাবেশ প্রয়োজন বলিয়া হিন্দু য়ীহুদী মিলিয়া সন্তানে উভয়ের গুণ সংক্রামিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে। এই সন্তানের বৌদ্ধ সংযোগে, এবং তৎসন্তানের পরপর খৃষ্টান জৈন মুসলমান সহযোগিতায় কোন বিশেষ মানুষে মানব জাতির সকল গুণের সমাবেশ সূচনা করিতেছে। একধারার জননব্যবস্থায় এই মহাফল সম্ভাবিত নহে।

দ্বৈপৈত্রিক ধারার ফল

দ্বৈপৈত্রিক ধারায় তো সন্তানের জন্ম। কিন্তু পিতৃমাতৃরক্ত ভ্রূণের মধ্যে জট্ পাকাইয়া এক হইয়া থাকে, গুণগুলির একটা গড় প্রস্তুত হয়, না স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রই থাকে, ইহাই এখন প্রশ্ন। জীবতত্ত্ব বিজ্ঞানে যাহা মেণ্ডেলের নিয়ম (Mendel's law) বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতে স্বতন্ত্রীকরণ (Law of Segregation) স্বীকৃত হয়। গুণগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকে, কোন্ পুরুষে পিতৃগুণ, কোন পুরুষে মাতৃগুণ আসিয়া উপস্থিত হয়—দুইগুণ বিপরীতভাবাপন্ন হইলে কাটাকাটি হয় না। যেখানে দৃষ্টতঃ কাটাকাটি বা গড় মনে হয়, যেমন শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের বা দীর্ঘকর্ণ ও ক্ষুদ্রকর্ণ ক্ষুদ্র শশকের শঙ্কর (Hybrid) সেখানেও পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। হঠাৎ দেখিয়া যাহা নিয়মের ব্যভিচার মনে হয়, তাহা ব্যভিচার নাও হইতে

গুণ সংক্রমন প্রণালী
Mendel's Law

পারে। শীতে বস্তু সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু জল যখন বরফ হয়, তখন সঙ্কুচিত না হইয়া বিস্তৃত হয়। দেখিতে বিস্ফারিত বটে, বাস্তবিক সঙ্কুচিতই হইয়াছে। ১৬টি গোলক লইয়া একটী পূর্ণগর্ভ চতুষ্কোণ প্রস্তুত কর। আবার ঐ ১৬টি গোলকের দ্বারাই যদি একটা শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণ গড়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা আয়তনে বড়, কিন্তু গোলকগুলির মধ্যে ব্যবধান কম নয়। জলে ও বরফে পরমাণুর এইরূপ কোন সমাবেশ কল্পনা করিলে পরমাণুগুলি সঙ্কুচিত হইয়াও সমস্ত বস্তুটি বিস্তৃত দেখাইবে। হয় তো মানুষের বর্ণের নিদান বা শশকের কর্ণের পূর্ব্বাপর ইতিহাস জানিতে পারিলে এই আপাত কাটাকাটির মধ্যেও স্বতন্ত্রীকরণ ধরা পড়িতে পারে। এমন তো দেখা যায় পিতামাতা উভয়েই গৌরবর্ণ, কিন্তু সন্তান শ্যামবর্ণ হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল উর্দ্ধতন তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ একজন ঐরূপ শ্যামবর্ণই ছিলেন, ইতর প্রাণীতে ও উদ্ভিদে বর্ণশঙ্করের মধ্যে মেণ্ডেলের নিয়মই ধরা পড়িয়াছে। জগতে বস্তুবৈচিত্র্যের অন্ত নাই। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই ঐ নিয়ম খাটিবে কিনা তাহা অনন্ত পরীক্ষাসাপেক্ষ। যতদুর পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে বহুপরিমাণে এ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতিকায় ও বামনের সন্তান—সকলেই হইল অতিকায়। এই অতিকায়দিগের যখন বংশ বাড়িল, দেখাগেল তিনভাগ অতিকায়, একভাগ বামণ। ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। পিতামাতা উভয়েই অতিকায়, অথচ সন্তান হইল বামণ। গুণের স্বতন্ত্রীকরণ ছাড়া আর কিছুতে ব্যাখ্যা হইবে না। গুণের মধ্যে যেটা অদৃশ্য হয় (এখানে যেমন বামণ) তাহাকে বলে পশ্চাদ্গত (Recessive) যেটা প্রকাশিত হয় সেটার নাম অগ্রগামী (Dominant) (অতিকায় এখানে অগ্রগামী)। কার সম্বন্ধে কে অগ্রগামী বা পশ্চাদ্গত হইবে, তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। ঐ যে একভাগ বামণ, তারা যখন নিজেদের মধ্যে সন্তানোৎপাদন করে তখন সকলেই হয় বামণ। কিন্তু অতিকায়দের সকলের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাদের তৃতীয়াংশ বিশুদ্ধ বেবলই অতিকায় উৎপন্ন করে। কিন্তু আর সকলে এক চতুর্থাংশ বামন জন্ম দেয়। কোন কোন গুণ সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে, যে পিতা মাতার গুণ যেন মিশ্রিত হইয়া প্রথম গোষ্ঠির সন্তান উৎপন্ন হইল। কিন্তু সেখানেও যে গুণের স্বতন্ত্রীকরণ রহিয়াছে তাহা ধরা পড়িল পরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষের সন্তানেরা অতিকায়-বামনেরই নিয়ম অনুসরণ করিল। যাহা হউক, মেণ্ডেলের উত্তরাধিকারের নিয়মের প্রধান কথা এই যে প্রাণের মধ্যে পিতা মাতার গুণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান করে, স্পষ্ট আলাদা আলাদা থাকে, জট পাকাইয়া এক হইয়া যায় না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে কোনটা বা পশ্চাদ্গত হয়, কোনটা বা অগ্রবর্ত্তী হইয়া সন্তান উপস্থিত হয়। জীব ও উদ্ভিদ জগতে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এই নিয়ম পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে।

যদি এটা একটা প্রত্যক্ষ সত্যই হইত যে সদৃশ হইতে সদৃশ উৎপন্ন হয়ই, তবে কি প্রণালীতে তাহা ঘটে; যাহা পূর্ব্বে বলা হইল তাহা বলিলেই বংশানুক্রমবিজ্ঞান শেষ হইত।

পরিবর্ত্তন
জননগত ও উপার্জ্জিত

কিন্তু সংসারে দুটি বস্তু কখনও এক রকমের হয় না, ইহাই বস্তুগত সত্য। এই বিভিন্নতা দুই প্রকারের, জন্মগত ও উপার্জ্জিত। যদি বীজকোষে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে তাহাকে জন্মগত পরিবর্ত্তন বলা যায়। বহির্জ্জগৎ দেহ যন্ত্রের উপর কোন স্থায়ী ফল উৎপন্ন করিলে তাহা উপার্জ্জিত প্রকৃতি (acquired

characters) নামে অভিহিত হয়। এই বিভিন্নতা ধরিতে গেলে ব্যবহারিক মাত্র। কোন দেহযন্ত্রকে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা চলে না। জন্মগত প্রকৃতি যাহাই থাকুক না কেন, তাহাকে বিকশিত হইতে হইলে অনুকূল আবেষ্টনের সহায়তা চাই। বৃস্ম্যান্দের মধ্যে লইয়া রাখিয়া দিলে কালিদাস-বীজকোষ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ প্রসব করিবে না। H. B. Orr তাঁহার Development and Heredity নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে আবেষ্টনের প্রভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন দেহযন্ত্রই স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের দ্বারা পূর্ণাবয়বতা প্রাপ্ত হয় না। আবার, বীজকোষে যদি প্রবণতা না থাকে তবে অবস্থার শত অনুকূলতা সত্ত্বেও তদনুযায়ী উপার্জ্জিতগুণের আবির্ভাব হইবে না। কুকুর ছানাকে যতই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে ফেলা যাক্ না কেন, তাহার কখনও শৃঙ্গ গজাইবে না। শুনিয়াছি সাধনাবস্থার পরিবর্ত্তনে মনুষ্য সাধকের লাঙ্গুল বাহির হয়। কিন্তু সে কথা অশ্রদ্ধেয়। অন্যদিকে স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন এক জাতীয় জীবের প্রত্যেক ব্যক্তিই কেবল আপন আপন জন্মগত গুণাবলীকেই বিকশিত করে, অবস্থার বৈপরীত্য যথা খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য, অঙ্গবিশেষের অস্বাভাবিক পরিচালনা, কঠিন পীড়া প্রভৃতিতে উপার্জ্জিতগুণের আবির্ভাবও তেমনই অপরিহার্য্য। জন্মকাল হইতে যমজের একজনকে বিশুদ্ধ বায়ু, প্রচুর স্বাস্থ্যকর খাদ্য, স্বাভাবিক অঙ্গপরিচালন ও সুশিক্ষার মধ্যে, অন্যটিকে সর্ব্ববিষয়ে ইহার বিপরীত অবস্থায় প্রতিপালন করিলে, উভয়ের মধ্যে যে গুরুতর পার্থক্যের সঞ্চার হইবে তাহা উপার্জ্জিত। অন্যদিকে দুই ভিন্ন পরিবারে দুইটি সন্তানকে সম্পূর্ণ এক অবস্থার মধ্যে রাখিয়া দিলে, তাহাদের মধ্যে যে প্রভেদ দৃষ্ট হইবে তাহা সম্পূর্ণ জননগত। কার্য্যত এই দুই রকমের পার্থক্যের মধ্যে রেখা টানা অতি কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিচার ক্ষেত্রে ইহা অস্বীকার করা চলে না।

পিতা পুত্রে বা একই পিতামাতার সন্তানগণের মধ্যে যে জন্মগত বিভিন্নতা, তাহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে দ্বিধারায় বংশপরম্পরাগত গুণাবলীর বিভিন্ন সংমিশ্রণে এই ভিন্নতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বংশানুক্রমের নিয়মসকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই পিতামাতার বীজকোষ ও ডিম্ব কোষের সমবায়ে অসংখ্য রকমের নব নব প্রাণের আবির্ভাব হইতে পারে। যেমন পুরাতন ইটে নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়, তেমনই বংশ পরম্পরাগত গুণাবলীর নব নব সংমিশ্রণে অনন্ত জন্মগতপার্থক্য সৃষ্টির সম্ভাবনা। প্রত্যেক মানুষের পিতৃমাতৃধারা, তাঁহাদেরও পিতৃমাতৃবংশ, এইরূপে ঊর্দ্ধদিকে কতদূর যাইতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বজাতিকে (species) অতিক্রম করাও অসম্ভব ঘটনা নহে (Even to allied species occasionally in certain mammals—B. Hart) একথা স্মরণ করিলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে অন্য কোন দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় না। এইরূপ পরম্পরাগত গুণাবলীর সুফলপ্রসূ সংমিশ্রণে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা ভগবৎকৃপা। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে দেখিতে পাই তিনি স্বীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কোন্‌টি কোন্ পূর্ব্ব পুরুষ হইতে আগত তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু সকল পরিবর্ত্তনই যে দৈহিক সংমিশ্রণের ফল, তাহা নহে।

সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টির আবির্ভাবও হইয়া থাকে। ইহা মৌলিক পার্থক্য। বংশানুক্রমের কোন নিয়মের দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা হয় না এবং ইহা ধীরে ধীরেও বিকশিত হয় না, হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই ইহার নাম আকস্মিক পরিবর্ত্তন Accidental variation, Single variation বা mutation, তবে ইহা বুঝা শক্ত নয়। সংমিশ্রণে একাধিক বস্তু চাই। আদি পিতামাতা একযুগল নন, বহু যুগল, ইহা পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। যিনি আদিতে বহুব সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সংমিশ্রণ ছাড়াই নূতন গড়িয়াছিলেন, তিনি এখন হঠাৎ সৃষ্টি হইতে হস্ত সম্বরণ করিয়া বসিয়া থাকিবেন সৃষ্টি ছাড়িয়া কেবল নির্ম্মাণ করিতেছেন, ইহা ধরিয়া লইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যাইতেছে না। তত্ত্ববিদগণ জীব ও উদ্ভিদ্ জগতে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে ভগবান এখনও সৃষ্টি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার লীলা ফুরাইয়া যায় নাই। সৃষ্টিতে এখনও নূতন তত্ত্বের আবির্ভাব হইতেছে। H. D Vries জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে এরূপ নূতনের আবির্ভাব হয় ও তাহা সন্তানে বর্ত্তে। তাঁহাদিগের মতে সৃষ্টিটা এখন নিত্যকর্ম্মের মধ্যে নয়, নৈমিত্তিক মাত্র। কে জানে পণ্ডিতেরা যাহা ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার লক্ষ গুণ বেশী তাঁহাদের দৃষ্টিকে, অতিক্রম করিয়া যাইতেছে না। বার্গসোঁ বলেন এই সকল পরিবর্ত্তনের মূলে ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য চেষ্টার অতীত এক শাসন শক্তি Directing principle, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক্, আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। যাহা হউক, তাঁহাদের মত এই যে বীজকোষের প্রকৃতিতে যে সকল বাস্তব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় তাহা এইরূপ নূতন সৃষ্টি। তবে তাঁহাদের বিশ্বাস যে এরূপ বাস্তব পরিবর্ত্তন তুলনায় খুবই কম। যদিও কেহ কেহ পতঙ্গবিশেষের ডিম্বের উপর অতিরিক্ত তাপ ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়া এবং বীজ গাড়িবার পূর্ব্বে পুষ্পের মধ্যে ঔষধাদি প্রবেশ করাইয়া এই বাস্তব পরিবর্ত্তন সংঘটন করাইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন দুই দিকে হইতে পারে—হয় কোন নূতন গুণের আবির্ভাব, না হয় কোন পুরাতন প্রকৃতির তিরোধান। নদী চলিতে চলিতে যেমন মরুভূমিতে অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে, তেমনই পরম্পরাগত কোন কোন বিশেষ প্রকৃতি কোন পুরুষে আসিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। আবার যদি এই রূপে পূর্ব্বে লুপ্ত কোন গুণ কোন উত্তর পুরুষে আসিয়া আবির্ভূত হয় তবে তাকে বলে পুনরাবর্ত্তন (Reversion) কোন গুণ বহু পুরুষ পর্য্যন্ত অন্তর্হিত থাকিয়া হঠাৎ এক পুরুষে আত্মপ্রকাশ করে। (Atavism, much better termed delayed inheritance.)*

পশুব্যবসায়ীদের মধ্যে এই সংস্কার আছে, যদি একবার অন্য জাতীয় যেমন দোআঁশলা কুকুরের দ্বারা কোন ভাল কুকুরের সন্তান উৎপাদন করান যায়, তবে স্বজাতি দ্বারা উৎপাদিত সন্তানও পরে দোআঁশলাই হইয়া যায়। আর তার উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকে না। এরূপ বিশ্বাসও দেখা যায় যে গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় কোন গুরুতর মানসিক বৈকল্য উপস্থিত হইলে তার ফল সন্তানে বর্ত্তে। কোন গর্ভিণী সর্প দেখিয়া ভয় পাওয়ায় সন্তান পৃষ্ঠে সর্প চিহ্ন লইয়া জন্মিয়াছিল। শুনিয়াছি গর্ভাবস্থায় সন্ন্যাসীর প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া সন্তানের

* Dr, Daivd B. Hart in his Evolution and Heredity.

প্রব্রজ্যার দিকে ঝোঁক হইয়া ছিল। সত্য হইলেও এসব যে কার্য্যকারণসম্বন্ধবিরহিত একত্রাবস্থিত ঘটনা (Coincidence) নয়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বিশুদ্ধভাবে পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সন্তানের মনের উপর গর্ভবতীর প্রবল মানসিক ভাব যে কার্য্য করিতে পারে না, তাহা নহে। কিন্তু সত্য বলিয়া গ্রহণ করার জন্য যতটা সতর্কতাপূর্ণ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা প্রয়োজন তাহা এ বিষয়ে কখন হয় নাই।

উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকার

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকার লইয়া বংশানুক্রমবিজ্ঞানে তুমুল ঝড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অথচ তার অর্দ্ধেক হুটোপাটি ভুল বুঝার (Misunderstanding) ফল। ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে পরিবর্ত্তন, তা সন্তানে বর্ত্তে কি না ইহাই হইল প্রশ্ন। কিন্তু শরীরের মধ্য দিয়া যদি বীজ কোষ প্রভাবিত হয় তবে তাহা সন্তান প্রাপ্ত হইলে, এ প্রশ্নের কি আসিয়া যায়। এ দুই প্রশ্ন নিয়াই কিন্তু ঝড়ের উৎপত্তি! একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া দৌড় শিখিবার পূর্ব্বে সন্তান উৎপাদন করিল। পরবর্ত্তী সন্তানগুলি কি পূর্ব্বের গুলি অপেক্ষা ভাল দৌড় শিখিবে? কেহ বলেন, হাঁ; কেহ বলেন, না। স্পেন্সার উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী, বিশ্‌ম্যান নহেন। স্পেন্‌সার বলিয়াছেন যে তাঁর হাত ছোট, কেন না, বাপ ঠাকুরদাদা ছিলেন স্কুল মাষ্টার, হাতের পরিচালনা ছিল না। ঐরূপে প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। উপার্জ্জিত তত্ত্ব (Acquired character) কি তা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে—

প্রথমতঃ, উপার্জ্জিত তত্ত্ব ব্যক্তির জীবদ্দশায় শারীরিক পরিবর্ত্তন। জাতির জীবনে যে পরিবর্ত্তন তাহা এখানে ধরা হইবে না। বন্য কুক্কুটের বংশধর আমাদের রান্নাঘরের মুর্গী বেশী ডিম দেয়, জংলা আমের পুত্র আমাদের বাগানের ন্যাংরা বেশী রসাল—সুতরাং উপার্জ্জিত তত্ত্ব সন্তানে না আসিবে কেন? এইখানে অলক্ষিতে গোল বাঁধিয়া গেল। কেন না, গৃহপালিত কুক্কুট আর উদ্যানের আমের যে বিশেষগুণ, তাহা ব্যক্তিগত জীবনের উপার্জ্জন নহে।

দ্বিতীয়তঃ কোন একটা পরিবর্ত্তনকে উপার্জ্জিত তত্ত্ব বলিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে এই পরিবর্ত্তনোপযোগী বিশেষ কিছু ঘটনা ঐ ব্যক্তির জীবনে ঘটিয়াছে, যাহা কিয়ৎপরিমাণে অসাধারণ। অল্প বয়সেই একজনের মাথার চুল পাকিয়া গেল। দেখা গেল তার সন্তানদেরও ঐ দশা। এই বিশেষত্ব যে জন্মগত নয় কিন্তু উপার্জ্জিত, তা এখনই বলা চলিবে না। যদি দেখা যায় যে ইতিমধ্যে তার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল, তবেই coincidence না হইলে তার সন্তানদের পক্ষে চুলের অকালপক্কতা উপার্জ্জিত তত্ত্ব হইবে। অথবা সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে মায়ের উপার্জ্জিত রোগ লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ঐ রোগ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালের ছোঁয়াচ (contagion) নয় তাহা প্রমাণিত না হইলে উত্তরাধিকার বলা চলিবে চলিবে না।

তৃতীয়তঃ উপার্জ্জিত তত্ত্ব শরীরের পরিবর্ত্তন, সোজাসুজি বীজকোষের পরিবর্ত্তন নয়। এইটাই প্রধান কথা, ইহা লইয়া যত গোল। কেন না, বুঝা সহজ নয়। অতিরিক্ত উত্তাপে যে পতঙ্গবিশেষের গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই

পরিবর্ত্তন বীজকোষের, শরীরের নয়। সুতরাং এ পরিবর্ত্তন উপার্জ্জিত নহে। অবশ্য, কোনো ক্রিয়া শারীরিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বীজকোষও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। কিন্তু উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে বীজকোষের পরিবর্ত্তন শারীরিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া হইয়াছে, সাক্ষাৎভাবে উক্ত ক্রিয়ার ফল নহে। ঘোর মাতালের বীজকোষ দূষিত হইয়া সন্তান দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইতে পারে। কিন্তু উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকার প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে পিতার নষ্ট পরিপাকশক্তি ও রক্ত-নাশাও সন্তানে বর্ত্তিয়াছে। প্রকৃত প্রশ্ন এই যে তাহার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বীজকোষের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে কি না এবং কোন অবয়বের উপর বাহিরের শক্তির কার্য্য বীজকোষে প্রতিফলিত হয় কি না—যাহাতে সন্তান পিতামাতার স্বোর্জ্জিত পরিবর্ত্তনের অধিকারী হইতে পারে। হাতখানা কাটাগেল—বীজকোষের সঙ্গে এই ঘটনার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইহার ফল যদি কোন রকমে বীজকোষে যাইয়া উপস্থিত না হয়, তবে সন্তান ইহার ভাগী হইতে পারে না। কেন না, বীজকোষ হইতেই সন্তানের উৎপত্তি। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। এ সম্বন্ধে সকল কথা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে চলে না। তবে কেহই এ কথা স্বীকার করেন না যে সকল উপার্জ্জিত পরিবর্ত্তনই সন্তান লাভ করে। তাহা হইলে চীনা রমণীর পা ছোট করিবার জন্য বংশ পরম্পরায় শৈশব হইতে লোহার জুতা ব্যবহার করিতে হইত না এবং সভ্য জগতে সন্তানের লেখা পড়া শিক্ষার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। তবে একটা ভাবপক্ষীয় দৃষ্টান্তেই কেল্লা ফতে। তাই পণ্ডিত মহলে এই বিষয় হইয়া বেশ গজ কচ্ছপের যুদ্ধ চলিতেছে। একজন দৃষ্টান্ত দিলেন, এক ষাঁড়ের, গোয়ালঘরের দরজা পড়িয়া, ল্যাজ ছিঁড়িয়াছিল। ছিঁড়ে না কেন? উহার ল্যাজে গুরুতর দোষ ছিল, তাই হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। কে জানে সে দোষ ইতিপূর্ব্বেই বীজ কোষকে আক্রমণ করে নাই। সুতরাং ল্যাজ না ছিঁড়িলেও সন্তান যে লাঙ্গুলহীন হইত না, তাহার তো কোন প্রমান নাই! আর সহস্র সহস্র গরুর লাঙ্গুল ছিঁড়িয়াছে, তাদের সন্তান লাঙ্গুলহীন হয় নাই! এইরূপে সকল ঘটনাই অপর পক্ষ উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বিরুদ্ধ পক্ষের দৃষ্টান্ত এত কম, তাতে অন্যরকম ব্যাখ্যাও যে না চলে তাও নয়। তবে কেন একটা নূতন নিয়ম স্বীকার করিব, যাহা গৃহীত জনন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধ। তবে ইঁহাদের শেষ মীমাংসা এই, যে এমন কোন খাঁটি প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে বলা যায়, উপার্জ্জিততত্ত্ব সন্তান লাভ করে। কিন্তু এরূপ হইতেই পারে না বলাটা নিতান্ত গোঁড়ামি, বিজ্ঞানসম্মত নহে।

সুপ্রজনন বিদ্যা। Eugenies

আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখা যাইবে যে মানুষ যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় নিযুক্ত হয়, তবে তাহাতে যে বিস্তর আনন্দ লাভ করে তাহা নহে, সে জ্ঞান কাজে খাটাইয়া কার্য্যগত জীবনেও প্রচুর উপকার লাভ করিতে পারে। আমরা যে বিজ্ঞানের আলোচনা করিলাম, তাহার সাহায্যে জীব ও উদ্ভিদ জগতের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু মানুষ কি কেবল আপনার উদর পূর্ত্তি লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে, অন্য উন্নতির চেষ্টা করিবে না? মানুষের উপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনের ক্ষমতা অসীম। যাহা বংশানুক্রম বলিয়া মনে হয় তাহা যে

শিক্ষা ও অনুকরণের ফল। শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নয়নে মানুষ আপনার জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ। সংস্কারকগণ দেখিতে পাইবেন তাঁহাদের সংস্কারের চেষ্টা স্বপ্ন নহে। বরং যাহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত, তাহারাই স্বপ্ন দেখিতেছে। বংশানুক্রমের নিয়ম সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছে, যে যাহাদিগকে আজ শূদ্র বলিয়া পদদলিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহাদের রাস্তা খুলিয়া দাও, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি বিধান কর, দেখিবে যে সকল গুণের অগ্রবর্ত্তিতায় (Dominance) তুমি বড়, যে সকল গুণ পশ্চাদগত হওয়ায় তাহারা ছোট, সেগুলি তাহাদের মধ্যেও অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহাদের দুর্দ্দশার অপনোদন করিবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

ব্যর্থ

১

আমার বঞ্চিত আমি ব্যর্থ অতীতের দ্বারে আমারে টানিছে অহরহ ;
একি দুর্ণিবার অন্ধ আকুল বেদনা অসহায় !
আমারে ফিরাতে চাহে। হাহাকার একি দুর্ব্বিষহ !
চলিতে সমুখপানে, নয়ন পিছনে আজি বারে বারে সুধু ফিরে চায়,
যত বলি " যাও যাও, ফিরে যাও, ছিন্ন কর, স্নেহবাহু কর তব লোল ;"
দাঁড়াবার অবসর কোথা হায় !—অপূর্ণ সাধনা—
কোথা শক্তি ! শূন্য সব ! স্মৃতি সুধু তোলে কলরোল
" এস এস ফিরে এস, পূর্ণ কর ব্যর্থ আরাধনা।"

২

নির্ম্মম নিবিড় সন্ধ্যা শূন্য জীবনের পরে আসিছে ঘনায়ে আজি হায়
নিষ্ঠুর নিয়তি সম ;—ফিরিবার নাহিরে উপায়।
পলে পলে ব্যর্থতার তীব্র অন্ধ বেদনা পীড়নে,
নিষ্পেষিয়া মর্ম্মতল বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে মূক অগোচরে সঙ্গোপনে।

সঙ্কলিকা

কয়েক বৎসর যাবৎ মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক প্রায় সকল রকম কাগজই নারী নিগ্রহ, নারী নির্য্যাতন, নারীসমস্যার প্রশ্নে ছাইয়া গিয়াছে। সমস্যাটী বাস্তবিকই বিশেষ জটিলতা পূর্ণ। সম্প্রতি উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে নারীহরণ বা নারীনির্য্যাতনের খবর প্রায় প্রত্যহই কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় সম্প্রতি ইহার প্রতিকারকল্পে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি।

সংবাদ পত্র হইতে যতদূর জানা যায়, নির্য্যাতিতা বা অপহৃতা রমণী প্রায়ই হিন্দু, এবং নির্য্যাতন বা অপহরণকারী প্রায়ই মুসলমান। সম্ভবতঃ ইহা দেখিয়া কোথাও কোথাও ইহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। "ছোলতান" পত্রিকা মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদ সঙ্গত অর্থাৎ এই অত্যাচার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক নয় বলিয়াই মনে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে। এ ক্ষেত্রে তাহাই কারণ, সাম্প্রদায়িকতা নহে। কখনো কখনো পরাক্রান্ত দুশ্চরিত্র হিন্দু জমিদার দ্বারাও এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানই মুসলমানপ্রধান। সাধারণতঃ সাহস ও শারীরিক বলে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুরা মুসলমানদের গোঁয়ার বলিয়া খানিকটা ভয়ও করে। ইহা একটি কারণ, এবং হিন্দুনারীকে একবার বাড়ীর বাহিরে আনিলে সমাজ আর তাহাকে গ্রহণ করিবে না এবং নির্য্যাতনকারীর শাস্তিবিধানের জন্য উদ্‌যোগী হইবে না ইহাতেও মন্দলোকে অত্যাচার করিতে সাহস পায়।

কিন্তু এ বিষয়ে নারীরও করণীয় আছে। আত্মশ্রদ্ধায় সবল হইয়া নারীত্বের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। মানসিক তেজে তেজস্বিনী হইয়া বাধা প্রদান করিলে, অতি দুর্ব্বৃত্তের পক্ষেও অত্যাচার করা সহজ-সম্ভব হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্যই নারী বাধা প্রদান করিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু সকল জায়গায় না হইলেও বহু জায়গায়ই মানসিক তেজ ও শক্তির নিকট অসৎ লোক ভয় পাইয়া থাকে। ইহা কবিত্ব নয়, অতি সত্য কথা। নারীদের আত্মসম্ভ্রম রক্ষার্থে মানসিক তেজ ও সাহসে শক্তিমতী হওয়া চাই-ই, পূর্ব্বকালের রাজপুত মহিলাদের মতন অস্ত্র সঙ্গে রাখার পদ্ধতি প্রচলিত করিতে পারিলে বোধ হয় মনে সাহস আসিবে।

এই সকল অত্যাচারী লোক সাধারণতঃ কাপুরুষ হইয়া থাকে; দু'চার জায়গায় নির্য্যাতনকারী অস্ত্রাঘাতে আহত এমন কি নিহতও হইয়াছে, একথা জানিলে দুর্ব্বৃত্তেরা পুনরায় এরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে না। মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন "নারীহরণ ঘটিত ব্যাপারসমূহকে অনেকে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। হয়ত অনেকেই অথবা সকলেই ইহা আন্তরিক বিশ্বাস করেন। কিন্তু এব্যাপারে

অপরাধী অধিকাংশ স্থলেই মুসলমান এবং নির্য্যাতিতা নারী হিন্দু হইলেও, কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে যে এইরূপ হইতেছে তাহা আমাদের মনে হয় না। বাস্তবিকও যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে এই সকল অত্যাচার ঘটিয়া থাকে তাহা হইলেও স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে সে কথা প্রচার করা উচিত নয়। এমনও হইতে পারে যে যাহারা এই সকল অনাচারের কর্ত্তা, উহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল— যদিও তাহা সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না—তাহা হইলেও সে জন্য সম্প্রদায় হিসাবে সমগ্র মুসলমান সমাজকে দায়ী করা বা দোষারোপ করা অন্যায়। মুসলমান প্রধান দেশে আমার বাস, এবং আমার বন্ধুগণের মধ্যে অনেক মুসলমান আছেন, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা সামাজিক সংস্কার লইয়া উহাদের সহিত কোনরূপ বিরোধ বা মনোমালিন্যের কারণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই আর কখনও যে হইবে তাহাও আমি সম্ভবপর মনে করি না। অতি সাধারণ-শ্রেণীর মুসলমানও যে নারী-নির্য্যাতনকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন, তাহা কখনও দেখিয়াছি মনে পড়ে না। এই মুসলমান সম্প্রদায়েরই একজন নবাব অসহায়া নারীর সতীত্ব হরণের অপরাধে নিজের একমাত্র পুত্রের শিরচ্ছেদ করিয়া ছিলেন। প্রবল জাতীয়সংস্কার ভিন্ন উহা কখনও সম্ভবপর হইতনা। ইংরাজ রাজত্বে এইরূপ নিরপেক্ষ বিচারের দৃষ্টান্ত কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বস্তুতঃ মন্দলোক সকল সম্প্রদায়েই আছে এবং দুর্ব্বল পাইলেই তাহাদের উপর অত্যাচার করিবে। ইংরাজনারীর উপর অত্যাচার হয় না কারণ উহার পশ্চাতে এতবড় শক্তিশালী একটী শাসনতন্ত্র আছে। ইংরাজ নারীর উপর অত্যাচার উহারা কখনও বরদাস্ত করিবে না। আমরাও যদি নারীর উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হই তাহাহইলে একদিনেই এই সকল অত্যাচার বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

"এ সম্পর্কে আমার একটী দৃষ্টান্ত মনে পড়িল। কোন গ্রামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রূপবতী যুবতী পত্নী লইয়া বাস করিতেন। সেই গ্রামেই একজন পরাক্রান্ত মুসলমান জমিদারের বাস। জমিদার একদিন রাত্রে লোকজন পাঠাইয়া যুবতীকে অপহরণ করিলেন। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের নিকট প্রস্তাব আসিল, তুমি গরীব, তুমি অমন রূপবতী পত্নীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবে কিরূপে? আমি তোমায় যথেষ্ট জায়গাজমি দিব, সংসারে তোমার কোন অভাব থাকিবে না, তুমি এবিষয় লইয়া আর নাড়া চাড়া করিওনা, এইখানেই ব্যাপারটী শেষ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপত্নী বিনিময়ে স্বীকৃত হইয়া নিজের সংসারের অভাব দূর করিলেন। আর ব্রাহ্মণীরও যে জীবনে বৈধ স্বামীর বিচ্ছেদ বিশেষ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের মূলেই যে ব্যাধি রহিয়াছে, এই ব্যাধি দূর না করিতে পারিলে এই পাপেরও প্রতিকারের আশা সুদূর পরাহত।

"আমি নিম্নে আরও দুইটী উদাহরণ দিলাম। আমাদের মা বোনেরা উহা হইতে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে পারেন। কামুক লোকেরা সাধারণতঃ সাহসের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ নয়। তবে অবস্থা বিশেষে উহারা এতদূর মরিয়া হইয়া উঠিতে

পারে যে ক্ষেত্রে উহাদের অন্তর্জ্ঞান লুপ্ত হয়। অন্য কোন প্রতিকারের উপায় না থাকিলে সে অবস্থায় প্রতিকারের একমাত্র উপায় হত্যা করা। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই চরম উপায় অবলম্বন অহিংসার বিরোধী নয়, বরং ইহা পরম করুণারই কাজ। অহিংসা অথবা নৈতিকনিয়মেরও উহা বিরোধী নয়। বিপদে পড়িলে আমাদের মা বোনেরা যেন একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন। যাহারা অসদিচ্ছাপ্রণোদিত উহারা কখনও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইবে না, এবং এই সম্ভাবনাই উহাদিগকে অত্যাচার হইতে বিরত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। উপায় আমি বলিয়া দিলাম, এখন প্রয়োগ মায়েদের হাতে।

"আমি উপরে যে দৃষ্টান্ত দুইটীর উল্লেখ করিয়াছিলাম উহাদের একটী ঘটিয়াছিল পাঞ্জাবে। কোন রেলওয়ে লাইনে একটী ইংরেজ জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে। স্ত্রীলোকটী লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে আত্মহত্যা করেন।

"দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী আধুনিক; চরমনাইরে গতবৎসর ঘটিয়াছিল। জনৈক পুলিস কনষ্টেবল একটী মুসলমান রমণীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইলে রমণী উহাকে বঁটি লইয়া তাড়া করেন, তখন সে পলাইয়া যায়। মাললক্ষ্মীগণ আশা করি এই দৃষ্টান্তটী মনে রাখিবেন। ইহাতে অনেক সময় উঁহাদের সম্মান রক্ষা হইবে।

"আর একটী কথা আছে। দুর্ব্বৃত্তের বশ্যতা কেহ কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিবেন না। ইহাতে হয়ত অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাও সহ্য করিতে হইবে। যে বিষয়ের মূল্য যত অধিক উহার জন্য তত অধিক ত্যাগও স্বীকার করিতে হয়।" তরুণভারত।

লাঞ্ছিতা নারীদের রক্ষার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উহার সাফল্য কামনা করি। আশা করি সকলেই তাহা করিবেন। কিন্তু এই আন্দোলনে যেন সম্প্রদায়বিশেষের আন্দোলন না হয়, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই নিজস্ব জ্ঞানে ইহাতে আন্তরিক ভাবে যোগ দিবেন আমরা এই আশা করি। এইখানে আর একটী প্রশ্ন রহিয়াছে; নির্য্যাতিতা নারীগণ সমাজে স্থান পাইবেন কিনা? এ প্রশ্নও অনেক স্থানে নির্য্যাতনের সহায়ক হয়। সমাজের ইহা বিশেষ চিন্তা ও সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা উচিত।

* * * * * *

আহমদাবাদে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে স্বরাজ্যদলের রাজনৈতিক কৌশলের সহিত মহাত্মা গান্ধীর সরল অকপট আদর্শের সংঘর্ষ হইয়াছিল। অবশ্য ভোট গণনায় তিনি জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু দেশ তাঁহার উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই ইহা বুঝিতে পারিয়া, ভোটগণনায় জয়ী হইয়াও, তিনি নিজেকে পরাজিত মনে করিতেছেন ও তাহা অকপটভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিদিন কিছু না কিছু সময় চরকা কাটিয়া সুতা

প্রস্তুত করিতে হইবে, নতুবা নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত থাকিতে পারা যাইবে না. এরূপ আদর্শ আপাতকলাকাঙ্ক্ষী কাহারও নিকট আদরণীয় হইতে পারে না; কিন্তু মহাত্মার এই নির্দ্দেশের মধ্যে যে মহান ভাব নিহিত ছিল, তাহা স্বরাজ্যদল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। একটা বড় কাজে সফলতা লাভ করিতে হইলে, দিনের মধ্যে অন্ততঃ কিছুক্ষণ সেই ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে, অন্য কাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য একটী তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে জাগরূক রাখিতে হইবে, এ অতি সত্য আদর্শ। গ্রেটবৃটেনের নিকট আমাদের দাসত্ব শুধু রাজনৈতিক নহে, কিন্তু প্রধানত: Industrial (শিল্পবিষয়ক), এই ভাবটা মনের মধ্যে দীপ্তভাবে জাগাইয়া না রাখিলে চলিবে না। মহাত্মা তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী কয়েদের সময় এই চিন্তাই করিতেছিলেন, তাই কারাগার হইতে বাহির হইয়া তিনি যখন দেখিলেন যে দেশে গঠনমূলক কার্য্য আশানুরূপ চলিতেছে না তখন এই আদর্শ দেশের নিকট উপস্থিত করিলেন। চরকা শুধু চরকার সুতার জন্য নহে, চরকা মহাত্মার নিকট যে ideal প্রচার করে ভারতের প্রত্যেক কর্ম্মীর নিকট সেই ideal প্রচার করুক এবং প্রত্যেক কর্ম্মীর হৃদয়ে সেই ভাব বদ্ধমূল হউক, ইহাই মহাত্মার আদর্শ। এই ব্রত ছয়মাস পালন করিলে প্রত্যেক কর্ম্মীর মনে, স্বদেশজাত পণ্যের প্রতি এমন একটী গভীর ভালবাসা আসিবে, যাহাতে দেশে স্বরাজের একটা তীব্র সজাগ ভাব ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইবে। মহাত্মার এই ভাবটা অবহেলার সহিত উড়াইয়া দেওয়ার জিনিষ নয়।

বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের একটী বিশেষ অখ্যাতি আছে। চরকার সুতা কাটার প্রস্তাব গ্রহণ ও পালন করিয়া জনসাধারণকে তাহা করিতে উৎসাহিত করিলে অন্ততঃ একটী বিষয়ে এ অখ্যাতি দূর হইবার সম্ভাবনা; যদি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর প্রতি সভ্য প্রতিদিন বাড়ীতে আধ ঘণ্টা সুতা কাটিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশে কি বিপুল একটী সাড়া পড়িয়া যাইবে ভাবিয়াছেন কি? সেই দিক হইতে এ কথাটী আমরা একবার ভাবিয়াও দেখিতেছি না। উদাহরণস্বরূপ এই কথাটী বলিতেছি, কেহ ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করিবেন না; যদি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অসংখ্য কার্য্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন আধঘণ্টা সুতা কাটেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারের প্রত্যেকে ক্রমে ক্রমে আপনা হইতে একাজে প্রবৃত্ত হইবেন। কাহাকেও বলিবারও প্রয়োজন হইবে না। একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্ত্তা—কর্ম্ম বহুলতায় যিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত—তিনিও নিষ্ঠা সহকারে আধঘণ্টা সুতা কাটিতেছেন, ইহা দেখিলে তাঁহার আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশী ভৃত্য সকলের ভিতরই চরকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিবে; স্বরাজ্যদল দেখিতে পাইবেন কত অল্পদিনে দেশ গঠনমূলক কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মফঃস্বলে সর্ব্বত্রই অশিক্ষিত লোকের কংগ্রেসের প্রতি একটী গৌরবের ও বিশ্বাসের ভাব আছে। সমস্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত পুরুষ ও নারীকে এই একটী কাজে—যাহা স্বরাজলাভের অন্যতম উপায় এবং যাহা ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেকের নিজের জীবনকে বিকশিত করিবার একটী উপায়—যুক্ত করিতে পারিলে তাহা জাতীয়

একত্ববোধকে জাগ্রত করিতে বিশেষ সাহায্য করিবে। পূর্ব্বে দেশে চরকার বহু প্রচলন ছিল এখন প্রতিদিন অনেকটা সময় বসিয়া পরনিন্দায় কাটাইতে পারি কিন্তু তবুও চরকা কাটিতে পারি না, মনের ভাব এমনিই অলস হইয়া গিয়াছে। এই আরামপ্রিয়তা এই শ্রমবিমুখতা হইতে দেশকে ফিরাইতে হইলে, প্রথমে দেশের বড় বড় নেতাকে এই কাজের গৌরব দেখাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে তাঁহাদের অনেক অসুবিধা ও কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু এই কষ্ট ও অসুবিধার ফল কত বেশী হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর এ কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি থাকিতে পারে না। দেশের জন্য তাঁহারা কারাবরণ করিয়াছেন এবং করিতে প্রস্তুত আছেন, দেশের জন্য তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। দেশের জন্য এখন চরকা কাটিতে অল্প কিছু সময় ও শক্তি দান করুন, দেখিবেন, তাহা বৃথায় যাইবেনা। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশ চরকা গ্রহণ করিবে চরকা বুদ্ধাদের একচেটিয়া, ইহার উপর এই যে একটী তাচ্ছিল্যের ভাব, তাহা দূর করিয়া দেশকে স্বরাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। কেহ বলিতে পারেন, চরকা সমগ্র দেশের কাপড়ের অভাব মোচন করিতে পারে না। মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিবে না। উত্তরে বলা যায় যে পল্লীগ্রামে প্রতি গৃহে কার্পাস গাছ হইলে তাহার তুলা হইতে নিজে সুতা কাটিয়া কাপড় বুনিলে বা বুনাইয়া লইলেও নগদ খরচ মিলের কাপড়ের দাম অপেক্ষা কম পড়িয়া থাকে; ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় ইহা অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি মফঃস্বলে গিয়া আমরা দেখিয়াছি সেখানকার কোন আশ্রমের ছেলেরা বাড়ী বাড়ী কার্পাস বীজ ও চরকা দান করিয়া বেড়ান, কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা গ্রহণ করিতে চাহেন না। ছেলেরা বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কাছে গিয়া অনুনয় করিয়াছেন, "বীজ দিতেছি গাছ লাগাইবেন তুলা দিতেছি অবসর সময় সুতা কাটিয়া আমাদের দিলে আমরা কাপড় তৈয়ার করাইয়া দিব।" অধিকাংশ জায়গায় তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া থাকেন। ইহার কারণ আর কিছু নয়, চরকার উপর বিশ্বাসের অভাব। কংগ্রেসের ও স্বরাজ্যদলের শিক্ষিত সম্মানিত নেতাগণ চরকা কাটিতেছেন দেখিলে ইহা পল্লীতে পল্লীতে অতি সহজে ছাইয়া যাইবে।

একটু সময় ও শক্তি খাটাইয়া অন্ততঃ একটী বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারি, নিজের কাপড় নিজে যোগাইতে পারি, ইহা জানিয়াও শুধু কর্ম্মের গৌরব বোধ না থাকাতে তাহা করি না। অন্ততঃ একটী বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে, নিজের কাজ নিজে করিতে পারিলে ও নিজের অভাব নিজে মোচন করিতে পারিলে আত্মমর্য্যাদা ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠিবার সহায়তা হয়।

আর একটা কথা। স্বরাজ্য দল বলিয়াছেন বাধ্যবাধ্যকতার কথা থাকিলে তাঁহারা কোন জিনিষ গ্রহণ করিতে পারেন না সেইজন্য এই গঠনমূলক কাজটী গ্রহণ করেন নাই ও করিতে পারেন না। পরস্পরের উপর বিশ্বাস থাকিলে বাধ্যবাধকতা তিক্ত বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক মহাত্মা গান্ধি এসব দেখিয়া ও শুনিয়া তাঁহার প্রস্তাব হইতে শাস্তিমূলক অংশটী বাদ দিয়াছেন। কিন্তু সুতাকাটা চাই-ই, ইহা প্রত্যেক সভ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। এবিষয়ে স্বরাজ্যদল মন দিলে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে।

আহমদাবাদ Conferenceএর পর মহাত্মা মর্ম্ম বেদনায় বিদ্ধ হইয়া মনের আবেগে অশ্রু পাত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রভুত্ব দেশে কমিল কি বাড়িল, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাঁহার সহকর্ম্মীদের নিকট দেশসেবার আদর্শ নাগপুর হইতে সিরাজগঞ্জে ও পরে আহমদাবাদে কতদূর নামিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া কঠোর তপস্বী আদর্শবাদী মহাত্মা স্বভাবতঃই বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। পারেনও না।

* * * *

সিরাজগঞ্জের গোপীনাথসাহার সংক্রান্ত প্রস্তাবের পক্ষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনেকেই ভোট দিয়াছিলেন। অহিংসনীতির আদর্শ সমাদৃত হইতেছে না ইহা মহাত্মাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছে। তবে যাঁহারা এ বিষয়ে মহাত্মার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই Anglo Indian কাগজওয়ালাদিগকে একটা শক্ত জবাব দেওয়ার জন্য এইভাবে ভোট দিয়াছিলেন। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব ও স্বরাজদলের প্রস্তাবের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। এই কথাটী আমরা কোন মতেই বুঝিতে পারিতেছি না মহাত্মার প্রস্তাবের মূল কথা, গোপীনাথের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, হত্যাকে কোন মতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না, দেশের উপকারের জন্যও না। আর স্বরাজ্যদল বলিতেছেন, হত্যা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য যদি মহৎ হইয়া থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্যকে সম্মান করিতে হইবে। এই উভয়ের মধ্যে এরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে যে দাশ মহাশয় কিরূপে উভয় প্রস্তাবকে একার্থজ্ঞাপক মনে করেন, বোঝা গেলনা। তবে, একই কথা বড় গলায় জোর করিয়া অনেকবার বলিতে পারিলে লোকে শেষে উহা বিশ্বাসও করিতে পারে, ইহা একটা প্রকাণ্ড রাজনৈতিক চাল; যদি এই চাল অবলম্বন করিয়া দেশকে তাঁহার অভীপ্সিত পথে চালাইতে চান তবে তাঁহার চালের প্রশংসা করিতে হয়। সকলেই জানেন বারে বারে ও দল বাঁধিয়া বলিতে জানিলে কালোকেও সাদা করা যায়।

* * * *

আহমদাবাদের ফলে এখন কংগ্রেসে দুই দল হইয়া দাঁড়াইল, অন্যান্য প্রদেশে কি হয় বলা যায় না; তবে বঙ্গদেশে স্বরাজ্যদলেরই প্রাধান্য থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বরাজ্যদল যেভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কর্ম্মপটুতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বাংলা গবর্ণমেন্টের সঙ্গে স্বরাজ্যদলের যেরূপ পর পর যুদ্ধ (running fight) চলিয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেন্টকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। গত কাউন্সিলের অধিবেশনে মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট যেরূপ ভাবে Reform Actএর মূলনীতিকে (spirit) পদদলিত করিয়া সেই মন্ত্রীদিগকে পদে বাহাল রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কিছু প্রায়শ্চিত্ত জষ্টিস সি, সি, ঘোষের কোর্টে হইয়া গিয়াছিল। হাইকোর্টের একজন মহামান্য জজ মনে করেন যে গবর্ণমেন্ট আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। ইহাতে গবর্ণমেন্টের প্রেষ্টিজ যে কোথায় অবলুণ্ঠিত

হইল, তাহা গবর্ণমেন্ট ভাবিয়াছেন কি ? গবর্ণমেন্টপক্ষীয়েরা বলিতেছেন, এই বিষয়ে হাইকোর্টের বিচার করিবার কোন ক্ষমতা নাই ; যদি তাই-ই হয় তবে এ বিষয়ে আইনের ঠিক অর্থ জানিবার জন্য Advocate Generalএর মত লওয়া হইয়াছিল কেন ? দেখা যায়, আইনের ঠিক অর্থ কি সে বিষয়ে গবর্ণর বাহাদুরেরই কিছু সন্দেহ ছিল ; তবে তিনি বিলাতে সলিসিটার জেনারেলের মত আনাইলেন না কেন ? লর্ড রোনাল্ডসের সময় ঠিক এরূপ বিষয়ে এডভোকেট জেনারেলের মতের বিরুদ্ধে সলিসিটার জেনারেল মত দিয়াছিলেন এবং সলিসিটার জেনারেলের মতই প্রবল হইয়াছিল। এ অবস্থায় যদি এডভোকেট জেনারেলের মতের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের জজের মত গ্রহণ করা হয় তবে দোষ কোথায় ? Executive গবর্ণমেন্ট যদি ব্যবস্থাপক সভায় নিয়মাবলী যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে হাইকোর্ট সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না কেন ?

* * * * * *

মিঃ জষ্টিস ঘোষের বিচারের পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, ও আপীল কোর্টে মোকদ্দমা চলিবার পর গভর্ণমেন্ট যে ভাবে নূতন নিয়ম জারী করিয়া সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে, গভর্ণমেন্ট জষ্টিস ঘোষের বিচার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি পুরাতন নিয়ম অনুসারে প্রেসিডেন্টের কাজ যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে, তবে তাহার বিচার আপীল কোর্টে নিষ্পত্তি হইবার আগেই গভর্ণমেন্ট নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতেন না। এই ভাবে শেষ মুহূর্ত্তে নিয়ম করাতে গভর্ণমেন্ট মোকদ্দমার হাঙ্গাম ও বিচারের ফলাফলের অনিশ্চিততার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে গভর্ণমেন্ট কিংবা মন্ত্রীদিগের কতদূর মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে আমরা জানি না। মন্ত্রীদিগের উপর অনাস্থা (No confidence) প্রকাশের পরেও তাঁহাদিগকে বাহাল রাখিবার জন্য গভর্ণমেন্টের দরদ দেখিয়া সন্দেহ হয় যে তাঁহারা Reform Act অনুসারে জনসাধারণের লোক (member responsible to the people), না গভর্ণমেন্টেরই অন্যতম কর্ম্মচারী ? যে দায়িত্ব (Responsibility) প্রবর্ত্তন করিবার জন্য মন্ত্রী পদের উৎপত্তি তাহার সার্থকতা কোথায় ?

* * * * * *

২৬শে আগষ্ট আবার কাউন্সিলের বৈঠক বসিবে। সম্ভবতঃ তাহাতে আবার মন্ত্রীদের বেতন Supplementary বজেট হিসাবে পেশ হইবে। একবার সেই বজেট স্বরাজ্য ও ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্টদল নামঞ্জুর করিয়াছেন। বিগত ঘটনাবলী বিচার করিলে নিশ্চিতই আশা হয় যে এবারেও বজেট পাশ হইবে না। তাহা হইলে গভর্ণমেন্ট কি করিবেন ? বাঙ্গালাদেশে এইবারে Dyarchyর শেষ পরীক্ষা হইবে। এই উপলক্ষে আগামী কাউন্সিলের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া স্বরাজ্য পার্টি কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন, এ বার তাহারই শেষ মীমাংসা হইবে। যদি গভর্ণমেন্ট কাউন্সিল হইতে বজেট পাশ করাইতে পারেন, তবে মন্ত্রীদিগের বাহাল থাকিবার আর কোন বাধা থাকিবে না। যদি না পারেন, তবে প্রশ্ন উঠিবে এমন কেহ আছেন কি না, যাঁহারা মন্ত্রীপদ পূর্ণ করিতে পারেন ও যাঁহাদের উপর কাউন্সিলের আস্থা আছে। সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিলে তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়। গত ২৫শে জুলাইএর Forward পত্রিকায় মিঃ দাশ যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন তাহাতে তিনি Dyarchy is Dead বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাতে স্বরাজ্য পার্টির অভিপ্রায় পরিষ্কার বোঝা গিয়াছে। তখন গভর্ণমেন্টকে বিচার করিতে হইবে যে বাংলা দেশে মন্ত্রীত্ব থাকিবে কিনা। এবারে সেই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বড় লাটের সঙ্গে এই বিষয় নিয়াই প্রাদেশিক গভর্ণরদের বৈঠক বসিতেছে। এবারে তাহার মীমাংসা হইবে। আগামী কাউন্সিলে বাংলার প্রতিনিধিগণ যাহা করেন, তাহার উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] ভাদ্র, ১৩৩১ [৫ম সংখ্যা

চীন ও জাপানে ভারতের বাণী

আমাকে অনেকে অনুরোধ করেছেন যে আপনাদের কাছে চীন ও জাপান ভ্রমণের বিবরণ কিছু বল্‌তে হবে। এইজন্যই আমার বন্ধুরা এই সভা আহ্বান করেছেন। আমি যে ঠিক এ সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত, এ কথা স্বীকার করতে পারিনে। আমার মন প্রস্তুত হয় নি; তার কারণ প্রথমতঃ এই যে, চীন ও জাপানে যে কাজে আমি আহূত হয়েছিলেম, তাতে নিজে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকায় চারিদিকের সমস্ত অবস্থা দেখ্‌বার অবকাশ আমার হয়নি। আমার সঙ্গী বন্ধুরা যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিলেন—সে দেশ ও সে দেশের লোকের সঙ্গে পরিচয় বিস্তারিত করবার তাঁদের যথেষ্ট সময় ছিল। আমাকে আমার বিশেষ কাজে ব্যাপৃত থাকৃতে হওয়ায়, আমি ভাল ক'রে সেখানকার দর্শনীয় সমস্ত দেখেছি একথা বল্‌তে পারিনে। সে দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশে তাদের অন্তরের কথা জান্‌বার সুযোগ আমি পাইনি। আমার পক্ষে আমার কর্ত্তব্য পালনই দুরূহ ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আপনাদের মধ্যে অনেকে আজকের দিনে আমার ভ্রমণ বিবরণ শুন্‌তে উৎসুক হয়ে এসেছেন মনের ভিতরে একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এ কথা আমি বুঝতে পারছি যে আমার এ ভ্রমণের ভিতরে আমাদের ভারতবর্ষের কোন গৌরবের কথা আছে কি না সেইটাই আপনারা শুন্‌তে উৎসুক। কেউ কেউ বোধ হয় ভাব্‌ছেন যে এসিয়ার নানা দেশকে এক করতে পারলে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হতে পারে—সে প্রয়োজনে আমার ভ্রমণ কোন সহায়তা করেছে কি না একথা আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি বল্‌তে চাই, এরকম কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি যাইনি। স্বদেশের গৌরব প্রখ্যাত করবার জন্য অন্য দেশে যাবার কোন প্রয়োজন আছে এ আমি মনে করিনে। আমি যা বল্‌ব তা' হয়ত আপনাদের ইচ্ছার সঙ্গে মিল্‌বে না।

আমি বল্‌ছিলাম স্বদেশের বিশেষ কোন গৌরব ঘোষণা করবার জন্য, অন্যদেশে গিয়ে ভারতের জয়কীর্ত্তনের জন্য আমি চীনে যাইনি। যাঁরা আমাকে

ডেকেছিলেন, আমার প্রতি তাঁদের একটা শ্রদ্ধা ছিল; মানুষের কাছে মানুষ যেমন সাহায্য পায় তেমনি সাহায্য চেয়ে তাঁরা আমাকে ডেকেছিলেন। আমিও সহজ মানুষের মত সে দেশে গিয়েছিলেম। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে এসিয়াকে একত্র করবার জন্য আমি যাইনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সহজ সম্বন্ধ তেমনি ভাবে গিয়েছিলেম। সেইজন্য তাঁরাও আমাকে সহজে গ্রহণ করেছেন। Propaganda বা প্রচারের উদ্দেশ্য মনে নিয়ে গেলে সহজ সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে তা' অন্তরায় হ'ত; প্রচারের ইচ্ছ‍া মাত্র আমার ছিল না।

চীন সম্বন্ধে আমার বহুদিনকার একটি কল্পনা ছিল। সর্ব্বপ্রাচীন সভ্যতা রয়েছে চীনদেশে। সেই সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রাণশক্তির স্থান কোথায় তা আমি জান্‌তে চেয়েছিলেম। যে কোন দেশেই মনুষ্যত্ব আপনার প্রাণকে জয়ী করেছে—বর্ব্বরতার মধ্যে দিয়ে নয়—সে দেশের মানুষের একটা গৌরব আছে, তাদের সভ্যতার একটি শক্তি আছে। যুগযুগান্তরের বিপ্লব বিরোধ অগ্রাহ্য করে চৈনিক সভ্যতা যে আপনার বিপুল প্রাণকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে এ একটা দেখ্‌বার জিনিষ। যেমন তীর্থে দেবতাকে অনুভব করা যায় ভক্তির সাহায্যে, তেমনি শ্রদ্ধার ভিতর দিয়েই একটা জাতির বিরাট সঞ্জীবনী শক্তিকে অনুভব করা যায়। তার বেদী, তার মন্দির দেখে আমি ধন্য হব এই আমার মনের ইচ্ছা ছিল। আমি সে দেশকে কিছু দেব একথা আমার মনে ছিল না।

এই নূতন দেশে যাওয়ার একটা বাধা আছে। এর ভিতরে বহু যুগযুগান্তরের প্রবাহিত প্রাণধারা বিচিত্রভাবে কাজ করচে, কত বাধা বিকৃতির ভিতর দিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে, ধর্ম্মে ও সমাজে। কিন্তু কত বড় একটা পর্দ্দা রয়েছে আমাদের মাঝখানে—ভাষা ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, চেহারাও ভিন্ন। সমস্ত প্রাচীন আচার ব্যবহার অতিক্রম করে জাতির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে—এই ছিল আমার সঙ্কল্প। এর একমাত্র উপায় ছিল অন্তরের ভিতরে শ্রদ্ধা নিয়ে নত হয়ে যাওয়া। মাথা তুলে গেছে মিশনরীরা, বলেছে, 'আমরা তোমাদের চেয়ে উঁচুতে আছি, তোমাদের কিছু দিতে এসেছি।' অন্য দেশের লোককে এ রকম অপমান করার অধিকার কারো নেই। কোন বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠতা বা গৌরব থাকলেও যে জাতি যুগযুগান্তরের বিরুদ্ধতা বহন করে আজ পর্য্যন্ত সজীব রয়েছে, তার মাহাত্ম্য ভক্তির যোগ্য, তার ভিতরে একটি দৈবীশক্তি আছে। ভগবান কিরূপে তাঁর বহুধা শক্তি বহুবিস্তৃত করেছেন তা দেখ্‌তে পেলে জগতের একটা বিশেষ সত্য উদ্ঘাটিত হবে। কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য থাক্‌লে কেউ কখনো কোন জাতির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ পারবেন না। আমি নত হয়ে সহজ মানুষের মত গিয়েছিলেম; গিয়ে সেখানকার বন্ধুদের আতিথ্য দেখে আমি বিগলিত হলেম। তাদের আমি বল্‌লেম, 'তোমরা আমাকে দার্শনিক মনে করেচ, Prophet বা ঋষি মনে করেচ; দেশবিদেশে আমার এ মিথ্যা বর্ণনার জন্য আমি লজ্জিত; আমার কাছে তোমরা কিছু প্রত্যাশা কোরো না। শুধু কবিরূপে আমি তোমাদের নিকট আস্‌তে চাই; বেদীতে আরোহণ করে উপদেশ দিতে আমি চাই নে।' তারা বল্‌লে, 'তুমি ভারতের লোক, তত্ত্বজ্ঞানের বোঝা ঘাড়ে করে তুমি এনেছ।' আমি বল্‌লেম,

'আমি কিছুই জানিনে। প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে হৃদয় দিয়ে প্রবেশ করবার পাথেয় ভগবান আমাকে দিয়েছিলেন। তাতে যদি না হয় তবে আমার আর কোন সম্বল নেই'। এর পূর্ব্বে পশ্চিম থেকে অনেক বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী শিক্ষক নিমন্ত্রিত হয়ে চীনদেশে গিয়েছিলেন। তাঁরা সব চিন্তাশীল লোক—Bertrand Russell, Dewey—তাঁরা তাঁদের নানারকম জ্ঞানের অর্ঘ্য আহরণ করে চীনের যুবকদের উপর গুরুগিরি করে এসেছেন, স্কুলের চেয়ারে বসে। যে কথা তাঁরা ভাল মনে করেন তা বলেছেন, অনেক রহস্যময় কথাও বলেছেন। আমি যখন চীনে নিমন্ত্রিত হলেম তখন আমার মনের ভিতরে একটা ভাবনা হল যে সেই আসনে বসে আমি তাদের কি দেব। আমি বল্‌লেম, 'আমার কাছ থেকে কিছু নিতে হলে এগিয়ে এসে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে হবে। এম্‌নি করেই কবির সঙ্গে মাল্যবিনিময় হয়। আমি ভারতের তত্ত্বজ্ঞান ও ঋষিদের বাণী কিছুই দিতে পারব না।' তারা একথা স্বীকার করে নিল, খুসীও হল। তাদেরও যেন একটা ভাবনা চলে গেল। তারা যদি মনে করে যে তাদের মধ্যে একজন অতি-মানুষ ঋষি গভীর জ্ঞান নিয়ে এসেছেন, তা'হলে সহজে তারা স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না। তাঁর সাম্‌নে হাস্‌তে, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, তাঁর ঘরে আস্‌তে তাদের ভয় হয়। কাজেই আমার কথা শুনে তারা যেন বাঁচলে, বল্‌লে, 'তুমি আমাদের আপনার লোক'। আমি বল্‌লেম, 'আপনার লোক হয়েই আমি তোমাদের মাঝে থাক্‌ব। তোমরা যদি আমাকে শুধু ভারতের কবিরূপে না দেখে, চীন জাপানের কবিরূপে, এসিয়ার কবিরূপে দেখতে পাও, তবে আমি তাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার বলে মনে করব। গুরুগিরি করতে আমি আসিনি, সে আমি পারব না।'

আজকে আমার এই ভূমিকায় যা বল্‌লাম সে কথা মনে রেখেই আমি কাজ করেচি। চীনের অল্পবয়স্ক যুবকেরা আমাকে তাদের বয়স্য বলে জেনেছে। তারা খবর পায়নি যে ৬৩ বছর আমার উপর দিয়ে গিয়েছে। অতি সহজে তারা আমাকে ভালোবেসেচে—যথার্থ অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে। মাষ্টার বলে আমাকে জানেনি। সেইটেই হচ্চে আমার সবচেয়ে বড় সফলতা। যারা আমাকে ডেকেছিল তারা বলেছিল যে সেখানে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। আমি দেশে থাকার সময় ভেবেছিলুম যে কয়েকটা বক্তৃতা লিখে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। সে বিষয়ে আমার মনে একটা সঙ্কোচ ও উদ্বেগ ছিল। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে এমন একটা মুস্কিলে পড়েছিলেম যে কিছুতেই আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মন স্থির করতে পারলেম না। আমার পক্ষে একটা দুরূহ অন্তরায় হয়েছিল,—আপনারা হয়তো শুনে হাস্‌বেন—যে তখন প্রতিদিনই একটা গানের নেশা আমাকে পেয়ে বস্‌ত। সেই গানের বোঝা আমাকে পিছিয়ে দিচ্ছিল ক্রমাগত। জাহাজে উঠে ভাব্‌লুম, না, আর দেরী নয়। সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন জাহাজের ক্যাবিনে বসে কোন কিছু রচনা করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু সে কৃচ্ছ্রসাধনও আমি করেচি। জাহাজে আমি কিছু লিখে নিলেম।

প্রথম যেখানে আমি নাব্‌লুম, সে হচ্চে রেঙ্গুন। রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশে নেই—সেখানে আর সব লোক আছে, নেই শুধু ব্রহ্মদেশের লোক অনেক চীনবাসী সেখানে আছে।

রেঙ্গুনপ্রবাসী ভারতীয়েরা উচ্চকলস্বরে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন—অবশ্য তাঁরা না করলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কেননা, আমি তখন ঠিক তাঁদের অতিথি নই। কিন্তু চীনের লোকেরা যখন আমাকে আমন্ত্রণ করে অভ্যর্থনা করলেন তখন আমি মনে তৃপ্তিলাভ করলুম। সেই আমার চীনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। রেঙ্গুনে একটী চীনা বিদ্যালয় আছে—তার যাঁরা অধ্যক্ষ তাঁরা আমাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাতে আমি বড় আনন্দ পেয়েছিলেম, সেখানে সহজ আত্মীয়তার প্রথম স্বাদ লাভ করেছিলেম। তাঁরা আমাকে ডেকে, চা খাইয়ে, আদর করে বল্লেন, 'চীনের প্রতি তোমার যা বক্তব্য তা আমাদের বল। কেননা সেখানকার অনেকেই ইংরেজী জানে না। আমরা অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেব।' আমি দেশবিদেশে অনেক জায়গায় বক্তৃতা করতে গিয়েছি, সম্মানও পেয়েছি। কিন্তু একটি কারণে চীন আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। আমি জান্‌তেম যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সংস্পর্শ তা' আমি পাব। আমার কাছে প্রাচ্যদেশের নিমন্ত্রণই সত্য আতিথ্য। এখানে শুধু করতালি নয়, শুধু আর্থিক পুরস্কার নয়, নিমন্ত্রণকর্ত্তার হৃদ্যতা লাভ করব। আমি তাদের বল্লেম, 'তোমরা যারা আমার শ্রোতা ও সম্মানকর্ত্তা তাদের আমি জানাচ্ছি—মানুষ আপনার ঘরে আদর অভ্যর্থনা পেয়ে থাকে, তিক্ত ব্যবহারও যে না পায় তা নয়; কিন্তু যাদের সঙ্গে জাতিগত যোগ নেই, ভাবে ভাষায় যারা পৃথক, সেখানকার আত্মীয়তার অমৃতধারা উৎসারিত হয় মনুষ্যত্বের উৎস থেকে। সর্ব্ববিধ কুহেলিকা ভেদ করে মনুষ্যত্বের এই স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত জ্যোতি যে ভোগ করতে পারে সে ধন্য। আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে, যারা পরদেশ-বাসী, ভিন্নভাষাভাষী, তারা যেন আমাকে তাদের আপনার লোক বলে জানে, তাদের হৃদ্যতা যেন আমি লাভ করতে পারি। এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই, এইটুকু পেতেই আমি যাচ্ছি।' আমার কথায় তারা খুসী হ'ল।

তারপর এই ব্রহ্মদেশের চীন সমাজের কাজে বিদায় নিয়ে আমরা মালয়-উপদ্বীপে উপনীত হলেম। সেখানে কতকটা স্বদেশবাসীদের সঙ্গেই আমার মিলন হয়েছিল। আমি অনেক দেশে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু মালয়ে একটা খুব আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছিলেম যা আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। ঐখানে একটা 'ঘাট', সেখান থেকে চীন, জাপান, জাভা অষ্ট্রেলিয়ায় আনাগোনা চলে। কাজেই ওখানে নানাজাতের সমাবেশ আছে। কিন্তু সেখানে পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি জাগেনি। সেখানে য়ুরোপীয়দের মধ্যেও একটা নম্রতা আছে ও সে-দেশবাসীদের প্রতি তাদের কোন বিরুদ্ধভাব নেই। একটা ভাব্‌বার কথা আছে। চীনদেশ হতে বহু শ্রমজীবী এসে সমস্ত মালয় অধিকার করেছে। মালয়বাসীরা পরিশ্রমবিমুখ—এতে তাদের দোষ নেই; তারা অর্থের জন্য মাথা বিকোয় নি, অল্পেই তারা সন্তুষ্ট। অর্থের জন্য যারা মালয় উপদ্বীপে যায় তারা এদের উপর বড় রাগ করে, বলে যে তারা শ্রমবিমুখ, এদের দ্বারা তেমন আয় হয় না। ওখানে দু'দল লোক কাজ করে—চীনের লোক ও ভারতের লোক। ভারতীয়েরা অধিকাংশই সব মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবী শিখ। চীনেরা সব দক্ষিণ চীনের—ক্যান্টনীজ। দেখা যায় যে এমন চীনের লোক সেখানে নেই যে কোন হীন কর্ম্ম করে সমাজে নীচু হয়ে আছে। তারা দরিদ্র অবস্থায় ঘর ছেড়ে বিদেশে এসে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, জমি কিনেছে,

রবারের চাষ করেছে, ঐশ্বর্য্যের যা চিহ্ন—গাড়ী জুড়ী সব করেছে। কিন্তু এসেছিল তারা অকিঞ্চন ভাবে।

এই এক চেহারা। আর একদিকে মাদ্রাজীরা, তারা সেখানে কুলি হিসাবে ভারতের পরিচয় দিয়েছে; তাই সবার অবজ্ঞাভাজন। ৭০ সেণ্ট দিন মজুরী নিয়ে যে খাটে সে ৪০ সেণ্ট পায়, আর ৩০ সেণ্ট নিয়ে যায় কুলী-সর্দ্দারেরা, তাদের নিজেদের দেশের লোক। কুলিরা চিরজীবন খেটেই মরে, এমন উদ্বৃত্ত তাদের থাকে না যাতে তারা স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারে বা ছেলেদের শিক্ষা দিতে পারে। এজন্য পুরুষানুক্রমে তারা দাস্যবৃত্তিতে বদ্ধ। আমার বন্ধু Andrews সাহেব এদের দুর্দ্দশা দূর করবার অভিপ্রায়ে এখন মালয়দ্বীপে আছেন, তিনি হয়তো মালয়ের মহাজনদের গাল দেবেন। এ-রকম গাল দিতে ভালোও লাগে, কিন্তু গাল দিয়ে কোন লাভ নেই। ধনিকদের দয়াদাক্ষিণ্য শেখালেও এদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে না। চিরদিন কৃপার ভিখারী হয়েই এরা থাকবে—সেও কম হীনতা নয়। এরা পরস্পরকে সাহায্য না করে পরস্পরকে শোষণ করতেই ব্যস্ত থাকে। দুদিক থেকে এরা শোষিত হয়, এক উপর থেকে, আর নিজেদের ভিতর থেকে। একত্র হতে না পারলে বিধাতাও এদের বাঁচাতে পারবেন না, চিরদিন কুলি থেকে তারা ভারতের পরিচয় কলুষিত করবে। তারপর শিখেরা। তারা গিয়েছে রাজশক্তির পিছনে পিছনে—দলন করবার হেয় কাজ ছিল তাদের উপর। দাস্যবৃত্তির সঙ্গে ক্ষমতার অভিমানের মত, ধার-করা প্রভুত্ব নিয়ে শক্তির অপব্যবহারের মত, বিষময় বীভৎস জিনিস আর নেই। এদের চেয়ে কুলিরাও বরং ভালো। ভারতবাসীর এই পরিচয় বিদেশে। চীনেরা শিখদের যেমন ঘৃণা করে এমন আর কাউকে নয়—শিখ কনেষ্টবলরা চীনেদের টিকি ধরে অনবরত লাথি মেরেছে, যা ইংরেজ কনেষ্টবলরাও করেনি। আমার হৃদয়ে এ' যা বিদ্ধ হয়েছিল সে আর কি বলব—কত বড় কলঙ্ক এতে! ওখানকার গুরুদ্বারেতে শিখদের আমি বল্লেম, 'তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতের সঙ্গে চীনকে নাড়ীর সম্বন্ধে বেঁধেছিলেন, রাষ্ট্রীয়সূত্রে নয়। প্রেমের ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে দেবার জন্যে তাঁরা মরু সমুদ্র পার হয়ে চীন জাপানে গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখে তোমরা লজ্জা দিলে। গুরুদ্বার কিসের জন্য? নানকের প্রেমের মন্ত্রে এর প্রতিষ্ঠা। গুরুদ্বারে যদি সে বাণী তোমরা বহন করে না আন, তা' হলে সবই বৃথা। সব আপনার লোককে তোমরা অপমান করে গেলে, এসিয়াবাসীর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে দিলে।' একথা আমি তাদের বলেছি।

দুদিকে দুঃখ—প্রভুশক্তি দাসকে অবলম্বন করে আপনার বীভৎসতা প্রকাশ করছে; আর একদল কুলিরূপে আপনার সব মহিমা লুপ্ত করেছে। দুদিক থেকে এই দুই অন্ধকার ভারতবর্ষ বিদেশে প্রেরণ করছে। চীনেতে কিন্তু ভারতবাসীদের দাসভাবেতেও থাকবার যো নেই। চীনেদের সঙ্গে কৌশল বা শ্রমের প্রতিযোগিতায় কেউ পেরে উঠবে না। ওদের সনাতন ধর্ম্ম ও শিক্ষার ফলে এরা একান্ত শ্রমিক, এদের মত কর্ম্মনিষ্ঠ জাত্ জগতে নেই। এজন্যই আমেরিকায় চীনবাসীদের যেতে দেয় না—না যেতে দেওয়ার কারণ এ নয় যে ওদের বাঁকা চোখ বা চ্যাপ্টা নাক—ওদের সকলে ভয় করে। ওরা যথেষ্ট পরিশ্রম করতে ও অল্পব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে। যে কেউ একবার চীনের দ্বারে

গিয়েছেন হংকংয়ে বা সাংহাইয়ে, তিনি দেখেছেন এমন অসামান্য নিয়ত কাজের অভ্যাস কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। জাতির এ একটা মস্ত সম্পদ। কিন্তু একটু সন্দেহও হয় মনে; যে কোন জাতি তার একটা বিশেষত্বকে অতি মাত্রায় প্রবল করে তোলে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকে ও তারা অন্য সকলের ব্যবহারে লাগে। যেমন মানুষ কেরোসিনের খনির দিকে ঝোঁকে, তার ভিতর যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তা' কাজে লাগাবার জন্য। সব ধনিক চীনে যায় তার resources—প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য—গ্রহণ করে ভোগ করবার জন্য। য়ুরোপ ও আমেরিকার সব জায়গায় শ্রমিকের দাবী বেশী, তারা অবসর চায় ও মানুষের যা প্রয়োজন সেখানে তার দাবী মিটাতে হয়। চীনেতে মানুষ একটা বিশেষ শক্তি রূপে প্রকাশমান, যেমন তেল, কয়লা ইত্যাদির মত। শ্রমশক্তি সেখানে বহুদিন থেকে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। এটা ধনিকদের কাছে একটা লোভনীয় জিনিষ। যেমন ধরুন ভারতের গুর্খারা; তারা মানুষ মারার প্রবৃত্তি ও কৌশল চর্চ্চা করে মনুষ্যঘাতকরূপে বিশেষত্ব লাভ করেছে, সেই জন্য ওদের এই দুর্দ্দশা। অন্যেরা ওদের শক্তিকে বারুদ ও ইস্পাতের মত ব্যবহার করে—তৈরী করা মাল। ওরা আবার বড়াই করে 'আমরা লড়াই করি, মানুষ মারি, বাঙ্গালী কেবল কলম পিষে।' ওদের কোন বিচার নেই, যেখানেই লড়াই হোক কামান বন্দুকের মত ওরা মানুষ মারে। যারা মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে একটা কোন বিশেষ গুণকে বিকশিত করে তারা একটি লোভের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়—যেমন মৌমাছিরা যে মধু সঞ্চয় করে তা আমরা নিই। এ-জন্য যারা প্রয়োজনের অধিক সঞ্চয় করে তারা চোরকে প্রশ্রয় দেয়। অন্য সব দেশের লোক এসে চীনদের শ্রমশক্তিকে কসে দোহন করছে। তারা পয়সা পায় বটে, কিন্তু তা' তাদের মনুষ্যত্বকে বিক্রী করে'। চীন-সমাজতন্ত্র পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপ্ত। বিদেশীরা পল্লী থেকে শিকড় তুলে চীনেদের সহরে এনে তাদের দাসত্বে নিয়োগ করচে, মালয়দের কিন্তু তা পারে নি। আমি অবশ্য সবাইকে মালয়ীদের মত অলস হতে বলছি নে। তবে এর মধ্যেও একটা জিত আছে। মালয়ীরা অল্পে সন্তুষ্ট, অবশ্য এজন্য তাদের মধ্যে দৈন্য ও অসম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু মালয়ে যারা রবারের চাষ করে বড় হতে আসে, তারা মালয়ীদের ব্যবহারে লাগতে পারেনা। মাদ্রাজীরা এই কাজে তাদের মনুষ্যত্ব উৎসর্গ করেছে। যদিও আমার প্রশংসা করবার ইচ্ছা হয়েছিল তবু আমি চীনবন্ধুদের বলেছি যে একটা জাত্‌কে একান্তভাবে এত পরিমাণে হাতের কাজে গড়ে তোলাটা ভালো নয়।

হংকংয়ে চীনবন্ধুরা কেউ আসেননি। রেঙ্গুন যেমন ব্রহ্মদেশে নেই, হংকং তেমন চীনদেশে নেই—সেখানে গৃহকর্ত্তা চীনেরা নয়। সান-ইয়েৎ-সেনের নিকট হতে একজন দূত আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বল্লেন—'আপনি দেশবিদেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। চীনদেশে আপনার আলাপ করবার উপযুক্ত লোক—ডঃ সান-ইয়েৎ-সেন। তাঁর সঙ্গে আপনি চীনের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।" আমার তখন সময় ছিলনা, আমি অন্যত্র প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ ছিলাম, পিকিংয়ে আমার চীনা বন্ধুরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি বলে দিলুম, 'হয়তো ফেরবার পথে দেখা হবে।' সাংহাইয়ে গিয়ে দেখি বন্ধুরা ডকে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি

পরে আমার ইংরেজী বক্তৃতা চীনভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘদেহ, শুভ্রবর্ণ চীনবেশ আমাকে আশ্চর্য্য করেছিল; তাঁর শ্রী ও সৌহার্দ্দ্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলেম। তিনি সর্ব্বদাই আমার সাহচর্য্য করেছেন। আমার বক্তৃতা ব্যাখ্যা করে দেবার ভার তাঁর উপরে ছিল। কিরকম অভ্যর্থনা সেখানে পেয়েছিলেম তা আমি বল্‌তে চাইনে, আমার সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা বলবেন। তবে এইটুকু বল্‌ব যে—আমাকে তারা ডেকেছিল আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ছিল বলে, আমি যে আহূত অতিথি একথা তারা ভোলেনি, অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেছে। হৃদ্যতার এই ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য অতি মনোরম জিনিষ। আমেরিকার লোকেরাও আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে, সম্মান করেছে, কিন্তু আতিথ্যের হৃদ্যতা, মানুষ যে আমাকে মানুষের ঘরে ডেকেছে এ আমি তাদের দেশে সে পরিমাণে অনুভব করিনি। ব্যক্তিবিশেষের কাছে আদর অভ্যর্থনা পেয়েছি বটে। সাধারণের কাছ থেকে পেয়েছি আমার বক্তৃতার আর্থিক মূল্য। চীন ও জাপানের লোকেরা ভাল ইংরাজী বোঝে না, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার প্রতিষ্ঠার কথা তারা বিশেষ জানেনা, শুধু জানে যে ভারতের অতিথি এসেছেন। আমি তাদের কাছে মানুষ হিসাবে মানুষের আদর পেয়েছি। আমার সঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, চিত্রীবর নন্দলাল বসু, ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ গিয়েছিলেন—তাঁরা তো বরযাত্রীদের মত আহার অভ্যর্থনা আদর আপ্যায়ন লাভ করেছেন। কোথাও যেতে হলে তাঁদের গাড়ীভাড়া লাগেনি। সঙ্গে সৈন্যদল থাক্‌ত তাঁদের রক্ষার জন্য, রাত্রে ষ্টেশনে ষ্টেশনে সৈন্যাধ্যক্ষ এসে খবর নিতেন; তাঁদের কেউ কেউ তো সৈন্যদের দেখে ভীতই হয়ে পড়তেন। গভর্ণররা আমাদের খবর নিয়েছেন, আমন্ত্রণ করেছেন। চীনেদের আত্মীয়তার আকর্ষণ আমার হৃদয়কে মুগ্ধ করেছে। আমি ভেবেছিলুম যা লিখে নিয়েছি তাই পড়বো, কিন্তু দেখলুম ফল হবে না, এরা বুঝবেনা। তাদের অত দায় নেই যে ইংরেজী না জান্‌লে জাত হারাবে, ইংরেজী জানে না বলে আপনার প্রতি অবজ্ঞাও তাদের নেই। অল্প লোকেই ইংরাজী জানে। খুব সরলভাবে বল্‌লেও ওরা বুঝে কি না সন্দেহ। আমারও ইংরেজীর সম্বল অল্প, কাজেই আমার কাজ খুব সোজা হয়ে গেল।

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনে খুসী হবেন সেখানেও আমাকে আক্রমণ করেছে, নিছক সম্মান আমি পাইনি। একদল—অবশ্য আমার তরফ থেকেও বলবার আছে যে তারা দলে খুব ভারী নয়—বলেছে যে এ লোকটা এসেছে আমাদের মাথা খারাপ করবার জন্য। ভারত আমাদের যা দিয়েছে তাতে আমাদের ক্ষতিই হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের হিংস্র প্রকৃতি কমিয়ে দিয়েছে। এই ভারতীয় কবি আমাদের মাথা খারাপ করে দেবে। এই দল কম্যুনিষ্ট, সোভিয়েটের সাহায্যপ্রাপ্ত। আমি যেখানে বক্তৃতা করেছি সেখানে এরা আমার বিরুদ্ধে ৫টা points দিয়ে হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করেছে—কেন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনা উচিত নয় তার কারণসূচী। ৫টা 'পয়েন্টের' মধ্যে একটা ছিল যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তারপর materialism এর উপর আমার

খুব অশ্রদ্ধা, প্রাচীন সভ্যতার প্রতি আমার অত্যন্ত সম্মান বোধ। বাকী দুটো আমি ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এরা বা আর যারা আমার বিরুদ্ধবাদী ছিল তারা কেউই আমাকে অসম্মানসূচক কিছু বলেনি। তারা বলেছে,—'তোমাকে আমরা সম্মান করি, তোমার প্রতি আতিথ্যের বিরুদ্ধে আমরা কিছুই বলব না; আমরা শুধু আমাদের মত প্রকাশ করছি। ব্যক্তিগতভাবে তোমার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই'। তার খুব বিচলিত হলেও কখনো আমাকে কটুকথা বলে নি। এই ব্যাপারটি অনভ্যাসবশতঃ আমাকে বিচলিত করেছে; চীনে ও জাপানে আমি দেখেছি যে তাদের ভদ্রতার সাধনা বহুযুগের ভিতর দিয়ে মর্ম্মগত হয়ে গেছে। এই সভ্যতা তাদের আদিম প্রকৃতিকে সংযত করেছে। এ সাধনা বহুযুগের ও সর্ব্বব্যাপী। উন্নতি অনেক প্রকারের হতে পারে; যেমন রেলগাড়ী ঘন্টায় ৬০ মাইল যায়, ব্যোমযান আকাশে উড়ে—কিন্তু সভ্যতা তা নয়। যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে সত্য ও সুন্দর করে তোলে তাই যথার্থ সভ্যতা। এর পরিচয় যেমন পেয়েছি এই সুপ্রাচীন জাতির মধ্যে, এমন আর কোথাও নয়।

সাংসির গভর্ণর আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি আমার কথা সব শুনে খুব আনন্দ লাভ করলেন। আমি বল্‌লেম, 'আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ রাখতে চাই বিদ্যার দিক থেকে। ভারতের যে বিদ্যা চীন ভাষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তা লাভ করবার জন্য ভারতের সাধকদের চীনে আসা দরকার, আপনাদের দেশ থেকেও ভারতে যাওয়া দরকার।' তাঁদের অনেকেই প্রস্তুত আছেন। আমি আমার মাতৃভূমির পক্ষ থেকে তাঁদের আহ্বান করেছি, যেমন আতিথ্য আমি পেয়েছি তেমন আতিথ্য তাঁদের দেব বলে প্রতিশ্রুত হয়েছি। কিন্তু এখানে আমি একা গৃহকর্ত্তা নই, এতে সবার হাত আছে। আমি আপনাদের সেবা দাবী করব, তা আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন। যাহোক আমি গভর্ণর মহাশয়কে বল্‌লেম, 'আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে আপনাদের পল্লীবাসীদের মধ্যে আমাদের পল্লীবাসীরা এসে কিছুকাল যাপন করবেন। আবার আপনাদেরও কৃষিজীবীরা আমাদের দেশে গিয়ে কাজ করবেন, এই বিনিময় আমি চাই।" তিনি আমাকে নদীর ধারে চমৎকার একখণ্ড জায়গা দেখিয়ে বল্‌লেন যে 'আমি এখানে একটি আশ্রম করে দেব—সেখানে আমাদের চীনেরা কাজ করবে, আপনাদের পল্লীবাসীরাও এলেই স্থান পাবে'। এই যোগই সবচেয়ে বড় যোগ হবে। এটা পূর্ণ করতে হলে সে দেশে যাতায়াত করতে হবে। Pan-Asiatic nightmare আমার নেই। Pan শব্দটি আমার কাছে ভয়ের শব্দ, অবাস্তব শব্দ। সত্যিকার Unit হলে এর একটা অর্থ আছে, কিন্তু দড়ির যোগ নিরর্থক। মানুষ যদি মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারে তবেই পূর্ণফল পাওয়া যায়। স্বার্থের গন্ধ থাকলে ফল বিকৃত হবে। চীনদেশে যাদের কাছে গিয়েছি—তারা হৃদয় দিয়েছে, কাছে এসেছে। রাস্তা হয়েচে, তারা আসবে, যদি আমরা না বলি যে দরজা বন্ধ, আমরা নিজের কাজে ব্যস্ত আছি', তা' হলেও আসবে। আত্মীয়ভাবে তারা আসবে—সৈনিক, বণিক বা মিশনারী হয়ে নয়। তাদের সঙ্গে আমাদের দান প্রতিদান হবে। এই সত্য সম্বন্ধ,

interdependence; ভারতের একটা বড় কর্ত্তব্য, ঋণ রয়েছে; এসিয়ার যে শ্রেষ্ঠ বাণী, বিশ্বমৈত্রী, তা' ভারতকে প্রকাশ করতে হবে। আমরা তার অনেক ব্যাঘাত করেছি। এই বাণীর পথ যে প্রস্তুত আছে তা আমাদের গুণে নয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের তপস্যার ফলে—যেমন ভগীরথের তপস্যার ফলে গঙ্গা নেমে এসেছিলেন। চীন জাপানে ভারতের আত্মীয়তার পথ প্রশস্ত আছে, এখনো লুপ্ত হয়নি, যেমন ভগীরথের গঙ্গার ধারা এখনো লুপ্ত হয়নি। সেই শ্রেষ্ঠ বাণী যা প্রাচীন ভারত নানা বাক্যে, অমর ছন্দে ঘোষণা করেছে, তা' সমস্ত এসিয়ার কণ্ঠে ভারতকেই ঘোষণা করতে হবে। এ কর্ত্তব্যের প্রতি যেন আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, সাহস থাকে। এ আমাদের খুব বড় সম্পদ, রাষ্ট্রীয় শক্তির চেয়ে ন্যূন নয়। আমাদের পুরাতন সাম্রাজ্যের গৌরব নেই, কিন্তু এই খ্যাতি চিরজীবী হয়ে আছে। যখন দেখি ইয়াংসী নদীর ধারে বসে ভক্ত বুদ্ধদেবের উদ্দেশে বারবার নমস্কার করছে, যখন দেখি জাপানের পল্লীতে পল্লীতে বুদ্ধের বাণী মন্দিরের ঘণ্টারবের সঙ্গে মিশে আকাশ বাতাসকে পবিত্র করছে, জাপানের হৃদয়ভূমিকে উর্ব্বরা করছে, তখন আমাদের কি তৃপ্তি, কি গৌরব! বুদ্ধদেবের সেই বাণী জাপানের সমস্ত শক্তি, সমস্ত বীর্য্যের কারণ; তারা যে যুদ্ধবিগ্রহ করছে তার পিছনেও সেই বাণী রয়েছে একথা তারা স্বীকার করেছে ভারতের কাছে, যে ভারতের সব গৌরব আজ লুপ্ত। গর্ব্বোদ্ধত জাপান বারবার বলেছে তাদের সমস্ত সফলতার পিছনে সেই শক্তি রয়েছে যে শক্তি একদিন ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল। তাদের সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনিক কাজের মধ্যেও বুদ্ধদেবের শিক্ষা আছে। তাদের কাছে এ শুধু ধ্যানপরায়ণ ধর্ম্ম নয়—ভক্তিতে সরস, জ্ঞানেতে উজ্জ্বল এই ধর্ম্ম তাদের ভিতর কাজ করছে।

জাপানে একজনের কাছে একটা চমৎকার কথা শুনেছিলেম। এই ভদ্রলোকটি কোন প্রকার য়ুরোপীয় জ্ঞান লাভ করেন নি। তিনি বল্লেন, 'বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে আমরা একটা মস্ত জিনিষ পেয়েছি'। তাঁর চাষব্যবসায়ী হতে, পল্লীজীবনের পূর্ণতা সাধন করতে বড় ইচ্ছা। তিনি বল্লেন, 'বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে আমাদের একটা মস্ত শিক্ষা হয়েছে যে যদি কিছু লাভ করতে হয় তবে সে প্রেমের দ্বারা। প্রেম একটা Law, not a subjective state of mind; জমি থেকে আমরা ফসল আদায় করি, কিন্তু যদি জমিকে ভালবাসতে পারি তবে সে আরও বেশী দেবে। এই জমিকে ভালবাসার কল্পনা আমরা তোমাদের কাছে শিখেছি। ভালোবাসাই প্রাপ্তির উপায় একথা আর কেউ বলেনি—বলে থাকে exploitationই প্রাপ্তির উপায়। পুরোপুরি পাই আমরা মৈত্রী দিয়ে।'

জমিকে ভালোবাস্‌লে বেশী দেয় একথা শুনে আমার মনে হল—মরেনি তো, বৌদ্ধধর্ম্ম এদের মধ্যে মরেনি। ধর্ম্মের কথা কর্ম্মের রাজ্যে যে এত গভীর করে বলতে পারে সে কত পেয়েছে, বুঝেছে চাষ করতে গেলে ভালোবাস্‌তে হয়। জাপান আজ বারবার বল্‌ছে, 'ভুল করেছি, সত্যকে আমরা দেখিনি। ভারতবর্ষ, তুমি এস, সত্যকে দেখিয়ে দাও'—একথা বল্‌ছে ভারতকে, যে ভারত সত্য বিস্মৃত হয়েছে। বলেছে, 'তোমরা না হলে অন্য কেউ চীন ও জাপানকে সত্য দান করতে পারবে না, তারা পশ্চিমের বিদ্যা নিয়ে বারবার মুগ্ধ হবে'।

চীনের একজন পণ্ডিতবন্ধু বলেছেন—'চীন তুমি ভুলেছ যে ভারতবর্ষ তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। একথা মনে করিয়ে দেবার জন্য ভারতের কবি এসেছেন'। তিনি তাঁদের শাস্ত্র থেকে দেখিয়েছেন চীন কত বিষয়ে ভারতের কাছে ঋণী। কিন্তু শাস্ত্র থেকে স্মরণ করালেও মানুষের মন অনেক সময় সায় দেয় না। সময় কি হয়নি যে মৈত্রী দিয়ে আমরা স্মরণ করিয়ে দেব? একথা কি আমরা কেউ বল্‌তে পারবো না যে আমরা সেই Ideal ভারতবর্ষের লোক, ভূগোলের ভারতবর্ষের নয়? ওরা মনে করে যে সেই ভারত এখনো সজীব আছে; ওরা বলেছে, তোমাদের মন্দিরে ঢুকে ধর্ম্মরত্নের দাবী করব, তারা জানেনা যে দ্বার থেকে তাড়া খেয়ে আস্‌বে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনকে যখন তারা বলেছে যে তোমাদের মন্দিরে গিয়ে দেখ্‌ব কি সঞ্চিত আছে তখন তিনি লজ্জিত হয়ে চুপ করে ছিলেন। ভারতের দেবতা যেখানে, সেখানে পৃথিবীর লোকের ও ভারতবর্ষের অধিকাংশের স্থান নেইতো। কিন্তু ভারতের গৌরব কি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাক্‌বে? রাষ্ট্রীয় শক্তির জন্য চেষ্টা হবেনা, সে কথা আমি বলছি নে, সে শক্তির প্রয়োজন আছে; কিন্তু যে সম্পদ বিশ্বকে দেবার সেই তো যথার্থ শক্তি, যথার্থ ঐশ্বর্য্য। এর গৌরব একদিন ভারতের ছিল, আর কি সে গৌরব হবে না? আমরা বল্‌ব—'আমাদের মাতার ভাণ্ডারে যে অন্ন আছে তা আমরা পরিবেশন করব—তোমরা এস, এস, এস'।

একটা খবর আপনাদের দিতে ভুলে গিয়েছি, সেটিতে হয়তো আপনারা সুখী হবেন। চীনদেশের লোকেরা এবার আমার জন্মোৎসব করে নতুন নাম দিয়েছে। তারা বলেছে, এবার যখন তোমার Chinese birth, তখন চৈনিক নাম নিয়ে তোমাকে আমাদের হতে হবে। সে নামের শিলমোহরও আমি এনেছি। তার অর্থ বিচিত্র, উচ্চারণ চৈনিক রকমের, 'ছোঃ-ছিন-তান্‌'। 'ছো' মানে প্রভাতের আলো, 'ছিন' বজ্র বা ইন্দ্র, 'তান্‌' হচ্ছে ভারতীয়, ভারতীয় ইন্দ্র, ভারতীয় বজ্র। সে দিন বিশেষ উৎসব হয়েছিল। আমাকে শিশুর মত নববস্ত্রে সাজিয়েছিল; শিশুর খাদ্য পানীয়ও আমি পেয়েছিলেম। চীনবাসীরা সব প্রাকৃতিক ব্যাপারে একটা ধর্ম্মনৈতিক ভাব আরোপ করে থাকেন। যেমন বাঁশগাছকে তারা সরল ও ধার্ম্মিক বলেন। ছেলেদের জন্মকালে বলা হয়, এ যেন পাইন গাছের মত চিরজীবী হয়, তার মত ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে পারে। তারা আমাকেও বলেছে, আমি যেন ভাল হই, দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হই, চিরজীবী হই। আমাদের দেশের মত সেখানেও আনন্দোৎসব, নৃত্যগীত হয়েছিল, মেয়েরাও এসেছিলেন। এম্‌নি করে এবার চীনে আমার জন্মদিন নামকরণ হয়েছে। দৈবক্রমে আমার যে নাম তার অর্থ সূর্য্য। সূর্য্যের প্রতিদিন নব জন্ম হয়, এক দিগন্ত হতে অন্য দিগন্তে। তেম্‌নি আমি যদি চক্রে চক্রে নানা দেশে নব নব জন্ম লাভ করে' নব নব নাম পেতে পারি, তবেই আমার নাম ও জীবন সার্থক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে প্রদত্তবক্তৃতা। শ্রীযুক্ত সুধেন্দুরঞ্জন রায় এম এ অনুলিখিত।

অজন্তা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাহাড়টীর তলদেশেই নদী ; সেইজন্য গুহাগুলি খনন করা হইয়াছে পাহাড়ের ঠিক মধ্যভাগে। পাহাড়ের আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বক্র। নদীর অপর পারের পাহাড়ের তলায় বসিয়া এই গুহাগুলি দেখিতে অতি মনোরম। বিশাল কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়, তাহার মধ্যভাগে পায়রার খোপের ন্যায় ছোট ছোট গুহা পাহাড়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। গুহার ভিতরে যাইয়া দেখা অপেক্ষা বাহির হইতে দেখাই যেন অধিক আনন্দজনক। মনে হয় যেন কোন এক সুবৃহৎ কলেজগৃহের ছোট ছোট জানালা ও দরজাগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃত পক্ষে ইহা একদিন এক সুবৃহৎ বিদ্যাপীঠই ছিল। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে এবং বহু দেশ বিদেশ হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ ছাত্রগণ এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত ; অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এখানে যাবজ্জীবন বাস করিতেন ; ইহা তাঁহাদের একপ্রকার বিশ্রাম স্থল ছিল। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা নানাস্থানে যাইয়া নরনারীর সেবায়, তাহাদের অনেক হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন ; ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কয়েকমাসের জন্য এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন। সাধনায় ও অধ্যাপনায় কয়েকমাস অতিবাহিত করিয়া আবার সর্ব্বপ্রাণীর সেবায় বাহির হইতেন—ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান কাজ। এই সকল মহামানবের এবং তাঁহাদের ছাত্রদের সমাগমে এই স্থান একদিন কেমনই না জীবন্ত ও পবিত্র ছিল, কিন্তু আজ সব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আজ আর ভিক্ষু সন্ন্যাসী নাই, আজ আছে পিকনিক পার্টির দল—ইহাকেই বলে কালের মহা পরিবর্ত্তন।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুহাগুলির খনন কার্য্য আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে। এখানে ২৮টি গুহা আছে ; কিন্তু কোন গুহাটী যে সর্ব্ব প্রথম খনন করা হয়, তাহা কেহই সঠিক বলিতে পারে না, তবে কয়েকটী গুহা যে অন্যান্য গুহা অপেক্ষা প্রাচীনতর তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কয়েকটী গুহা সম্পূর্ণ করা হয়—ছাত্রে, অধ্যাপকে ও ভিক্ষুতে তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। আরও অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়, তখন আরও নূতন নূতন গুহা খনন করা হইতে থাকে, এই প্রকারে ২৮টী গুহা খনন করা হইয়াছে এবং তাহাতে সাত আট শত বৎসর লাগিয়াছে। কিন্তু সব গুহাগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই ; কতকগুলি গুহা আছে, সেগুলি অর্দ্ধেক বা কিঞ্চিৎ মাত্র খনন করা হইয়াছে ; আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু শেষ হয় নাই। কেন যে শেষ হইল না, কে যে শিল্পীর হাত চাপিয়া ধরিল, কেহই তাহা সঠিক বলিতে পারে না ; তবে অনুমান করা যায়, কিন্তু অনুমান অনুমান মাত্র। এই অসম্পূর্ণ গুহাগুলি দেখিলে মনে হয় যেন কিছু পূর্ব্বেও বুঝি কাজ চলিতেছিল—হঠাৎ কি জানি কেন খনন কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া শিল্পী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কি ধৈর্য্য, কি সহিষ্ণুতা, কি অধ্যবসায়ের সহিত তাহারা কাজ করিয়াছে, একথা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাহারা কেবল পাহাড় কাটিয়াছে, পাহাড় কাটিয়া স্তম্ভ, চৈত্য, হলঘর, ছোট ছোট কুঠরী

করিয়াছে, কি অমানুষিক অসাধারণ শক্তি ব্যয় করিয়া তাহারা পাহাড় ভেদ করিয়া পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ছোট হউক, বড় হউক, প্রত্যেক গুহার প্ল্যান প্রায় এক ধরণের। মধ্যে প্রকাণ্ড হল, তাহার দুই পার্শ্বে সারি সারি ছোট ছোট কুঠরী; কোন কুঠরীতে একজন, কোন কুঠরীতে বা দুইজন লোকের থাকিবার স্থান আছে। পাহাড় কাটিয়াই তাহাদের শয্যাসন প্রস্তুত করা হইয়াছে, আসনের একদিক একটু উঁচু করিয় বালিসের মতন করা হইয়াছে, অবশ্যই সে বালিসও পাথরের। হলঘরের দুইপার্শ্বে কুঠরী এবং সম্মুখে চৈত্য; সে চৈত্যও পাহাড় কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। চৈত্যের ভিতরে গৌতম বুদ্ধের পবিত্রদেহের অংশ রক্ষিত আছে। মাত্র একদিক দিয়া আলো ও বাতাস আসিতেছে——গুহার মুখের দিক দিয়া। তাহা সম্পূর্ণ খোলা, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া যে আলো বাতাস আসে তাহা যথেষ্ট নহে; হল গৃহটি আলোকিত হয় বটে, কিন্তু দুই পার্শ্বের ছোট ছোট কুঠরীগুলি তেমন আলো বাতাস পায় না। গুহার যতই ভিতরে যাওয়া যায়, অন্ধকার ততই গভীর হইয়া আসে। কতকগুলি গুহা আছে, সেগুলি আবার দ্বিতল; তাহা দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ারের অদ্ভুত সাহস ও অসাধারণ বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ভাস্কর্য্য ক্রিয়া যাহা দেখিলাম তাহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব; পাহাড় কাটিয়া পাথরের উপর যে সব কারুকার্য্য করা হইয়াছে সে সব ভাস্কর্য্য ক্রিয়া; ইহাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—রূপাত্মক (decorative) এবং ভাবাত্মক (Expressive); স্তম্ভের উপর কিম্বা দ্বারের উপর যে সব কারুকার্য্য করা হইয়াছে, তাহা রূপাত্মক বা decorative art; ইহার উদ্দেশ্য ঘরের কিম্বা দ্বারের শোভাবর্দ্ধন করা। আঁকা বাঁকা লাইন কিম্বা ত্রিকোণ চতুষ্কোণ রেখাদ্বারা যে মনোরম রেখাচিত্র (figure) অঙ্কিত করা হয় তাহাকে decorative art বলে; এই প্রকার আর্টের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ আগ্রায় এতমদ্‌দৌল্লা ও তাজমহল। এতমদদৌল্লায় মার্ব্বেল পাথর কাটিয়া রেখার যে ভঙ্গিমা ও চাতুর্য্য দেখান হইয়াছে অন্য কোথাও তাহার তুলনা নাই; তাজমহলে মার্ব্বেল পাথর খুদিয়া লতা পাতা ফল ফুলের যে অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখান হইয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই; চিত্রের এই ফুলে ও পাতায় এমন এক মধুর ভাব ও কমনীয়তা দেখা যায়, যাহা আমরা সহজে সত্যকারের ফুলে ফলে দেখিতে পাই না। তাহা দেখিতে শিল্পীর চক্ষু ও কবির ভাব চাই; কবি ও শিল্পী যাহা দেখিতে পায়, আমরা সহজে তাহা দেখিতে পাই না, তাই তাহাদের আর্টের উদ্দেশ্যই এই যে তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহাই আমাদের সম্মুখে প্রকট করিবে। তাজমহলের লতা ও ফুলগুলি দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি, এতদিন কত লতা ও কত ফুল দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে সে হাসি, সে ভাব, সে কমনীয়তা কখন লক্ষ্য করি নাই যাহা তাজমহলের ফুলে ফুলে লতায় লতায় স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে। এই-খানেই প্রকৃত Art এবং ফটোগ্রাফির প্রভেদ, বাগানের ফুলে যাহা দেখি ফটোগ্রাফির ফুলেও ঠিক তাহাই দেখি, নূতন কিছুই দেখিতে পাই না, কিন্তু শিল্পী বা কবি যে ফুল রচনা করে তাহাতে এমন এক নূতন কিছু দেখিতে পাই, যাহা সত্যকারের ফুলে সহজে আমাদের চোখে পড়ে না।

তাজমহল বা এতমদদুল্লার ভাস্কর্য্যের সহিত অজন্তার ভাস্কর্য্যের তুলনা হয় না, তাজমহল বা এতমদদুল্লা মোগল art এর উন্নতির চরম সীমা, তাহার সহিত তুলনা করিলে অজন্তার প্রতি অন্যায় করা হয়, কিন্তু তবুও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে art হিসাবে অজন্তার ভাস্কর্য্য-ক্রিয়া নিতান্ত নগণ্য নহে। পাথরের স্তম্ভের উপরে রেখার যে সব কারুকার্য্য করা হইয়াছে তাহা সত্যই মনোমুগ্ধকর, তাহার এক বিশেষ মূল্য আছে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা ভাস্কর্য্য-ক্রিয়ার এক বিভাগের কথা—রূপাত্মকশিল্প। এখন ইহার অন্য এক বিভাগের কথা কিছু বলিব, যাহাকে আমি ভাবাত্মক শিল্প বলিয়াছি। নরনারী কি দেবদেবী বা পশুমূর্ত্তি গড়িয়া তাহার মধ্য দিয়া যে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা হয় তাহাকে expressive art বলে। এই বিষয়ের কথা আলোচনা করিতে হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে art-জগতে অজন্তার কোন স্থান নাই (মনে রাখিতে হইবে আমি এখন পর্য্যন্ত কেবল sculpture বা ভাস্কর্য্যের কথা বলিতেছি—painting বা চিত্রের কথা পরে বলিব) যতগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে কেবল একটীমাত্র আমার নিকট কিছু সুন্দর বলিয়া মনে হইল। art হিসাবে অন্যান্যগুলির কোন মূল্য নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। কয়েকটী দেবদেবীমূর্ত্তিও আছে—কিন্তু এই পাথরের মূর্ত্তিগুলি পাথরের ন্যায় নির্জ্জীব বসিয়া আছে, চোখে মুখে ভাবের কোন সমাবেশ নাই, ভাব প্রকাশের জন্য বোধ হয় চেষ্টা করা হইয়াছিল—কিন্তু পাথরের ভিতর দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠে নাই। পাথর ভেদ করিয়া ভাব বাহিরে আসিতে পারে নাই, কঠিন পাথরের মধ্যে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। যাহারা পাহাড় কাটিয়া এইসব অদ্ভুত গুহাগুলি সৃষ্টি করিতে পারিল, তাহারা এই মূর্ত্তিগুলির উপর কেন যে একটু ভাবের ছিটা দিতে পারিল না, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহারা চিত্রে ভাবপ্রকাশের লীলাখেলা করিয়া এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে—যাহা দেখিয়া আজ সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত,—ভাস্কর্য্যে তাহাদের এই অকৃতকার্য্যতার কথা মনে করিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়।

ভাস্কর্য্য-বিদ্যার জন্য অজন্তা বিখ্যাত নহে, অজন্তা বিখ্যাত চিত্রের জন্য। অজন্তার চিত্রের কথা কিছু বলিয়াই এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। সব গুহাতে চিত্র নাই, মাত্র ৩।৪টী গুহাতে চিত্র আছে। ভাস্কর্য্যের ন্যায় চিত্রেরও দুইটী দিক আছে—রূপাত্মক এবং ভাবাত্মক রূপাত্মক চিত্র দেখি স্তম্ভে ও ছাদের তলদেশে (ceiling) এবং ভাবাত্মক চিত্র দেখি গুহার ভিতরে হলগৃহের চারিদিকের দেওয়ালে ছাতের তলদেশ যে কি প্রকারে কত চিত্রে কত রঙ্গে শোভিত করা হইয়াছে; তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। কোন-স্থলে ফুল, কোন স্থলে পাতা, কোথাও বা লতা, কোথাও বা পাখী, কোথাও বা সরোবরে মরালের ধীরগতি ও বক্রগ্রীবা, সমস্ত গুহাটীকে যেন একটী ছবির বই করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও গোলাকার, কোথাও ত্রিভুজাকার, কোথাও চতুর্ভুজাকার রেখাচিত্র, কত ফুলে, কত মরালে কত ভাবে যে তাহা চিত্রিত আছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কোন ফুলটী সম্পূর্ণ ফুটিয়াছে, কোন ফুলটী আধ আধ ফুটিয়াছে, আর কোনটী বা ফুটিয়াও ফুটে নাই—কুঁড়ির মধ্য হইতে যেন বাহির হইতেছে মাত্র। কোথাও মরাল খেলিতেছে, কোথাও

ভাসিতেছে, কোথাও বা স্থির বসিয়া আছে—বিভিন্নতার (variety) এক অদ্ভুত সমাবেশ, কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে যে এক মিল (Harmony) আছে এবং ইহা যে কি পরিমাণে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যেখানে যাহা যে পরিমাণে (proportion) যে ভাবে প্রয়োজন তাহা সেইখানে ঠিক সেই পরিমাণে ও সেই ভাবে দেওয়া হইয়াছে। অসংখ্য বিভিন্নতার মধ্যে যে অদ্ভুত মিল রাখা হইয়াছে, তাহা চোখের যে কতদূর তৃপ্তিদায়ক বুঝিতে পারি তখন যখন অনেকক্ষণ এই চিত্রগুলির দিকে তাকাইয়া থাকিয়াও কোন প্রকার ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করি না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় বেদনা হইয়া যায়, আমরা মেজের উপর শুইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ছাদের এই চিত্রগুলি অবলোকন করিয়াছি, চোখে এক মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রান্তি বোধ করি নাই। যে চিত্রগুলি দাঁড়াইয়া দেখাই এত কঠিন, সে চিত্রগুলি ছাদের তলদেশে এত সুন্দর এত মনোরম এত নিখুঁত ভাবে কি করিয়া যে তাহারা অঙ্কিত করিল, ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। আজকাল মেয়েদের শাড়ীর উপর এবং পুস্তকের কভারে কত প্রকার রেখাচিত্র (design) দেখি, কিন্তু তাহাদের একটীরও অজন্তার এই রেখাচিত্রগুলির সহিত তুলনা হয় কিনা সন্দেহ। অজন্তার এই চিত্রগুলি নকল করিয়া সাড়ীতে বা পুস্তকের কভারে অঙ্কিত করিয়া দিলে সাড়ীর ও পুস্তকের সৌন্দর্য্য যে শতগুণে বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তখন এই সাড়ী ও পুস্তকগুলি যে কিপ্রকার রুচির পরিচয় প্রদান করিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এখন ভাবাত্মক ছবিগুলির কথা কিছু বলিব। দেওয়ালের গাত্রে অঙ্কিত এই চিত্রগুলি বুদ্ধদেবের জন্ম কর্ম্ম ও মৃত্যুর ঘটনাগুলি উজ্জ্বলভাবে চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছে। জাতক হইতে এই সমস্ত গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। এই গল্পগুলি চিত্রে যে কি সুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যাঁহারা কখনও এই চিত্রগুলি দেখেন নাই। কত যে চিত্র আছে তাহার সংখ্যা নাই—অজন্তা এক সুবৃহৎ Picture Gallery; গুহার ভিতরে, দেওয়ালে উপরে, নীচে, প্রত্যেক যায়গায় চিত্র অঙ্কিত আছে; এমত স্থান নাই, যেখানে চিত্র নাই; বুদ্ধদেবের ঘটনাবহুল জীবনের কত ঘটনাই যে অঙ্কিত আছে কে তাহার হিসাব করিবে? জরা, রোগ ও মৃত্যু দেখিয়া তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইলেন, কিরূপে তিনি তাঁহার নিদ্রিত পত্নী পুত্রের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, কেমন করিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন, কোথায় তিনি অশ্বে আরোহণ করিলেন, কোন্ বৃক্ষতলে তিনি মহাসমাধিতে বসিলেন, মায়াবিনীগণ কি ভাবে প্রলুব্ধ করিল, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনোরম চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। কোথাও তিনি শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, কোথাও তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। এক চিত্রে দেখিলাম তিনি কমণ্ডলু হস্তে ভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার পত্নীর নিকট। কি মহান, কি পবিত্র যে মুখের ভাব, চোখ হইতে এক করুণার ঝরণা যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। পত্নীর মুখের উপর যে ভাবের সমাবেশ দেখিলাম তাহা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। তিনি তাঁহার পুত্রকে অগ্রে ধরিয়া যেন মিনতির স্বরে বলিতেছেন, "আমি আর কি দিব? আমার সবই তুমি গ্রহণ কর, আমার ছেলেকে নেও আর আমাকেও তুমি তোমার পদতলে স্থান দেও," ছেলেটির ঠোঁটের উপর কেমন করিয়া যে লাল রংটুকু

দেওয়া লইয়াছে, যেন লাল ঠোঁটটুকু হাসিয়া হাসিয়া অভিমানভরে বলিতেছে "তুমি ত আমারই বাবা", ছেলেটির এই মুখের হাসিটুকু কি মধুর! এক স্বর্গীয় ভাব তাহার সমস্ত মুখের উপর ছড়াইয়া আছে। আর একটির চিত্রের নাম বোধিসত্ব—বুদ্ধদেবের এক মহাপবিত্র প্রতিমূর্ত্তি। পৃথিবীর সমস্ত ব্যথা বেদনার কথা তিনি যেন শুনিয়াছেন, করুণায় ও সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় যেন গলিয়া পড়িতেছে; কি এক শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী তাঁহার শ্রীমুখে রহিয়াছে। তাঁহার মাথার মুকুটটী এক অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ; রেখাগুলি কতভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া যে এদিক ওদিক গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। মুকুটটী কেমন ধীরে ভক্তিভরে তাঁহার মাথায় সংলগ্ন আছে।

প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের মাথায় মুকুট দেখিলাম। এত মুকুট, কিন্তু কোন মুকুটই অন্য এক মুকুটের অনুকরণ নহে, প্রত্যেক মুকুটই বিভিন্ন। কত বৎসর ধরিয়া কত ছাত্র মিলিয়া যে এই সব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে—কে আজ গণনা করিবে? কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া রবার ঘসিয়া এই চিত্র অঙ্কন করা হয় নাই, দেওয়ালের উপর গোবর লেপিয়া এই স্বপ্ন রাজ্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। গোবর শুকান মাত্রই তুলির দ্বারা নানারঙ্গে নানাজনে নানাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। অতীতের অবহেলায় ও সময়ের আক্রমণে অনেক চিত্রই আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, plaster ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক রং মলিন হইয়াছে। কিন্তু অনেক রং যে এখনও এতাদৃশ উজ্জ্বল আছে—তাহাই আশ্চর্য্য ব্যাপার। যখন দেওয়ালে ও স্তম্ভে সমস্ত চিত্রই সম্পূর্ণ আকারে ছিল, রংগুলি জীবন্তভাবে চিত্রগুলির শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল—তখন কি এক মায়ারাজ্যই না এখানে সংস্থাপিত ছিল। স্বর্গ হইতে যেন এক রঙীন চিত্র অজন্তায় অবতীর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার মূল উপাদান কি কি, এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই সভ্যতার জন্মকাল হইতেই যে এই সকল উপাদানের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই উপাদানগুলি কিরূপ বিচিত্রধর্ম্মী ও পরস্পরবিরোধী পূর্ব্ব হইতেই তাহার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং এটাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে এই সকল পরস্পরবিরোধী মূল তত্ত্বের মধ্যে কোনটিই ইউরোপীয় সমাজে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই, কোন একটি তত্ত্ব অপর তত্ত্বগুলিকে পরাজিত বা বিদূরিত করিতে পারে নাই। আমরা দেখিয়াছি যে ইহাই ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্ট

লক্ষণ। এখন আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে এই সভ্যতার শৈশব যুগের ইতিহাস, অর্থাৎ ইউরোপীয় ইতিহাসের বর্ব্বর যুগ বলিয়া যাহা সাধারণতঃ অভিহিত হয় সেই যুগের ইতিহাস।

এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই এমন একটি ব্যাপার চোখে পড়ে, যাহা আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। আধুনিক ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকগণ যে সকল মত ও ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, সেগুলি আলোচনা করিলে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যাঁহারা রাজতন্ত্রবাদী তাঁহারা বলেন মূলে রাজতন্ত্রেরই ইউরোপীয় সমাজে একাধিপত্য ছিল, অন্যান্য বিরোধী তত্ত্ব পরে আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যাঁহারা যাজকতন্ত্রবাদী বা অভিজাততন্ত্রবাদী বা গণতন্ত্রবাদী, তাঁহারাও স্ব স্ব শাসনতন্ত্রের পক্ষ হইতে ঠিক ঐরূপ দাবীই করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় সভ্যতার অভ্যুত্থানপ্রণালী বুঝাইতে যে কেহ চেষ্টা করিয়াছেন সকলেই প্রমাণ করিতে চান যে পরে যতই বিরোধ বৈচিত্র্য আসিয়া পড়ুক না কেন, মূলে কিন্তু একটি মাত্র শাসননীতির একাধিপত্য ছিল—কাহারও মতে সেটি রাজতন্ত্র, কাহারও মতে যাজকতন্ত্র, কাহারও মতে অভিজাততন্ত্র, কাহারও বা মতে গণতন্ত্র।

বুলঁ্যাভিয়ে (Boulainvilliers) প্রমুখ এক সম্প্রদায়ের সমাজতত্ত্ববিদ্ আছেন যাঁহারা ফিউডালিজম্‌কেই ইউরোপীয় সমাজের একমাত্র মূলতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চান। তাঁহারা বলিতে চান যে রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর বিজেতৃ জাতির হস্তেই, অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালের টিউটন অভিজাতবর্গের হস্তেই সমস্ত অধিকার ও শক্তি আসিয়া পড়ে; সমস্ত ইউরোপীয় সমাজ তাহাদেরই অধিকারভুক্ত হয়; এবং পরে রাজবর্গ ও প্রজাবর্গ আসিয়া তাহাদের হাত হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার ছিনাইয়া লয়। অভিজাততন্ত্রই হইতেছে ইউরোপীয় সমাজের আদিম ও যথার্থ স্বরূপ।

এই সম্প্রদায়ের পার্শ্বেই আর এক সম্প্রদায় দেখা যায়, যাঁহারা রাজতন্ত্রবাদী,—যথা আবে দ্যুবো (Abbe Dubos)। তাঁহারা বলেন ইউরোপীয় সমাজে রাজগণেরই ন্যায্য অধিকার। টিউটন অর্থাৎ জর্ম্মান রাজগণ প্রাচীন রোমীয় সম্রাটগণের সমস্ত অধিকারই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। গল্ (Gaul) প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণ তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বসাইয়াছেন। তাঁহারাই একমাত্র ন্যায্য অধিকার সূত্রে রাজ্যশাসন করিয়াছেন। অভিজাতবর্গ যাহা কিছু আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা রাজবর্গের ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াই করিয়াছিলেন।

আর এক সম্প্রদায়ের সমাজতত্ত্ববিদ্ আছেন যাঁহাদিগকে গণতন্ত্রবাদী বা প্রজাতন্ত্রবাদী বলা যাইতে পারে। আবে দ্য মাব্লীর (Abbe de Mably) গ্রন্থাবলী পাঠ করুন, দেখিবেন তাঁহার মতে পঞ্চমশতাব্দী হইতে সমাজের শাসন ও কর্ত্তৃত্ব ভার জনসংঘের হাতে আসিয়াছে, স্বাধীন প্রজাবর্গ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হইয়া যে প্রজাতন্ত্র গণসংঘ গড়িয়া তুলিলেন তাহারই হাতে সমস্ত অধিকার আসিয়া পড়িল। পরবর্ত্তীকালে অভিজাত বর্গ ও রাজবর্গ প্রজাসংঘের এই আদিম স্বাতন্ত্র্য কাড়িয়া লইয়া নিজ নিজ অধিকার ও সম্পদ্ বাড়াইয়া

লইয়াছেন। ইহাদের আক্রমণ হইতে প্রজাসংঘ আত্মরক্ষা করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এটা সত্য যে মূলে সমাজশাসনব্যাপারে প্রজাসংঘেরই কর্তৃত্বাধিকার ছিল।

এই ত গেল তিন পক্ষের দাবী। কিন্তু ইঁহাদের সকলের দাবী ছাড়াইয়া আর একটি শক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে,—সেটি হইতেছে খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্র বা চর্চ্ (church)। এই শক্তির তরফ হইতে দাবী করা হয় যে চর্চের অধিকার ভগবদ্দত্ত অধিকার; ভগবদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য চর্চ্চের আবির্ভাব; চর্চ্চের চেষ্টাতেই ইউরোপে সভ্যতা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; সুতরাং ইউরোপীয় সমাজ শাসনে চর্চ্চেরই ন্যায্য অধিকার, চর্চ্চই ইউরোপীয় জগতের একমাত্র সম্রাজ্ঞী।

এখন দেখুন আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াইল। আমরা মনে করিয়াছিলাম ইউরোপের ইতিহাসে কোন একটি শক্তি অপরাপর শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভব করিয়া একেশ্বরভাবে যে কখনও কর্তৃত্ব করে নাই একথাটা বেশ প্রমাণ করিয়া দিয়াছি; এই সকল বিরুদ্ধ শক্তি যে বরাবর পাশাপাশি কাজ করিয়াছে, কখনও বা পরস্পর বিরোধ করিয়াছে, কখনও পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কখনও বা পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে, এই কথাটাই যেন পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। অথচ দেখুন এই প্রথম পদক্ষেপেই একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত দেখা যাইতেছে যে ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবযুগেই, বর্ব্বর ইউরোপের মধ্যভাগেই এই সকল বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে একটিমাত্র—সে রাজশক্তিই হউক বা প্রজাশক্তিই হউক, অভিজাতশক্তিই হউক বা যাজকশক্তিই হউক—ইহাদের মধ্যে একটি মাত্র শক্তিই সমাজে একাধিপত্য করিত। এবং শুধু একটিমাত্র দেশে নয়, ইউরোপের সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই সকল বিরুদ্ধ শক্তি এই একাধিপত্যের দাবী করিয়া আসিয়াছে। যে সকল পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক মতবাদের উল্লেখ করিলাম সেগুলি সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকের পক্ষে এই ব্যাপারের মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান্ তথ্য নিহিত আছে। আধুনিক ইউরোপের আদিম যুগে স্ব স্ব অধিকার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড ছিল বলিয়া এই যে বিভিন্ন শক্তি পরস্পরবিরোধী দাবী উপস্থিত করিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দুইটী মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিতে পারেন। প্রথমটি হইতেছে শাসনক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকারতত্ত্ব; অর্থাৎ যে কোন শাসনশক্তি সমাজের উপর কর্তৃত্ব করিবে, তাহার কর্তৃত্ব করিবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার আছে কি না তাহার বিচার। শাসনাধিকার লইয়া এই যে বৈধাবৈধ বিচার, এরূপ বিচারের আবশ্যকতা আছে বলিয়া যে ধারণা তাহা ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতীয় তথ্যটি হইতেছে বর্ব্বর ইউরোপের সামাজিক অবস্থার যথার্থ স্বরূপ ও বিশিষ্ট প্রকৃতি।

এখন দেখা যাক পূর্ব্বোক্ত ঐ বিরোধের মধ্য হইতে এই তথ্য দুইটি কিরূপে বাহির করা যায়।

এই যে যাজকতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, এই সকল বিভিন্ন শক্তি—প্রত্যেকেই দাবী করিতেছে যে সর্ব্বপ্রথমে সমাজশাসনে তাহারই অখণ্ড অধিকার ছিল, ইহা দ্বারা তাহারা বাস্তবিকপক্ষে কি দাবী করিতেছে? তাহারা প্রত্যেকেই কি দাবী করিতেছে

না যে সমাজশাসনে একমাত্র তাহারই বৈধ অধিকার ? রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের উপরই ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত—কে কতদিন ধরিয়া অধিকার ভোগ করিয়াছে তাহারই দ্বারা তাহার অধিকারের ন্যায্যতা বিচার হয়। আপেক্ষিক প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়াই বিভিন্ন পক্ষ স্ব স্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে, স্ব স্ব শক্তির বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। লক্ষ্য করিবেন যে এই চেষ্টা কেবল একপক্ষে আবদ্ধ নহে, সকল বিরুদ্ধ শক্তিরই ঐ এক চেষ্টা, সমাজ শাসনে আমারই যে একমাত্র ন্যায্য অধিকার, সকল পক্ষই ইহা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বর্ত্তমান-কালে আমরা মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে রাজশক্তিই কেবল ন্যায্য অধিকারের দাবী করেন। বাস্তবিক এটা আমাদের ভুল, সকল প্রকার শাসন পদ্ধতির এই অধিকারবৈধতার দাবী রহিয়াছে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই এই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। ইউরোপের পরবর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রের মূলে এইরূপ একটা ন্যায্য অধিকারের দাবী রহিয়াছে। ইটালী ও সুইট্জারল্যাণ্ডের অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র, সান্‌মারিনোর সাধারণ তন্ত্র, ও ইউরোপের বড় বড় রাজতন্ত্র, সকলেই স্ব স্ব দেশে স্ব স্ব শাসনশক্তিকে একমাত্র ন্যায্য অধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, এবং সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক ন্যায্য অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছেন। সকলেই স্ব স্ব শাসন পদ্ধতির প্রাচীনত্ব ও সনাতনত্বের উপর নিজ নিজ অধিকারের ন্যায্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইউরোপ ছাড়িয়া অন্যান্য দেশের ও অন্যান্য যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এই তথ্যের সন্ধান পাইবেন। এমন কোন দেশ নাই, এমন কোন যুগ নাই যাহাতে কোন না কোন প্রকারের সমাজব্যবস্থা বা শাসনতন্ত্র নাই, এবং এমন কোন শাসনতন্ত্র নাই যাহার মূলে প্রাচীনত্ব বা সনাতনত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বৈধ অধিকারের দাবী নাই।

এই যে বৈধ অধিকারতত্ত্ব ইহার তাৎপর্য্য কি ? ইহার উপাদানই বা কি কি ? কিরূপেই বা এই তত্ত্ব ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রবেশ লাভ করিল ?

সমস্ত শাসন শক্তির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বাহুবল ব্যতিরেকে কোন শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আমি এ বলিতে চাই না যে কেবল মাত্র বাহুবলেই তাহাদের উদ্ভব, বাহুবল ছাড়া অন্য কোন অধিকার যদি তাহাদের না থাকিত তাহা হইলেও যে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত এ কথা আমি বলিব না। বাহুবলের দাবী ছাড়া অন্যান্য দাবীরও যে আবশ্যকতা ছিল তাহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে, সমাজ প্রচলিত রীতিনীতি মতামত প্রভৃতির অবস্থা অনুসারেই এক একটি শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এটাও লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না যে জগতে যত প্রকার শাসনতন্ত্র আছে, সে রাজতন্ত্রই হউক বা প্রজাতন্ত্রই হউক, সকলেই মূল কিছু না কিছু পরিমাণে বাহুবলের সংস্পর্শে কলঙ্কিত ;

অথচ কোন শাসন শক্তিই স্বীকার করিবে না যে বাহুবলেই তাহার উদ্ভব। শক্তিদ্বারা, বাহুবলের দ্বারা যে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, বাহুবল একমাত্র সম্বল হইলে যে শাসনাধিকার জন্মাইতেই পারে না, একথা জগতের সমস্ত শাসন তন্ত্রই সহজসংস্কারবশে অবগত আছেন। এই জন্যই প্রাচীন কালের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া যখন দেখিতে পাই নানা প্রতিদ্বন্দী

শক্তির সংঘর্ষ চলিতেছে, সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিয়া পরস্পরের বলপরীক্ষা চলিতেছে, তখন দেখি প্রত্যেক পক্ষের তরফ হইতে একই দাবী উঠিতেছে 'আমিই প্রাচীন, আমিই সনাতন; এখন একটা বাহুবলের দ্বন্দ্বপরীক্ষা চলিতেছে বটে, কিন্তু মূলে আমার প্রতিষ্ঠা বাহুবলের উপর নহে; অন্য দাবীর বলে, অন্য অধিকার সূত্রে আমার প্রতিষ্ঠা; এখন যে অশান্তি বিগ্রহের মধ্যে আমাকে লিপ্ত দেখিতেছ, ইহার পূর্ব্বে সমাজ আমারই দখলে ছিল; আমারই অধিকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার; এখনই কেবল এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া আমার ন্যায্য অধিকার লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে।"

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈধ অধিকারতত্ত্ব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার প্রতিষ্ঠা অন্যত্র। বাস্তবিক পক্ষে এই যে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি অন্ততঃ তত্ত্বের হিসাবে বাহুবলের দাবী অস্বীকার করিতেছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহারা নিজেরাই ঘোষণা করিতেছে যে রাজনৈতিক অধিকারতত্ত্বের মূল বাহুবল নয়, অন্যত্র; যুক্তি ও ন্যায় ধর্ম্মের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা; এবং সকলেই নিজ নিজ শক্তি যে যুক্তিমূলক, ন্যায়মূলক তাহাই প্রচার করিতে চাহিতেছে। তাহাদের প্রতিষ্ঠা যে কেবল বাহুবলে একথা কেহ মনে করে ইহা চান না বলিয়াই তাঁহারা প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়া অন্য ভিত্তির উপর তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। অতএব শাসনাধিকারবৈধতার প্রথম লক্ষণ দাঁড়াইল এই যে এ বৈধতা বাহুবলের দাবী অস্বীকার করে এবং একমাত্র নৈতিক শক্তির দাবী, যুক্তির দাবী, ন্যায় ধর্ম্মের দাবীই গ্রাহ্য করে। এই শেষোক্ত মূল হইতেই অধিকারবৈধতাতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ। কিন্তু এই বিকাশসাধনে প্রাচীনত্ব ও দীর্ঘকালব্যাপ্তি সহায়তা করিয়াছে। কিরূপে করিয়াছে তাহা এবার দেখা যাউক।

কার্য্যতঃ বাহুবলের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রকার শাসনতন্ত্র ও সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়। তৎপর সময় যত অতীত হইতে থাকে, ততই কালের ধর্ম্মে বাহুবলের, বাহুশক্তির ক্রিয়াকলাপ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে থাকে। সমাজ অনেক দিন ধরিয়া টিকিয়া থাকার দরুণই, সমাজ মানুষ লইয়া গঠিত বলিয়াই এই পরিবর্ত্তন, এই সংস্কার সাধিত হয়। মানুষ নিজের অন্তরের মধ্যেই শৃঙ্খলা, যুক্তি ও ন্যায়ধর্ম্ম বিষয়ে কতগুলি ধারণা পোষণ করিয়া থাকে; সে সেই ধারণাগুলি নিজের জীবনে ও সামাজিক জীবনে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে চায়। সে অবিরামভাবে এই কার্য্যসাধনে নিরত; এবং যে সমাজের মধ্যে তাহার কার্য্যক্ষেত্র, সে সমাজ যদি টিকিয়া যায়, আকস্মিক বিপ্লব বা অন্য কোন কারণে সামাজিক জীবনের গতিপ্রবাহ যদি খণ্ডিত না হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার চেষ্টার ফলও কিছু ফলে। মানুষ তখন যে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজের জীবন যাপন করে, সেই সামাজিক ব্যবস্থাকেই যুক্তিমূলক, নীতিমূলক ও ন্যায্যঅধিকারমূলক মনে করিয়া লয়।

মানুষের চেষ্টা ছাড়া বিধাতারও এমন একটি বিধান আছে যাহাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শৃঙ্খলা, যুক্তিযুক্ততা ও ন্যায়ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন সমাজই টিকিয়া থাকিতে পারে না। এ বিধানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হওয়া অসম্ভব, প্রাকৃতিক জগৎ যেরূপ বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এও সেইরূপ বিধান। কোন একটা সমাজ যদি অনেক দিন ধরিয়া টিকিয়া থাকে,

তাহা হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে সে সমাজ একেবারে বুদ্ধিবিচারবর্জ্জিত বা ধর্ম্মবর্জ্জিত নহে, যে বিচারবুদ্ধি, সত্যদৃষ্টি ও ন্যায়বোধ সমাজকে জীবনশক্তি দান করিতে একমাত্র সমর্থ, তাহা হইতে সে সমাজ একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। উপরন্তু যদি দেখা যায় যে ঐ সমাজ ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, ক্রমশঃ পুষ্টি ও শক্তিলাভ করিতেছে, তাহার শাসন, তাহার ব্যবস্থা দিনে দিনে অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সে অধিকতর পরিমাণে বিচারবুদ্ধি, ন্যায়বোধ ও যথার্থ অধিকার অর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই তাহার এই উন্নতি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে জগদ্ব্যাপারের মধ্যেই, এবং জগদ্ব্যাপার হইতে মানুষের মনের মধ্যে এই বৈধঅধিকারতত্ত্ব অনুস্যূত রহিয়াছে। এই তত্ত্বের মূল প্রতিষ্ঠা ও প্রথম উদ্ভব, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে, ধর্ম্মবোধ, বিচার বুদ্ধি ও সত্যদৃষ্টি হইতে; পরে কালব্যাপ্তিতে ইহার পুষ্টি হয়, কারণ দীর্ঘকালস্থায়িত্বের দ্বারা ইহাই কতকটা পরিমাণে প্রতিপন্ন হয় যে বাস্তবঘটনার মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বাহ্যজগতের মধ্যে যথার্থ বৈধ অধিকারতত্ত্ব প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমরা যে যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইতেছি, সে যুগে দেখিব রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের শৈশবশয্যার উপরে পশু শক্তি ও মিথ্যাচার আপন আপন ছায়া বিস্তার করিয়া আছে; সর্ব্বত্রই দেখিবেন পশুশক্তি ও মিথ্যাচার অল্পে অল্পে কালের নিয়োগে সংস্কৃত হইয়া উঠিতেছে, ন্যায্য অধিকার ও সত্যবোধ ক্রমশঃ সভ্যতার মধ্যে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই যে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, ইহা হইতেই ধাপে ধাপে শাসন ক্ষেত্রে বৈধ অধিকারের ধারণা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এইরূপেই আধুনিক সভ্যতার মধ্যে এই ধারণা, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

অতএব যখন বিভিন্ন সময়ে ন্যায়-ধর্ম্মনিরপেক্ষ স্বেচ্ছাতন্ত্র শক্তির পক্ষ হইতে এই বৈধ অধিকার তত্ত্বের দোহাই দিবার চেষ্টা হইয়াছে তখন এই তত্ত্বটিকে ইহার প্রকৃত মূল হইতে বিকৃত করা হইয়াছে। স্বেচ্ছাতন্ত্রের ধ্বজা হওয়া দূরে থাকুক, ন্যায় ও সত্যের নামেই এই তত্ত্বটি জগতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এ তত্ত্ব কখনও একপক্ষপাতী হইতে পারে না; ইহা কাহারও একচেটীয়া সম্পত্তি হইতে পারে না; যেখানেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সেখানেই এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইহা স্বাধীনতার পক্ষেও প্রযোজ্য, শক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য, ইহা ব্যক্তিবিশেষের অধিকারও বিচার করিতে পারে, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বিচার করিতে পারে। আমরা যত অগ্রসর হইব তত দেখিব নানা বিভিন্ন প্রকৃতির পরস্পরবিরোধী সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রাজতন্ত্রের মধ্যেও ইহার যেরূপ প্রতিষ্ঠা, মধ্যযুগের ভূস্বামীতন্ত্রের মধ্যে, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর গৌরবতন্ত্রের মধ্যে এবং ইটালীর জনতন্ত্রের মধ্যেও ইহার সেইরূপ প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই তত্ত্বটি বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি দান করিয়াছে, এবং আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

এই ত গেল প্রথম তত্ত্ব. আধুনিক সভ্যতার নানা বিরুদ্ধ উপাদানের তরফে একই কালে যে প্রাচীনত্বের দাবী, তাহা হইতে আর একটি দ্বিতীয় তথ্য যে উদ্ধার করা যায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখন সেইটির আলোচনা করা যাউক। সে তথ্যটি হইতেছে ইউরোপের বর্ব্বরযুগের যথার্থ প্রকৃতি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই দাবী করিয়া থাকে যে এই যুগে সমগ্র ইউরোপে তাহাবই একমাত্র অধিকার ছিল; সুতরাং এটা নিশ্চয় যে এযুগে কাহারও একাধিপত্য ছিল না। জগতে কখনও যদি একমাত্র সমাজব্যবস্থার প্রাধান্য থাকে তাহা হইলে সেটাকে চিনিয়া লওয়া তত কঠিন হয না। দশম শতাব্দীতে আসিয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া বলিতে পাবি যে এ যুগে ভূস্বামী তন্ত্রের প্রাধান্য, সপ্তদশ শতাব্দীতে যে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য, একথা জোব করিয়া বলিতে আমাদেব কোন সঙ্কোচ হইবে না, ফ্লাণ্ডার্সের পৌরতন্ত্র বা ভারতীয় জনতন্ত্ররাষ্ট্রগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলিতে পারি যে ইহাদের মধ্যে প্রজাতন্ত্রতন্ত্রের আধিপত্য। যেখানে বাস্তবিকপক্ষে সমাজে কোন বিশেষ শক্তির আধিপত্য বা প্রাধান্য আছে, তাহা বুঝিতে কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

অতএব ইউরোপীয় সভ্যতার উৎপত্তিকালে কাহার প্রাধান্য ছিল এই লইয়া বিভিন্ন শাসনতন্ত্রেব মধ্যে যে কলহ তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাহারা সকলেই এককালে পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল, এবং কোন শাসনতন্ত্রেরই প্রাধান্য এতটা ব্যাপক ছিল না যে তদ্দ্বারা সেই সমাজের নামকরণ বা আকৃতিপরিচয় হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

ব্যাঘ্রধর্ম্ম

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে স্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল বিষয়ে বিস্তর আলোচনা আন্দোলন প্রভৃতি হইতে থাকায় আমাদের ভাগ্যবিধাতারা এই সম্বন্ধে একটা না একটা মতামত না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদারভাবে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ জানাইয়াছেন, তবে কিনা এইটুকু পুনশ্চ দিয়াছেন যে ওসব বিষয় তাড়াতাড়ি অথবা রাতারাতি হইবার বিষয় নয়। আর অপর একদল, যাঁহারা কথায় অত মার প্যাঁচ বোঝেন না, অথবা বুঝিলেও ঠিক ব্রাকেটের মধ্যে পদাঘাত করাটা পছন্দ করেন না পরন্তু তদপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে পদাঘাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাঁহারা খোলাখুলিই বলিয়াছেন যে এই সমস্ত আমাদের দাবী দাওয়া বাতুলের প্রলাপ মাত্র, শুধু তাহাই নয়, একান্ত অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক, কারণ ভারতবর্ষ তাঁহারা অসিবলে জয় করিয়াছেন এবং অসিবলেই তাহা রাখিবার সঙ্কল্প রাখেন; এবং এ সম্বন্ধে যাহারা কোন কথা বলিতে বা প্রতিবাদ করিতে আসে তাহাদিগকে

ব্রিটিশসিংহের tiger qualities অথবা ব্যাঘ্রধর্ম্ম প্রদর্শনদ্বারা সায়েস্তা রাখিতে হইবে। (কথাটা একটু জীববিজ্ঞানের বিরোধী হইল পাঠক মাপ করিবেন।)

আমরা অবশ্য তাহাতে অত্যন্তই বিরক্ত হইয়া থাকি, অপমান যে হইল সে জন্য অবশ্য ততটা নয়, কারণ সেটা উভয়েত্রই প্রায় সমান , তবে অপমান করিতে হইলেও সেটা ভদ্রভাবে করাই বাঞ্ছনীয়, স্পষ্টতঃ দাঁতখিচুনীটা পরম অভব্য বলিয়া মনে হয়। মহানুভব উদার-হৃদয় মার্জ্জিতরুচি ভারতবন্ধুগণ একবাক্যে এরূপ অভদ্রতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন কিন্তু স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিতে গেলে কি মনে হয় না যে শেষের জবাবটি কিছু কড়া রকমের হইলেও সেইটার ভিতরই সারবস্তু বেশী ? "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই ভদ্রজনোচিত উপদেশের ইহা বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু হিতকারিত্ব ও মনোহারিত্ব এই দুটী গুণের শেষোক্তটির কিছু অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রথমোক্তটির অভাব যদি না থাকে তবে ইহাকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও বিশেষ মতভেদ হইবে না।

সত্য কথা বলিতে গেলে, শুধু ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতাধিকার নয়, প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই অর্ব্বাচীন বিংশশতাব্দীর মহাসমর পর্য্যন্ত, সকল দেশের ইতিহাসেই কি আমরা দেখিতে পাই না যে tiger-qualities বা ব্যাঘ্রধর্ম্মের সদ্ভাব অসদ্ভাবের উপরই জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে ? একথায় সায় দিতে আমাদের সহসা প্রবৃত্তি হয় না। ইংরাজিতে একটা প্রবচন আছে "Wish is father to the thought' । সেই প্রবচনানুযায়ী আমাদের ইহাই প্রমাণ করিতে ইচ্ছা হয় যে যখনই কোন সভ্যতা অপর কোন সভ্যতাকে, কোন জাতি অপর কোন জাতিকে গ্রাস করিয়াছে এবং অল্লাধিকপরিমাণে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত সভ্যতার উৎকর্ষই সেই জয় অথবা সেই সফলতার কারণ। আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন দৃষ্টান্ত এই মতকে সমর্থনও করে। প্রথমেই আমরা হয়ত বলিব যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় যে আদিম অধিবাসিগণ ছিল এবং যাহাদিগের বংশধরগণ আজকাল zoological specimen হিসাবে কথঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনধারণ করিয়া আছে, তাহারা উচ্চতর, উন্নততরসভ্যতাবিশিষ্ট শ্বেতকায় উপনিবেশিকগণের সংঘর্ষে আসিয়া উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে , উচ্চতর সভ্যতার সঙ্গে নিম্নতর সভ্যতার সংঘাত ঘটিলেই কথামালা বর্ণিত কাংস্য পাত্র ও মৃন্ময় পাত্র বিষয়ক গল্প অনুসারে শেষোক্তটির বিনাশ অনিবার্য্য। অষ্ট্রেলিয়ার Bushmenদিগের সম্বন্ধেও বোধ হয় একই কথা বলা হইবে।

এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। সাধারণতঃ যে অর্থে আমরা সভ্যতাকে উচ্চ বা নীচ আখ্যায় অভিহিত করি তাহা কোন্ লক্ষণ বিচার করিয়া ? আমার ত মনে হয় যে জাতি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধর্ম্মনিষ্ঠতায়, সামাজিক আচারব্যবহারে আদর আপ্যায়নে, এক কথায় বলিতে গেলে জীবনের কমনীয়তায় ও মাধুর্য্যে অপর কোন জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহাকেই আমরা সভ্যতর বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এভাবটা আমাদের মনে এতই দৃঢ়বদ্ধ, যে সভ্য বলিলে আমরা ভব্যই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং যে সভ্যতা যে পরিমাণে নম্রতা, বিনয়, ভব্যতা, ধর্ম্মশীলতার পরিপুষ্টি সাধনে সহায়তা করে, সে সভ্যতা সেই পরিমাণে উচ্চ। এ ধারণা ঠিক কিনা সে তর্ক এখন করিতে চাই না, কিন্তু ইহাই মোটামুটিভাবে

আমাদের সাধারণ ধারণা। তাহাই যদি হয় তবে এই প্রশ্ন তুলিতে আমরা বাধ্য যে, যে সব গুণকে আমরা বিশেষভাবে সভ্যতার লক্ষণ মনে করিয়া থাকি সেই সব গুণের প্রাচুর্য্য হেতুই কি অষ্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক আদিম অধিবাসিগণের ধ্বংস সাধন করিয়াছে? Pizarro অথবা Cortesএর অনুবর্ত্তী স্প্যানিয়ার্ডগণের অথবা Botany Bayতে নির্ব্বাসিত কয়েদীদিগের ধর্ম্মনীতি ও সভ্যতা কি এতই উঁচুদরের ছিল যাহার দরুণ দুই এক শতাব্দীর ভিতরেই সেই দেশের আদিম অধিবাসিগণ একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল? এতবড় অসম্ভব কথা বোধ করি কেহ বলিবেন না। কোন কোন গুণে তাহারা যে শ্রেষ্ঠতর ও দুর্দ্ধর্ষতর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি আমরা যাহাকে সভ্যতা আখ্যা দিই তাহা নহে, সেগুলি হইল সেই tiger qualities।

এগুলি ত গেল প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্ত, স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য আর বেশী হাতড়াইয়া বোধ হয় বেড়াইতে হয় না, কারণ "যে দিকে ফিরাই আঁখি" সে দিকেই তাই দেখি। স্যাক্‌সন ও দিনেমার জলদস্যুদিগের হাতে প্রাচীন ব্রিটনের দুর্দ্দশা, মহম্মদঘোরী ও সুলতান মামুদের হাতে হিন্দু ভারতের লাঞ্ছনা, অষ্ট্রগথ, ভিসিগথ, সুয়েভা, আলেমান প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিদিগের প্রকোপে বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংস, এই সমস্ত ঘটনা স্পষ্টতঃই দেখাইয়া দিতেছে যে ব্যাঘ্রধর্ম্মই সেরা ধর্ম্ম, অন্ততঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

এই সমস্ত দৃষ্টান্তে ও উদাহরণে, বিশেষতঃ এই সিদ্ধান্তে আমাদের মানবোচিত আত্মাভিমানে কিছু আঘাত লাগে, তাহা স্বীকার করি। আমরা মানুষ ও অ-মানুষ জন্তুদিগের মধ্যে এমন একটা সুদূর পার্থক্য ও অভিমানের প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছি, যে কোন বিষয়েই জন্তুর সামিল হওয়াই যেন মস্ত একটা লজ্জার কথা। "পশু" অথবা "জন্তু" বলিয়া কাহাকেও অভিভাষণ করিলে মানহানির মোকদ্দমা আশঙ্কা করা হইতে পারে। কিন্তু পশুত্বকে বর্জ্জনীয়ের কোটায় ফেলিয়া আর বোধ হয় জীবনাতিপাত চলিতেছেনা। মানবসুলভ গর্ব্ব ও মত্ততা ছাড়িয়া স্থির ধীরভাবে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের চক্ষে দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? জগতে জীবনসংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে অভাব পূরণ করিতে হইবে, প্রয়োজনানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে, নীতি বা ধর্ম্মের কোন বালাই থাকিবে না, বাধাবন্ধহীন দ্বিধালেশহীন শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহার অধিক বিচারবিতর্কের প্রয়োজন নাই। ইহাকেই ব্যাঘ্রধর্ম্মের মোটামুটি সংজ্ঞাভাবে গ্রহণ করিলে চলিতে পারে।

যদিও মানুষ নিজেকে বড় মনে করে এবং নিজেকে পশুভাবাপন্ন মনে করিতে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করে, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যেখানেই মানুষ এই শার্দ্দূল প্রকৃতির সমধিক বিকাশ দেখিতে পায় সেই খানেই সে সভয় ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকে। যেখানে লোকে দেখে যে একটা লোক সহস্র বাধাবিঘ্ন পায়ে ঠেলিয়া সহস্র বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া বিরুদ্ধ শক্তিকে পদদলিত করিয়া আপন সংকল্প সিদ্ধ করিয়াছে, আপনার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে, তখনই তাহাকে বীর বলিয়া তাহার পদতলে প্রণত হইয়া পড়ে। তাহার কার্য্যাবলী ধর্ম্মানুমোদিত না হইতে পারে, নীতিপুস্তকের চতুঃসীমানার মধ্যেও তাহা না পড়িতে

পারে, কিন্তু যদি তাহার বীর্য্য, ধৈর্য্য, সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির গুণে সে জগতের ইতিহাসে সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই সে Great পদবাচ্য হইয়া থাকে। যাহা কিছু বৃহৎ, যাহা কিছু প্রবল, যাহা কিছু ভয়ঙ্কর, তাহাই যেন মানবের অন্তর্নিহিত যে পাশবতা, যে নগ্ন শক্তিপ্রিয়তা রহিয়াছে, তাহাতে ইন্ধন প্রয়োগ করে। সেইজন্যই মানবের ভাষাতেও নরশ্রেষ্ঠের অপর নাম নরশার্দ্দূল। এই আখ্যাতেই মানুষের অন্তঃস্থিত আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা কোন্ দিকে তাহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। এবং আমরা সচরাচর যাহাকে পুরুষত্ব বা পৌরুষ নামে অভিহিত করিয়া থাকি, তাহাও বোধ করি এই tiger qualitiesদিগের সমাবেশের কাছাকাছি একটা কিছু জিনিষ হইবে। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা হইলেও, ব্যাঘ্রধর্ম্মই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, অন্ততঃ সাধারণতঃ আমরা যাহাকে মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি। জানিনা বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় আপত্তি করিবেন কিনা; কারণ তিনি বলিতে পারেন যে ক্ষীণজীবী মনুজের সহিত মহাপ্রাণ বৃহল্লাঙ্গূল সম্প্রদায়কে একধর্ম্মাক্রান্ত করা অত্যন্ত ধৃষ্টতার কার্য্য; তবে অবশ্য যখন আমরা মহাপ্রাণ সম্প্রদায়কে আমাদের ক্ষীণজীবী সমাজের আদর্শরূপে ধরিয়াছি, তখন তিনি আমাদের মার্জ্জনা করিলেও করিতে পারেন।

রহস্য ছাড়িয়া গম্ভীর ভাবে ভাবিতে গেলেও কথাটা কতক পরিমাণে হেঁয়ালীর মত শুনায়। কোথায় মানুষকে প্রাণিজগতের অত্যুচ্চ স্থান দিব, না একেবারে মানুষের আদর্শ, মানবের পুরুষত্বের আধার হইল tiger qualities? কিন্তু কথাটাতে এতটা চমকিত হইবার বিশেষ কারণ নাই। মানুষের যে শক্তিমত্তা, শক্তিপ্রিয়তা, শক্তির উপাসনাকে আমরা মোটামুটীভাবে ব্যাঘ্রধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, বাস্তবিক কি তাহা মানবের চরিত্রের সর্ব্ববিধ দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার ভিত্তি নয়? আমার ত মনে হয় যে জীবনের কিংবা চরিত্রের কোমলতা, নমনীয়তা, মাধুর্য্যই বড় জিনিষ নয়, তদপেক্ষা পাকা জিনিষ হইতেছে, সাহস ও স্বাধীনতা।

এক কথায় বীরত্বই মনুষ্যত্বের ভিত্তি। বীরত্বের মধ্যে অনেক সময়ে নৃশংসতা, নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতা আসিয়া পড়ে বটে, কিন্তু একথাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে এই বীরত্ব হইতেই এ জগতের সকল বড় আন্দোলন, সকল বড় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সকল বড় মহৎ কার্য্যের উৎপত্তি। ভিতরের মজ্জাগত এই যে শক্তি অথবা Energy ইহা যখন ধ্বংসের কার্য্যে প্রযুক্ত হয় তখন বিভীষিকা উৎপাদন করে বটে, কিন্তু এই শক্তিই যখন জগতের মঙ্গলের জন্য, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য, মনুষ্যের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য নিয়োজিত হয়, তখন তাহারও অভাবনীয় ফলোপধায়কতা দেখিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত হইতে হয়। সকল সময়ে এই শক্তির প্রয়োজনের সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাকা যায় না, তথাপি সেই নিরর্থক শক্তির অপব্যয়ও আমাদিগের মনের উপর একটা ভয়ঙ্কর আকর্ষণ বিস্তার করিয়া থাকে। য়ুরোপের ইতিহাসে আমরা এই যে একটা জিনিষের পরিচয় পাই, এই যে একটা উদ্দাম শক্তিলিপ্সার ও শক্তিক্ষয়ের দৃষ্টান্ত দেখি, যতই কেননা নিরীহ সত্ত্বগুণোপেত আমরা তাহাকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি না।

পেরু কিংবা ক্যালিফর্ণিয়ার সুবর্ণ খনির লোভে মানুষ কিপ্রকারে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও দলে দলে মরুপথে ছুটিতে পারে তাহা বরং কতকটা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু মধ্য আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের ভিতরে, অথবা উত্তরমেরু কিংবা দক্ষিণ মেরুর চিরতুষারাবৃত মরুতটে অথবা দুর্জ্জয় হিমগিরির উচ্চতম শিখরদেশে, শুদ্ধমাত্র ভৌগোলিক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে মানুষ কি করিয়া জীবন পণ করিতে পারে তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সুচারুভাবে বিমান চালনের কৌশল আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত কত শত লোক যে প্রাণ দান করিল, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু প্রতীচ্যের এই উদ্যমের, উৎসাহের, প্রচেষ্টার যেন আর বিরাম নাই। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কলায়, কৌশলে, বাণিজ্যে, এক কথায় বলিতে জীবনের প্রায় সর্ব্ববিভাগেই এই শক্তি, এই উদ্যম নব নব পন্থার আবিষ্কার সাধন করিতেছে। আমরা অবশ্য এই প্রতীচ্য শক্তিউপাসনাকে Romano Gothic বর্ব্বরতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলিয়া মনে করি; এবং ইহা ভাবিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হই যে তবু যাহা হউক সুসভ্য খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এই বর্ব্বরতার রাশ কতকটা টানিয়া ধরিয়াছে, নতুবা পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির বাস করা অসম্ভব হইত। একথা আমিও অস্বীকার করি না। আমারও মনে হয় যে শান্তরসাস্পদ মৈত্রীমূলক খৃষ্টধর্ম্মের শীতল প্রলেপে য়ুরোপীয় বর্ব্বরতার প্রকুপিত বায়ুকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত রাখিয়াছে, কিন্তু তথাপি এই দুইটা জিনিষ, এই বর্ব্বরতা ও এই বীরত্ব, এই নৃশংসতা ও এই নিঃশঙ্কতা একই কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। যে বেলজিয়ম কঙ্গোতে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, এবং যে বেলজিয়ম স্বদেশে নির্ভীকভাবে অমানুষিক অত্যাচার সহিয়াছে, তাহা একই বেলজিয়ম বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টধর্ম্ম জগতের প্রভূত উপকার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ রোমানোগথিক বংশের আদিম মৌলিক বর্ব্বরতা না থাকিলে বর্ত্তমান জগৎ বিংশ শতাব্দীর জগৎ হইয়া উঠিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনিগ্রহত্রাস বিনীতসত্ত্ব ভারতীয় তপোবনের প্রাচীন সাধনার উত্তরাধিকারী আমাদিগের হয়ত মনে হইতে পারে যে বিংশ শতাব্দীর জগতে এমন কোন মাধুর্য্য নাই যাহা না হইলে আমাদের চলিত না; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জগৎ ত আমাদের সেই অভিমানের জন্য নিজেকে কিছুমাত্র দূরে রাখিয়া চলিতেছে না, আমাদের সমস্ত বাধা নিষেধ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হুড়মুড় করিয়া আসিয়া আমাদের কাঁধের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

এখন সুতরাং প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে আমাদিগের খৃষ্টধর্ম্ম অথবা বৈষ্ণবধর্ম্মে কায চলিবে কিনা। যতদূর দেখা যায় তাহাতে ত মনে হয় যে "একগালে চড় দিলে অন্য গাল পাতিয়া দিতে হইবে" এই ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে কাল হইতে কালান্তরে এবং দেশ হইতে দেশান্তরে দুই গালেই কেবল মুহুর্মুহুঃ চড়ই খাইতে হইবে; "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন" হরি সদা কীর্ত্তনীয় কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার অবস্থা যে বিশেষ লোভনীয় হইয়া উঠিবে না ইহাতে কোন সংশয় নাই, পরন্তু ইহাই স্থির নিশ্চিত বলিয়া বোধ হয় যে

তৃণের ন্যায় সুনীচ হইয়াই চিরকাল কাটাইতে হইবে, ইহা হইতে উচ্চে উঠিবার দুরভিসন্ধি দুঃসাহস বলিয়াই পরিগণিত হইবে। এই প্রেমের ধর্ম্ম, ত্যাগের ধর্ম্ম, দীনতার ধর্ম্মকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় যে দেশে এক শতাব্দী পূর্ব্বেও "Entbehren sollst du sollst entbehren" (ত্যাগ কর, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে) এই মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল আজ সে দেশ Uebermensch (অতিমানুষ) এর আদর্শে আচ্ছন্ন হইয়া weltmacht এরজন্য তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ের বিষয় এই যে দেশে বাইবেলের ধর্ম্ম প্রচারিত সে দেশ হইল শক্তিলিপ্সু, আর যে দেশে গীতাধর্ম্মের প্রচার সেই দেশ হইল শান্তিপ্রিয়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

বাস্তবিক কি দীনতার ধর্ম্ম, অনুশোচনার ধর্ম্ম, আত্মগ্লানির ধর্ম্ম মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে জাগরিত করে, না স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা এবং আত্মপ্রত্যয়ের ধর্ম্ম মানবজীবনকে পূর্ণ পরিণতি প্রদান করে? অন্ততঃ একথাও স্বতঃই মনে উদিত হয় যে নিয়ত নিজের দোষ ত্রুটির আলোচনা করিলে, আত্মবোধের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায় নিয়োজিত থাকিলে মনের কি একরকম অস্বাভাবিক অবস্থা হয় যাহা সুস্থ সবল জীবন যাপনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। স্বভাবতঃ মানুষ নিজে নিজের উপর প্রত্যয়শীল এবং নির্ভরশীল, এবং সেই নির্ভরের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া দেওয়াই সহজ ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। আলাপে ব্যবহারে, কথায় এবং চিন্তাতেও সব সময়ে নিজেকে দীনহীন এবং খাটো বলিয়া জ্ঞান করিতে করিতে বাস্তবিকই মানুষের চরিত্র যেন নিস্তেজ ও খাটো হইয়া আসে। সুতরাং মানুষের শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে এ পথ প্রকৃত পথ নহে। নেতা কিংবা চালক কখনও এ পদার্থে নির্ম্মিত হইতে পারে না। সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ অনুচর প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইলে বোধ হয় ততটা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তৃণাদপি সুনীচেন একজন নেতাদ্বারা যে কিরূপে বিজয় লাভ করা যায়, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। নেতার ধর্ম্মকে আমরা যদি ব্যাঘ্রধর্ম্ম নামে আখ্যাত করি, নীতের ধর্ম্মকে আমরা সেই অনুসারে মেষধর্ম্ম নাম দিতে পারি। নৈয়ায়িকের গড্ডালিকা প্রবাহ ন্যায়েরও ভরসা করি এখানে কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

কবি গাহিয়া গিয়াছেন "মানুষ আমরা, নহিত মেষ" কেহ কেহ আবার কথাটীকে একটু খানি সরাইয়া দিয়া বলিতে চাহেন "মানুষ আমরা নহিত, মেষ।" ইহার কোন্ পদবিন্যাসটি যে যথার্থ তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদের সম্ভাবনা। আমার ত মনে হয় শেষোক্ত বিন্যাসটিই মোটামুটি সত্য, প্রথমটি আদর্শ মাত্র। খালি যে মনের দুঃখে আমাদের দেশ সম্বন্ধেই এবংবিধ করুণ কথা বলিতেছি তাহা নহে, বস্তুতঃই সকল দেশেই মানুষ জাতীয় লোকের অভাব, কিন্তু মেষজাতীয় লোকের অন্ত নাই। রবি বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তাহারাই পনের আনা। তাহারা গতানুগতিক, তাহারা নীত হয়, চালিত হয়, চালাইবার ক্ষমতা কদাচ তাহাদের হয় না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই Nietzsche ইহাদের অবলম্বিত নীতিকে Slave morality আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। তবে সৌভাগ্যবশতঃ একথাও সত্য যে এই মেষসুলভ নিরীহ নিস্পন্দ জীবনযাত্রা জীবনকে একেবারে অসাড় করিয়া ফেলে

বলিয়া সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে জীবনটাকে তরঙ্গিত করিবার অভিলাষ করেন; এবং নিজের জীবনে সে শুভ মুহূর্ত্ত যদি কখনও নাও আসে, তবে অন্ততঃ অন্য কাহারও জীবনসঙ্গীতের রুদ্রতাল অনুভব করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করেন। এই প্রেরণা যাহার মধ্যে যত বেশী তাহার জীবনের বৈচিত্র্য, মনুষ্যত্বের বিকাশ সেই পরিমাণে বেশী। এই প্রেরণাই মানুষকে অনাদিকাল হইতে বিপদের দিকে, অনাগত ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় ভীষণতার দিকে দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে। রণবাদ্যের মোহ, সংগ্রামের মত্ততা এই প্রেরণা হইতেই উদ্ভূত। শত যুক্তি তর্ক বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও, সহস্র অসুবিধা ক্ষতি উৎপীড়ন স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও, এই জন্যই মানব হৃদয়ে সমরসাধ এত দুরপনেয়। ধীর স্থির সদ্বিবেচক জ্ঞানিগণ এইজন্য এত Hague Tribunal করিয়াও সমরনিবৃত্তি করিতে পারিতেছেন না। আর সম্পূর্ণরূপে সমরনিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর হইলেও সেটা মানব সমাজের পক্ষে উচিত হইবে কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ। শুধু একঘেয়ে একটানা টাকা—আনা—পাই সংক্রান্ত ব্যবসায় কারবার চিরদিন নিয়মিত ভাবে করিতে হইলে ত জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। সমস্ত ভূভাগ latitude longitudeএ একেবারে নিশ্চিত ভাবে স্থিরীকৃত হইয়া লূতাতন্তর ন্যায় রেলজালে আবৃত হইলে ব্যবসাদারের সুবিধা হইবে একথা নিশ্চয়, কিন্তু অকেজো পর্য্যটকের ভ্রমণানন্দ চিরকালের মত অন্তর্হিত হইবে।

আর একথাও ত বুঝিতে পারি না কেনই বা সমরে শ্রেষ্ঠতায় জাতির শ্রেষ্ঠতা নির্ণীত হইবে না। সমস্ত প্রাণিজগতের ভিতরে যে জীবনসংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, তাহা ত শুধু সমরনিপুণতারই পরীক্ষাক্ষেত্র বলিয়াই মনে হয়; আধ্যাত্মিকতার চিহ্নমাত্র ত তাহাতে দেখিতে পাই না। শুধু জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের সময়েই দয়াধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া অযথা গোল পাকাইয়া তুলিবে? এত ত বড় অন্যায় আবদার। শক্তির পরীক্ষাই ত শেষ পরীক্ষা। যখন একটা জাতি আর একটা জাতি কর্তৃক পরাস্ত হইল, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে প্রথমোক্ত জাতি জীবন যুদ্ধোপযোগী উপকরণাদিতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল; সে জাতির বংশের ধারা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। Weismannএর সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় যে অর্জ্জিতগুণ সন্তানে অর্শে না, তাহা হইলে ত ঐ দুর্ব্বল জাতিকে বারবার শিক্ষা দীক্ষাদির দ্বারা সতেজ করিয়াও কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হইবে না, কেবল লাভের মধ্যে ঐ দুর্ব্বল জাতির বংশবৃদ্ধি সমস্ত মানব জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। ইহাতেই কি humanityর উপকার সাধিত হইবে? আচার্য্য Huxley একবার Romanes Lectereএ বলিয়াছিলেন বটে যে যুদ্ধে পারদর্শিতার সহিত উন্নত সভ্যতার কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ Survival of the fittest মন্ত্রের fittest সব সময়ে best নহে। সভ্যতার সাধারণ ধারণা—যাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা দেখিয়াছি তদনুসারে ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যে best survive করিবেনা তাহাকে best বলিয়া আমরা অনর্থক আমাদের মনঃকষ্ট বাড়াই কেন? সেই best প্লেটোর archetype এর স্বর্গরাজ্যে স্বচ্ছন্দ ভাবে বসবাস করিতে পারে, কিন্তু এ মরজগতে তাহাকেই আমরা best বলিব, যাহা টিঁকিয়া থাকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন সভ্যতার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের

অপর কোন কষ্টিপাথর নাই। সমরবাদের মূল সত্য এই খানেই। Might is right। পশুধর্ম্ম বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করিলে কোনই লাভ নাই mightই হইতেছে rightএর একমাত্র প্রমাণ।

এই শক্তির উপাসনা মানুষের শত ছলনা, শত আত্মপ্রতারণা সত্বেও মানুষের হৃদয়ের সামগ্রী। সর্ব্বগ্রাসী শক্তির রুদ্র জ্বালা মানবমনকে অভিভূত করে, তথাকথিত ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষের অন্তরতম শক্তিপূজাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, এবং মানুষ নিজেও অপ্রতিহত শক্তি লাভ একান্ত ভাবে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ পরিণতি এই ভাবেই লাভ করে। যখন মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন এই কথাটাই তাহাকে শোনাইবার যে দুর্ব্বলতা তাহার জন্য নহে, সে বিশ্বশক্তির আধার, তাহাকে জয়ী হইতে হইবে। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে শক্তি সাধনাই তাহার করিতে হইবে।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এই মন্ত্রই দান করিয়া গিয়াছেন

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

পুস্তক পরিচয়

ঋগ্বেদ—বেদমাতা গ্রন্থাবলী। শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

এখন বুঝিতেছি বইখানির আলোচনার ভার লওয়া আমার বুদ্ধির কাজ হয় নাই। প্রীতির অনুরোধে প্রীতির উত্তর দিতে যে এমন বিষম বুদ্ধির দায়সংযোগ, তা স্থূলচক্ষু আগে দেখিতে পায় নাই। বাদপ্রতিবাদের সোজাসোজি ব্যাপার এক বস্তু, আর গুণীর গুণমর্য্যাদা শিরোধার্য্য করিয়া সন্তর্পণে যে প্রতিবাদ সে বস্তু আর। ফলতঃ এই বইখানি যে আত্মপ্রত্যয় হইতে লিখিত তাহা এক সরল সজ্জন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তিতেই সম্ভব, সুতরাং ইহাতে আমাদের মতন অজ্ঞ প্রত্যয়াবলম্বী লোকের নীরব থাকাই সঙ্গত মনে হয়। একেত এই সঙ্গতি লঙ্ঘনের ত্রুটী, তাহাতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের অপ্রীতি-সম্ভাবিত বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ, এই উভয় কারণে আগেই আমরা গ্রন্থকার মহাশয়ের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এখনকার দিনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বেদানুশীলনে যিনি জীবন যাপন করেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। যিনি স্বাধীনভাবে বেদালোচনা করিয়া এটুকু অন্ততঃ বুঝিয়াছেন যে বেদ কোরাণ বস্তুতঃ এক, আজকাল তিনি তো সকলেরই সম্মানার্হ। ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য নহেন, উপাধি কি জাতীয় গৌরবের প্রত্যাশা রাখেন না, অথচ সত্যানুসন্ধানে যিনি

---

* এই প্রবন্ধটী বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে লিখিত; এবং শক্তির আদর্শের সপক্ষে একটা extrema tatement প্রকাশ করিবার নিমিত্তই লিখিত। ইতি লেখক।

ঋক্-সকলের শরণাপন্ন তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাকর্ষণ করিবেন। তাঁহার কোন সিদ্ধান্ত যদি আমাদিগের ভুল মনে হয়, তবে তাহাও আমাদের আদরের ;-কেননা এ ভুল তাঁহার সত্যানুসন্ধানেরই অন্তর্গত।

শাস্ত্রের একটী প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, "নানুসন্ধেঃ পরাপূজা"—অনুসন্ধান অপেক্ষা প্রকৃষ্ট পূজা আর নাই। বস্তু সাক্ষাৎকারের পরে বস্তু-পূজার আপ্তোক্তিকেই আমরা ঋক্ বলিয়া জানি, আর গ্রন্থকার মহাশয় যে বলিয়াছেন—"বেদ' অনন্তাঃ"—তাহাও অবশ্য আমাদের শত শতবার স্বীকার্য্য, কিন্তু এইটুকু বলিলেই যে যথেষ্ট তাহা নহে। আমরা বলিতে চাই যে প্রত্যেক ঋক্ অনন্ত। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ধৃত এই ঋক্‌ই তাহার প্রমাণ—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্ বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

ঋকের বিভক্তিরহিত বা বিভাগবিবর্জ্জিত যে ব্যোম বা আকাশ, তাহা এক পরম অক্ষরে যথায় দেবগণ অধিবিশ্বে অর্থাৎ বিশ্বাধিক্যে আসীন থাকিতেন। যিনি তাহা না জানেন ঋক্ লইয়া তিনি কী করিবেন? যাঁহারা পাইয়া (ইৎ) তাহা জানিতেছেন ইহাঁদিগকে তাঁহারাই সমাস অর্থাৎ এক পদস্থ করেন।

এই তো ঐ ঋকের অনুবাদ, কিন্তু বুঝিতে গেলেই যে আমাদিগকে গোলমালে পড়িতে হয়। ঐ যে ব্যোম যাহাতে বিভক্তি বা বিভাগ নাই তাহা ত সুতরাং অনন্ত ও অখণ্ড। কিন্তু যাহা অখণ্ড ও অনন্ত তাহাতে বহু দেবতার সমাবেশই বা কি করিয়া হইতে পারে? খণ্ডরূপে দেবতাপদের অবতারণাই বা করি কিরূপে? অদিতির, অখণ্ডনীয়ার, সন্তান যে দেবতা তিনি স্বয়ং অখণ্ড বা অনন্ত; সুতরাং একটি মাত্র অনন্তে বহু অনন্তের সমাবেশ; এই কি উহার সদুত্তর? "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" বলিয়া উপনিষদ প্রমাণে যে আমরা মনে মনে ক্ষুদ্র এক অনন্ত এবং বৃহৎ এক অনন্ত, এই দ্বিবিধ অনন্তের ধারণা করিয়া বসি তাহা কি যুক্তিসঙ্গত; অনন্তের ধারণাই আমাদের নাই, সুতরাং তাহার আবার প্রাপ্তি কিরূপ? "ইৎ" বলিতে ই ত গতি বা প্রাপ্তি, কিন্তু এই প্রাপ্তি কিসের? হয় বা কা'র।

অনন্ত বলিতে এক; না, এক বলিতে অনন্ত? একে, একের পর্য্যায় দুই তিন চারি আদি সংখ্যা স্বতঃই চিত্তে উপস্থিত হয়, এবং এই সংখ্যার চরম বা শেষাবয়বেও শেষে অসংখ্যকে আনিয়া দাঁড় করাইতে হয়। এই অসংখ্যে ও অনন্তে বরং সজাতীয়। একে অনন্তে সমভাব কিসে? তারপর, একের আবার যে সব ভাগ, এই ভাগের শেষ ফলেও পাই সেই অনন্ত। যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণে, তেমনি অল্প বিস্তর সংখ্যায়, শেষে সেই অনন্ত। আবার যেহেতু শেষের শেষ অসম্ভব, অতএব শেষই অশেষ অনন্ত। ফলতঃ ইহাই যদি হয়, তবে, একে আর অনন্তে সম্বন্ধই ত নাই; তবে অনন্তে একের ভাব মনে আসে কেন? এ সব কথা আসিবে পরে যথাক্ষেত্রে। এখন যে ঋক্‌টি তুলিয়াছি, তাহাই বুঝি।

ঋগ্বেদের পরমাকাশই বলি, আর পূজার আপ্তোক্তির পরমাকাশই বলি, তাহাতে তেমন কিছু আসে যায় না, কিন্তু ঐ যে বলিয়াছেন বিশ্বাধিক্যে, উহাই আসল কথা। বিশ্বাধিক্যে, বিশ্বাতিরেকে, আর এক বিশ্বে, ইহাই মনে রাখিবার কথা। এই বিশ্বের কোনো আকাশ তা' নয়। কোথা সেই বিশ্ব, যার অন্তরীক্ষে অনন্তরূপী অমরগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন? যাহাতে তাঁহারা, তাহা ত পরম হইবেই; কিন্তু এই পরম বলিলে যে শ্রেষ্ঠ পরিমাণ, তাহার সাদৃশ্য এখানকার এই সকল নামরূপের কোথায়? অনন্ত-সম্ভাবিত পরিমাণ বা পরিমাণরাহিত্য সেই বিশ্বাতিরেকের অনন্ত অতিদেশেই সম্ভব; এখানে এদেশে তাহার তুলনা দিতেই বা কী আছে? এখন এই ঋক্ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, সে সকলের পরিচয় যিনি না পাইয়াছেন, ঋকে তাঁর কি দরকার? অতঃপর এই ঋকের শেষাংশটুকুর যে সহজ অর্থ, তাহা ক্রমশঃ পরে করিলেই চলিবে।

মানে, ঐ যে আপ্তোক্তি বলিয়া গিয়াছি, তার সোজা অর্থ আগে হওয়া চাই। আপ্তের উক্তি, আপ্তোক্তি; কিন্তু আপ্ত কার নাম? আপ প্রাপণে, সুতরাং আপ্ত বলিতেই প্রাপ্ত। প্রাপ্তের উক্তিই আপ্তোক্তি। প্রাপ্তির পরে যে পূজা বা পূজার উক্তি, তাহাই ঋক্ বা ঋকের অক্ষর। ঋষি যাঁহাকে পাইয়াছেন, এবং পাইয়া যাহা করিয়াছেন, ঐ ঋক্‌শেষাংশে তাহাই সুব্যক্ত। পাইতেছেন অমৃত, যৎ প্রসাদে দেবতারা অমর, যৎপ্রসাদে মৃতও জীবন্ত হইয়া থাকে; ঋষি পাইয়াছেন তাঁহাকে। তখন কী করিতেছেন, না, ইহজগতের যেখানে যা আছে, সব গুটাইয়া অঞ্জলি ভরিয়া সেই অমৃতের চরণেই অর্পণ করিতেছেন; অথবা সেই অমৃত কলসেই নিক্ষেপ করিতেছেন সবই এক কথা ইঁহার কথা আবার আমাদিগকে তুলিতে হইবে।

এইত ঋক্, তার পর? তার পরে বেদ; এই উভয়ে পদের যোগে ঋগ্বেদ। এই বেদ কার নাম? বোধ হয় গ্রন্থকার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, বেদেই নাই বেদ কার নাম। পরেকার শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন বটে যে, "ন বেদোবেদ ইত্যাহুর্বেদব্রহ্মসনাতনম্"। কিন্তু তত্রাচ বেদ পদটির আসল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা চাই; নহিলে বেদের যা গাম্ভীর্য্য, কিছুই বুঝা যায় না। বিদ ধাতু সিদ্ধ বেদ পদে বেদন বা অনুভবাত্মক জ্ঞান যে নহে, তা বলিতেছি না, কিন্তু অপৌরুষেয় বাক্যের শ্রুতমূলক যে জ্ঞান, তাহাই এই বেদ পদের মুখ্য ও চিরপ্রসিদ্ধ অর্থ। শ্রুতিতে ঐ অপৌরুষেয় বাক্য শ্রুত না হইলে তাহা শ্রুতি মধ্যে গণ্য নহে, এবং তাই শ্রুতি বলিতেই বেদ ও বেদ বলিতেই শ্রুতি। সময়ে তাই শ্রুত ও শ্রুতি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই যে জাত হইয়া মাত্র ব্রাহ্মণ শিশুর কর্ণবেধের প্রথা এখনো বিদ্যমান, তার মূলেই ত এই কথা; পরন্তু সে কথা এখন থাক।

এই যে উপনিষদ্বাক্য—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—ইহাতে কী বুঝিব? এখানে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্যের অন্তর্গত দর্শন শ্রবণ ও নিদিধ্যাসন, এই তিনটি পদের প্রত্যেকটিকেই প্রাধান্য না দিয়া, যদি কেবল মন্তব্যের মননকেই ধর্তব্য বলি, এবং দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্যের দর্শন-শ্রবণকে মানস-দর্শন ও মানস-শ্রবণ এবং নিদিধ্যাসনকে যদি মানস-বিচার বলিয়া নিষ্পত্তি করি, তবে কি তাতে সত্যের এক মস্ত ব্যত্যয় করিয়া বসি

না ? "বা" পদের মুখ্যার্থে বিকল্প, বিবিধকল্প, অর্থাৎ যে বিবিধ বিধি, তাহা ত্যাগ করিলাম কেন ? অথবা নিদিধ্যাসন বলিতে যে চিত্তের অভিনিবেশ, অর্থাৎ অন্তঃকরণের আসক্তি, তাহাই বা না মানিলাম কেন ? এ ত সোজা কথা না দেখিলে, না শুনিলে, মনে আসক্তি কি হয় ? অথচ এই সোজা কথাকে বাঁকা করি কেন ?

করি কেন, তাই বলি। শ্রুতি উপনিষদ গীতা পুরাণাদি সকল শাস্ত্রে এই আত্মার অনেক রকম বিপরীত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। এই যেমন কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়," পরে বলিতেছেন :—"অপানি-শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ। পুন কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ।"— এই রকমের বিপরীত সব উক্তির ভিতর দিয়া আমাদের শাস্ত্র আত্মার পরিচয় দান করিয়াছেন। শাস্ত্র কখন বলিয়াছেন, ইনিই সমস্ত : আবার বলিয়াছেন, ইনি এই সমস্ত হইতে ভিন্ন ; কখন বলিয়াছেন বড়ই কাছে, আবার কখন বলিয়াছেন এমন দূর আর নাই ; কখন বলিয়াছেন ইনি অটল অচল, আবার বলিয়াছেন সদাই সচঞ্চল। এইমত হাঁ-না রকমের বিষম বিরুদ্ধোক্তি শাস্ত্রে যে কতই আছে, তাহার অন্ত নাই বলিলেও মনে হয় অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু, তবুত এ সকল কথা লোকের মনোমুগ্ধকর! মনুষ্যহৃদয় চাহে এই মত এক বস্তু, যা অনন্ত রকমে অনন্ত হইলেও তাহার ইহ-পর কালের একমাত্র ভরসার স্থল। হৃদয় যাহা অনবরত চায়, অথচ প্রত্যক্ষে যাহাকে না পায়, তাহার অস্তিত্ব যুক্তিতেও অন্ততঃ যদি মিলাইয়া লইতে পারে, তবে তাহাতেও স্বভাবতঃ মানব হৃদয় তৃপ্তি পাইয়া থাকে। ফলতঃ এই যে তৃপ্তিলাভ, এই জন্যই যুক্তিমার্গে আত্মান্বেষণে সহজেই প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। শাস্ত্র হাজার বলুন যে, সেই আত্মা দেবতাদেরও দুর্লভ, মননে তাঁহাকে পাওয়া যায় না ; হাজার বলুন যে, আত্মা মনো-বুদ্ধির অগোচর ; হাজার বলুন আত্মা স্বপ্রকাশ ; তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার কেহই নাই ; তবু মননশীল পণ্ডিত তাঁহার মনন দ্বারা আত্মনির্ণয়ে যত্নবান না হইয়া থাকিতে পারেন না। মননে মননই যেন প্রত্যক্ষ, আর বিশ্বসংসার আদি সমস্তই পরোক্ষ। মননশীলের নিকট মন ও তাঁহার অস্মিতা প্রত্যক্ষবৎ। যদিও এই দুইটি নিরাকার, তত্রাচ এই নিরাকার অস্মিতা ক্ষেত্রে নিরাকার মনের চরকা বসাইলে নিরাকার স্তোত-সূত্র রাশি রাশি অনর্গল নির্গত হইতে থাকে। সমস্তই নিরাকার অথচ মনে হয় ঠিক প্রত্যক্ষ! অহংজ্ঞান ও মনন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপেক্ষা কি কোন অংশে তাঁহার নিকট কম! কিছুতেই নহে। অতএব আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে মননশীল পণ্ডিত ব্যক্তির মীমাংসাই এই :—"স্বরূপাব্যবধানাভ্যাং জ্ঞানালোক স্বভাবতঃ। অন্যজ্ঞানানপেক্ষত্বাৎ জ্ঞাতশ্চৈব সদা ময়া॥" গ্রন্থকার মহাশয় মনে করেন, ইহাই বেদের চাবি। উক্তিটি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের হস্তামলক হইতে উদ্ধৃত। আচার্য্য দেব স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করেন নাই, এই নিষ্পত্তি গ্রন্থকার মহাশয় নিজেই করিয়াছেন ; অথচ সেই বেদের চাবি তিনি যে ঐ আচার্য্যদেবেরই দু'একটি উক্তি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! এখানে আচার্য্যদেব বলিতেছেন যে, স্বরূপ ও অব্যবধান, এই হেতুদ্বয় বশতঃ, এবং জ্ঞানালোকের স্বভাবক্রমে, এবং অন্যজ্ঞানের অপেক্ষা না থাকায়, (আত্মা) মৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদাই জ্ঞাত। ইহা হইতে এই বুঝিতে হয় যে, আত্মরূপে ব্যবধান নাই, কেননা

তিনি যে সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ, আর স্বাভাবিক জ্ঞানে অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই; সুতরাং সকল সময় সে জ্ঞান ত আমার জ্ঞাতই রহিয়াছে—মোট কথা, অজ্ঞান এবং অন্যজ্ঞান না থাকিলেই হইল, এবং তাহা হইলে আমার স্বরূপ যে আত্মা, সে জ্ঞান ত আমার আছে। ইহাতে আমারই খাঁটি জ্ঞান রক্ষা করিতে, আমারই অজ্ঞানকে ও আমারই অন্যজ্ঞানকে সরাইয়া দিতে আমারই উদ্যম; ইহাই বাছিয়া পাই। আমি, আমি আর আমি; অথবা আমার, আমার, আর আমার! যদি বলা যায়, না, আমা'ছাড়া ঐ যে জ্ঞান তাওত আছে তবে বলিতে হয়—ভাল, আমি ও আমার জ্ঞান কি পৃথক? পৃথক যদি ত, পৃথক বস্তু কই? এবার উত্তর আসিবে—কেন? ঐ যে জ্ঞান, ঐ জ্ঞানইত স্বয়ং বস্তু। এ মত বস্তুতত্ত্বের আসল কথা সুতরাং এক অহংজ্ঞান বা অস্মিতা ব্যতিরেকে অপর কিছুই নহে।

এইরূপে যিনি কেবল মননশীল, তিনি আপনার ভাবে আপনাকে এই বিশ্বে আরোপ করিতে পারেন; এবং বিশ্বের মহিমাও আপনাতে আরোপ করিয়া, অধ্যাসে আপনার ভিতরেই এক ছোট আমি ও আর এক বড় আমি গড়িয়া তুলিয়া, খাঁটি অদ্বৈতের দ্বৈতাদ্বৈতের ভজনাদিও গাহিতে পারেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে মানস দর্শন মানস শ্রবণ কি মানসপ্রত্যক্ষের কথা না লিখিয়া, তাহাকে সাদা কথায় না হয় অনুমান বলিয়াই লিখিবেন। প্রত্যক্ষ বলিতে সাক্ষাৎ, সম্মুখে মূর্ত্তিমান, ও ইন্দ্রিয় জন্য যে জ্ঞান, আর মনে দর্শনশ্রবণ যাহা হয়, তাহা হয় স্মৃতি, ন হয় অনুমান। এই উপলক্ষে গ্রন্থকার মহাশয় "কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য" কার্য্য কারণের একত্বজ্ঞাপক যে শঙ্কর বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও কি অনুমান নহে? অনুমানের অনায়াসত্বে কি কখনও তাহার প্রত্যক্ষত্ব, কি তাহার চক্ষুগোচরত্ব, সাধিত হইতে পারে? চর্ম্মচক্ষুর দর্শনক্রিয়া যখন স্বপ্নদশায় মনশ্চক্ষুদ্বারায় সম্পাদিত হয়, তখন অবশ্য মনই চক্ষুর ইন্দ্রিয়; কিন্তু আশ্চর্য্য! জাগ্রদ্দশাকেও কি সেই স্বপ্নদশায় পরিণত করা চাই? পরন্তু ইহাত তাহাও নহে। স্বপ্নের যে মানস-দর্শন, কি মানস শ্রবণ, কি মানস-সাক্ষাৎকার, তাহাও মূর্ত্তিমান ও সাকার। এখানে কিন্তু যা, তার যে সমস্তই অমূর্ত্ত নিরাকার! অথচ বলা চাই যে তাহা বস্তু—এমন বস্তু যে তাহা মনেই প্রত্যক্ষ হয়! প্রত্যক্ষানুমানের এমন খিচুড়ি বা বিষমবিভ্রম, অতিরিক্ত মননমাত্রাতেই হইয়া থাকে।

নিরাকারের বিস্তর মহিমা গ্রন্থখানির অনেক জায়গায় উক্ত হইয়াছে; অথচ সে সকল স্থলে আমরাত সাকারব্যতিরেকে আর কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। অরণিনিহিত নিরাকার অগ্নির সাকারত্ব সম্পাদন তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল এবং হোমাদিপ্রকারে সাকার অগ্নির নিরাকারত্বনিষ্পাদনও তাহাই। কিন্তু সাকার শক্তি ও সাকার কণা ব্যতিরেকে আমরা ত ইহাতে আর কিছুই পাই নাই। শরীরের বলে যে ঘর্ষণ, ও সেই ঘর্ষণে কাষ্ঠ রেণুর যে শিথিলতা ও বিশ্লেষণ, এবং ঐ বিশ্লিষ্ট রেণুতে বায়ব্যাংশের সংযোগে অগ্ন্যুৎপাদন; ইহার কোন্‌টি নিরাকার! আমরা ত সাকারের পরিণামে প্রকারান্তরে সাকার হইতেই যেমন বরাবর দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি, তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় এ ক্ষেত্রে হয় নাই বলিয়াই বুঝিতেছি।

আমরা সাকারবাদী।* সুতরাং আমরা গ্রন্থকার মহাশয়ের নিরাকারবাদের অযথা সম্মান প্রদর্শনে প্রস্তুত নহি। চূড়ান্ত সাকারবাদের সপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার দৃষ্টান্তই বরং দেখাইতে চাই। অসংখ্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে ডাকিয়া আনিয়া ভগবান আমাদের চতুর্ম্মুখ সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখাইয়াছিলেন বলিয়া তথায় বর্ণিত হইয়াছে। অনন্ত সৃষ্টির অসংখ্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া আমাদের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তখন ভগবানের যে স্তব করিয়াছিলেন, তাঁহাতেই ত সাকারবাদেব অগাধ গাম্ভীর্য্য প্রকাশিত। নূতন কিছু আমাদেব এ বিষয়ে বলিতে যাওয়া যেন ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়।

এখন জিজ্ঞাসা, গোড়ায় যে ঋক্‌টি তুলিয়াছি, তাহাতে অধিবিশ্ব বলিতে যে অতিরিক্ত বিশ্বের উল্লেখ আছে, যেখানে দেবতাগণ নিষণ্ণ রহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, সেই বিশ্ব কি ঐ অসংখ্য সাকার বিশ্বের অতিরিক্ত, না—উহারই অন্তর্ভুক্ত? উত্তরে বলিব অন্তর্ভুক্ত, পরন্তু প্রকারতঃ উহা অপর সকলেব যে অতিরিক্ত, ইহাই সদুত্তর। যে বিশ্বে প্রত্যেক অনন্ত মূর্ত্তি দেবতা একেরই বশবর্ত্তী, একের একতার একভাবাপন্ন, সুতরাং যেখানে এক ব্যতিরেকে দুই নাই, উহা তাহাই। ব্রহ্মসূত্রের নির্দ্দেশ মত "বিভাগঃ শতবৎ" শতবৎ বিভাগ যেখানে, উহা তাহাই। "শত" পদ যেমন একবচনান্ত, তেমনি যেখানকার কোটি কোটি বিভাগ সর্ব্বদা ঐ এক বচনেই পর্য্যাপ্ত, এই অতিরিক্ত বিশ্ব সেই খানে—অতীন্দ্রিয়, অচিন্ত্য, অথচ সাকার! "প্রকৃতিভ্য পরং যত্তু, তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্" সৃষ্টির সকল পদার্থ হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাই অচিন্ত্য। এই ত অচিন্ত্য, আর অতীন্দ্রিয়? অতি-ইন্দ্রিয় যা' অতীন্দ্রিয় তাই; যেমন—অতিবায়ু, অতিপথ, অতিবান, অতিমানুষ, ইত্যাদি অসাধারণ অলৌকিক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই অতীন্দ্রিয়।

বেদে ইন্দ্রিয়গণ দেবতা। যেহেতু সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত রূপ ঐ অধি-বিশ্বে, ঐ বিশ্বাধিক্যে, বা অতীন্দ্রিয়ে; অতএব প্রকৃতরূপে যাহারা যে বস্তু তাহাই বেদ বলিয়াছেন; অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই স্বভাবতঃ স্বরূপতঃ সত্যই দেবতা। এখন এই যে দেবতাগণ, ইঁহারা যে একের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকেন, বেদ কি তাঁহাকেও নির্দ্দেশ করেন নাই? ইনিই একেশ্বর।

ইনিই ত হৃষীকেশ; কেন না হৃষীক বলিতেই ত ইন্দ্রিয়, সুতরাং ইনিই মহেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর ও পুরুষোত্তম।

কখনো বা কোন কারণে এক বা একাধিক অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ যদি বা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু সকল শাস্ত্র একবাক্যে ইহাই উপদেশ দিয়াছেন যে, ঐ যে এক, ইনি স্বপ্রকাশ; ; অর্থাৎ কেহই ইহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। ইঁহার যে স্বপ্রকাশ নাম ত হা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্পষ্টাক্ষরে উপনিষদই তাহা না কোন্ বলিয়াছেন? এইত বলিতেছেন—

---

* ইন্দ্রিয়গম্য হইলেই সাকার বলিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ের আদ্যন্ত না পাইলে সাকারের আদ্যন্ত পাওয়া অসম্ভব। সাকারবাদের মূল মর্ম্ম-কথাই এই।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥

প্রবচন দ্বারা এই আত্মা লভ্য নহেন। বহুশ্রুত হইলে, এবং মেধা থাকিলেও, ইনি লভ্য নহেন। যাঁহাকে ইনি বরণ করিতেছেন, তৎকর্ত্তৃকই ইনি লভ্য—এই আত্মা তাঁহার স্বকীয়া তনুকেই বরণ করিতেছেন।

অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা ছিল। বলিবার সময়ও নাই, এবং শরীরের সামর্থ্যও নাই। এই আত্মাই যে হৃষীকেশ, এবং ইনিই যে মহেশ্বর পুরুষোত্তম, এবং এই আত্মজ্ঞানই যে বড়ই গূঢ় বা গুহ্য, তাহার কেবল প্রমাণোদ্ধার পূর্ব্বক আমরা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করি। সর্ব্বত্র সমস্ত বেদ কেবল মাত্র যাঁহাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে স্বয়ং ভগবান ইহা বলিতেছেন

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে, ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ, পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য, বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহ মক্ষরাদপিচোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ, প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসম্মূঢো, জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং, সর্ব্বভাবেন ভারত॥
ইতিগুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥

লোকতঃ পুরুষ বলিতে দুই—ক্ষর এবং অক্ষর জন্তু মাত্রই ক্ষর, এবং যিনি কূটস্থ তিনি অক্ষর পদ বাচ্য। তিনি পরন্তু অন্য, যিনি উত্তম পুরুষ, এবং যিনি পরমাত্মা বলিয়াও বর্ণিত হইয়া থাকেন। ত্রিজগতে প্রবেশ পূর্ব্বক অব্যয় ঈশ্বর হইয়া ইনিই বিশেষ রূপকে ভরণ করিতেছেন। যেহেতু ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তম, অতএব আমিই লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তমরূপে প্রকাশিত রহিয়াছি। অসম্মূঢ় থাকিয়া যিনি আমাকেই পুরুষোত্তম জানিতেছেন, তিনি সর্ব্ববেত্তা হইয়া আমাকে সর্ব্বভাবসহকারেই হে ভারত, ভজনা করিতেছেন। হে অনঘ, এই গুহ্যতম শাস্ত্র মৎকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইল। ইহা বুঝিলে হে ভারত তিনি বুদ্ধিমান এবং কৃতকৃত্যও হইয়া থাকেন।

কৃতকৃত্যতা অবশ্য এই বোধের ভিতর, কিন্তু একে ত সেই বোধই গুহ্যতম, তারপর, সেই বোধ তিনি স্বয়ং না দিলেই বা দিতে পারে কে? স্বপ্রকাশ হইয়া তিনিই যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহারই সেই বোধ; এবং তিনিই ঋষি। এই স্বপ্রকাশ পরমধন স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে যে অপরূপ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত সদ্বাক্য শুনাইয়া থাকেন, তাহাই সাক্ষাৎ বেদ। এই মত এই সাক্ষাৎ বেদ ও বেদস্বামীর মর্ম্ম যিনি অবগত হন, তিনি যে তদানুষঙ্গিক নিজ জীবনের কৃতকৃত্যতা লাভ করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

যা'র যা'! কল্পনায় রাজা হওয়া যায় না। বক্তৃতায় জন্মান্ধ এই যে জগচ্চিত্র তাহাকে কদাচই দেখিতে পায় না। বিনা প্রসবে কোন নারী পুত্র মুখ দর্শন করিতে চাহে? খেলাঘরেই কি সংসার ভোগের একশেষ?

ঋষিমুখনিঃসৃত পুরুষোত্তমদর্শনের ঋক্‌টিই শুনাইতেছি। উচ্ছ্বাসপূর্ণ সেই ঋকটি এই :—

ঋতেণ ঋতুমপিহিতং ধ্রুবং
বাং সূর্য্যস্য যত্র বিমুচং ত্যশ্বান্‌।
দশশতা সহতস্থু স্তদেকং
দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যং।

(ঋগ্বেদ সংহিতা ৫ম, ৬২সূ, ১)

সূর্য্যাশ্বগণকে যথায় (তিনি) তোমাদের উভয়ের দিকে বিমুক্ত করিতেছেন, তথায় ছিল দশশত (অ) অনুকম্পার সঙ্গ বিদ্যমান। দেবগণের বপুসমূহের শ্রেষ্ঠ সেই একেকে দেখিয়াছে।

বপুষ্মান্‌ দেবতার চাক্ষুষ দর্শনের ইহাই চূড়ান্ত সাক্ষ্যদান। বিশ্বাস হবার হয় ত ইহাই যথেষ্ট। কোথাকার কথা কিন্তু ঐ? গীতা মুখবন্ধের উপক্রমেই ভগবান বলিতেছেন :—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ

অসতের উৎপত্তি নাই। সৎ উৎপত্তিরহিত নহেন। এই যে উভয় এই উভয়ের অন্ত, শেষাবয়ব, তত্ত্বদর্শিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়।

ঐ যে শ্রেষ্ঠ এক, উনিই এই শেষ অবয়ব। অন্ত ও অনন্ত শেষ ও অশেষ ঐ একে, মহেশে! ভাবাভাব সন্ধ্যার শাশ্বত অমৃতময় পুরুষ উনিই। আর "ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম" (ঋগ্বেদ, ১ম, ১৬৪, ৩৫) এই ব্রহ্মা যিনি বাক্যের পরম ব্যোম, ইনিই কি উনি ন'ন?

উনিই ইনি—বাক্যের পরম আশ্রয়; যেখানে সকল বাক্যের লয় ও উদয় যুগপৎ সঞ্চারিত হইতেছে। অতএব ঐ যিনি পুরুষোত্তম এবং যিনি ব্রহ্মা, এতদুভয়ে ভেদকল্পনা একেবারেই নিষিদ্ধ। গ্রন্থকার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদংতি" বলিয়া যে ঋক্‌, সেই ঋগনুসারে একই সতের ভিন্ন ভিন্ন নাম, কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের উল্লেখ করিয়া মনুষ্য বাক্যকে তুরীয় বলিতে তাহাকে নিম্নাসন না দিয়া যে উচ্চাসনে বসাইয়াছেন, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। তুরীয় পদের একমাত্র অর্থ চতুর্থ। ঊর্দ্ধাভিমুখে এই তুরীয় পদে "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে" বলিয়া বেদান্তসার যেমন ধরিয়াছেন ব্রহ্ম; নিম্নাভিমুখে এই তুরীয় পদই তেমনি নিম্নতম যে চতুর্থ, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে; তা' নহিলে তুরীয় বর্ণ বলিতে কেবল মাত্র শূদ্রকেই বা বুঝিতে হয় কেন? এই যেমন বর্ণে, তাই তেমনি বাক্যে। চতুষ্পদ বাক্যের নিম্নতম চতুর্থপদকেই তুরীয় পদ বলাই এস্থলে সঙ্গত। যথা ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত অর্থই যথার্থ। ঋক্‌টি ধরিলেই তাহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে, যথা——

"চত্বারি বাক্‌ পরিমিতা পদানি তানি বিদু র্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদংতি॥"

(ঋগ্বেদসংহিতা ১ম, ১৬৪। ৪৫)

বাক্, বাক্য, পরিমিতা। (ইহার) চারিটি পদ। যাহারা মনীষি ব্রাহ্মণ, (তাঁহারা) সেই সকল জানিতেছেন। তিনটী গুহানিহিতা ও ইঙ্গিতশূন্যা। তুরীয়ে, চতুর্থে, মনুষ্যেরা কথা কহে।

এখানে তুরীয় পদের ব্রহ্ম অর্থ অসংলগ্ন, সুতরাং এই পদের অপর এক অর্থ যে নিম্নতম চতুর্থ, তাহাই সঙ্গত। গুহানিহিত, গুহাতে স্থাপিত, গুপ্ত বা গূঢ় যে তিন পদ, তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে যদি এখনও কোন সন্দেহ থাকে, তবে এই নিম্নলিখিত ঋকেই তার নিরাকরণ হইয়া যাইবে।

"তিস্রোবাচ ঈরয়তি প্রবহ্নি
ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাং।
গাবো যংতি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ
সোমং যংতি মতয়ো বাবশানাঃ॥"

(ঋগ্বেদ সংহিতা ৯ম ৯৭।৩৪)

ঋত, সত্য, ব্রহ্মের যে ধীতি, পিপাসা, তাহা মনের ঈশা অর্থাৎ লাঙ্গল দণ্ড। প্রবহ্নি, শ্রেষ্ঠাগ্নি, তাহাতে বাক্ ত্রয়ীকে প্রেরণ করিতেছেন। গাভীগণ গোপতির দিকে যাইতেছে। শানিতমতি জিজ্ঞাসুগণ সোমের দিকে যাইতেছেন।

দ্বিজদাস বাবু জিজ্ঞাসু, অতএব অবশ্যই তিনি নমস্য। সারের সার কথা কিন্তু এই যে, প্রকৃত কর্ণবেধসহকারে নূতন কর্ণ নহিলে ঐমত সব ঋকের যে অপূর্ব্ব সত্য তত্ত্বমাধুর্য্য রহিয়াছে, তাহা আদৌ আমাদের ভোগে আসিবার নহে। প্রাকৃত বোধে অপ্রাকৃত বস্তুর আলোচনা করিতে গেলেই বিসদৃশ টীকাটিপ্পনীর উদয় অবশ্যম্ভাবী। ঋষিগণ বর্ণজ্ঞানরহিত ছিলেন ও লিখিতে জানিতেন না বলিয়া যে এই গ্রন্থের বহুল সমর্থন দেখিতে পাই, কিংবা পূর্ব্বে অপরাপর গ্রন্থে যে দেখিয়াছি যে, এক ঈশ্বরের ব্যক্তিভাব ঋষিগণের মধ্যে বড়ই অস্ফুটরকমের ছিল, তা' সমস্তইত ঐ মত টীকাটিপ্পনীর ফলে উঠিবেই উঠিবে। আর ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি আছে? আশ্চর্য্য কিন্তু এই যে, যা' প্রকৃত আশ্চর্য্য তাতেই কাহারো আশ্চর্য্য নাই। যিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি বলিতেছেন :—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং,
আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্য।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি,
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

যিনি আশ্চর্য্যবৎ দেখিতে বলিতে ও শুনিতে, এমন আশ্চর্য্য যে হাজার শুনিলেও টের পায় না কেহ, তিনি কেমন, এমন যিনি, তাঁর কথায় লোকে এখন না চমকায় কেন? কোন্ অধিকারে লোকে এখন হস্তামলকের দোহাই দেয়? জানি না—কিন্তু অধঃপতনের গোড়াইত এই।

স্বাধ্যায়ার্থী

স্বৰ্গীয় আশুতোষ

অনেক দিনের কথা, বোধ হয় ১৮৮২ কি ১৮৮৩ সালে হবে, কোন রাজকার্য্যের জন্ম আমাকে ৺রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিথি হ'তে হয়েছিল। সেদিন তাঁর বাড়ীতে কেউ ছিলেন না। আমাকে অনেক বেলা পর্য্যন্ত সেখানে থাকতে হল, কেননা কাজটি গুরুতর ছিল। বেলা অনেক হয়ে গেল দেখে রাধিকাবাবু বল্লেন, তাইত আপনাকে খাইয়ে না দিলে হয় না, আমার দাদার বাড়ীতে চলুন। সেখানে এসে একটী ছেলেকে ডেকে বল্লেন, এঁকে এখানে খাইয়ে দেবে। বলামাত্র ছেলেটি একটী আলমারীর drawer খুল্ল, একখানা সাদা কাপড় ও পরিস্কার তোয়ালে বের করে নিয়ে "আসুন" বলে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাধিকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেটী কে? বল্লেন আমার ভাইয়ের ছেলে, নাম আশুতোষ, ভাল পাশ করেছে। এই ছেলেটী universityতে first হয়েছিল, আমরা শুনেছিলাম। আমি দেখলাম বড় মানুষের ছেলে হয়েও কাপড় গামছা গুছিয়ে রাখে, অতিথি এলে কি রকম ভাবে সম্মান করতে হয় জানে, ইউনিভারসিটীর ছেলেদের মধ্যে এরূপ প্রায় পাওয়া যায় না। রাধিকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম একে বিলেত পাঠাবেন নাকি? তিনি বল্লেন—বিলেত পাঠাবার মত নাই; যদি হতে হয় এই দেশেই হবে। সেই হতে আশুতোষের প্রতি আমার আন্তরিক আকর্ষণ হল। ক্রমে আমরা দুই জনে Asiatic societyর member হই ১৮৮৫ সালের জানুয়ারীতে। সেই থেকে আমরা দুই জনে একত্রে অনেক সময় সাহিত্যিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

১৮৮৮ সালে আশুতোষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র, চারিদিকে তাঁর নাম হয়েছে; এমন ছেলে University থেকে আর বেরোয়নি, ইলবার্ট সাহেব তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ক্রমে তাঁর চেষ্টা হল—Universityতে ঢুকবার। কিন্তু প্রথমে হ'ল না, হ'ল আমার। তিনি ছাড়বার পাত্র নন, ইল্‌বার্ট সাহেব ইজিপ্টের Finance Commissioner হয়ে ছিলেন, সেখান থেকে পত্র আনতে আশু বাবু ১৮৮৯ সালে Fellow হন। তখন এসে আমাকে বলেন —আপনি কেন Fellow হয়েছেন, জানেন? I knocked and you entered আমি হই নি বলে আপনি হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এখন তুমি কি করবে? তিনি বল্লেন—university উদ্ধার করব। "কি করে?" "Universityর নাম কলকাতা University না রেখে ঢাকা University রাখা উচিত।" কারণ সে সময় পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ ও শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু Syndicateএর মেম্বর ছিলেন এবং P. K. Ray Registrar ছিলেন। কথা হল, পূর্ব্ববঙ্গ united,

---

গত ১লা আষাঢ় ১৩৩১ রবিবার স্যার আশুতোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ আহূত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা।

পশ্চিমবঙ্গ united নয়, তিনি বল্লেন, পশ্চিমবঙ্গকে united করতে হবে। সে বিষয়ে আমার সহায়তা চাইলেন। আমি বল্লাম এ হতে পারে না, এর মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নিজের জন্য সব করবে, পরের জন্য কিছুই করবে না। তার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি করে united করবে? তিনি বল্লেন, প্রথমেই আপনাকে syndicateএ ঢুকতে হবে। আমি বল্লাম আমি যাব না, আপনি যান। সে বৎসর আমরা তাঁকে syndicateএ ঢুকিয়ে দিই, তখন তাঁর পক্ষে অনেকের ভোট হওয়া চাই, ভোট সংগ্রহের ভার অনেকটা আমার উপর পড়ল। আশুবাবু নিজেও canvass করতে গেলেন। আমি নিজে যে কয়জনের ভোট সংগ্রহকরি তাঁদের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল দে, রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রভৃতি ১২ জন। এঁদের মধ্যে engineer একজন ছিলেন। আশু বাবু ঢুকলেন। প্রথম চেষ্টা হল western Bengalকে unite করার। প্রথম বৎসরে unity হল না। দুই তিন বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হল, সকলে আশুতোষের admirer হলেন। তখন পূর্ব্ববঙ্গ দেখলেন মুখে ঝগড়া করে কিছু হবে না, তাঁরাও মিলে গেলেন। এই সময় আশুবাবুর খুব একটা crisis আসল, আনন্দ মোহন বাবুর ছেলেকে Griffith সাহেব অপমানিত করেছিলেন। আশুবাবুকে সে অপমানের প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে হল। সে জন্য Griffith সাহেবকে Registarএর পদ ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গ মিশে গেল। তখন Education Departmentএর চক্ষু ফুটল। আশুতোষ অতি ভয়ঙ্কর লোক, কারুকে মানেন না, এঁকে Syndicateহতে তাড়াতে হবে। তখন Sir Alfred Croft ছিলেন Director of Public Instruction, তেমন মাথাওয়ালা লোক বাংলার আসেন নি। তিনি সমস্ত লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরদের unpaid minister ছিলেন। যাঁরা senateএর সভ্য ছিলেন তাঁদের Croft চিঠি লিখে পাঠালেন কাকে ভোট দিতে হবে, খবরের কাগজে তা নিয়ে হাঙ্গামা হল, আশুতোষ তার বিরুদ্ধে agitation করালেন, কিন্তু কিছু হল না। সে বার আশুতোষ syndic হতে পারেন নাই, তাঁর জীবনে সেই একবার elected হতে পারেন নি। তিনি দুঃখিত হলেন, তাঁর মুখের ভাব দেখে গুরুদাস বাবু Dais থেকে নেমে এসে বল্লেন দুঃখিত হবার কারণ নেই, এই রকম হয়ে থাকে কখনও ফল হয় কখনও হয় না। আমি তখন তাঁকে বল্লাম "Sir A Croft আসছে বছর চলে যাবেন, বুড়া বয়সে গুরুভার সহন করতে পারবেন না, তারপর Senateএর কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলবে। যা বল্লাম তাই হল, Croft সাহেব পর বৎসর দেশে চলে গেলেন। আশুতোষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেন, ইউনিভার্সিটীতে তিনি যা করেন, তাই হয়। সাহেবরা অত্যন্ত opposition করেও বড় কিছু করে উঠতে পারেন না। তার পর যখন দেখলেন কোন রকমে এর সঙ্গে এঁটে ওঠা যায় না, তখন ভাবলেন আইন বদলিয়ে দেওয়া যাক। সুতরাং একটা commission বসাতে হবে। তার পর Lord Curzon commission বসালেন, আশুতোষকে commissionএ নেওয়া হল না। কিন্তু কথা হল বাংলায় যখন commission আসবে, তখন তিনি member হবেন, বাংলার বাইরে হবেন না। সে ভাবে আশুতোষ বসলেন। তখন universityকে offiicalise করবার যে কিছু চেষ্টা সব হয়েছিল। একমাত্র গুরুদাস বাবু note of dissent

লিখেছিলেন, বাকী সমস্ত সভা officialise করবার পক্ষে ছিলেন, তাই হয়ে গেল। আশুতোষ দুঃখিত হলেন। কিন্তু এমনি কর্ম্মক্ষেত্র, এমনি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, নূতন আইন চালাবার ভার সম্পূর্ণরূপে আশুতোষের উপর পড়ল। ভিতরে কি হল জানিনা, কিন্তু যে Lord Curzon তাঁকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, আইন করলেন commission করলেন তাঁ হইতেই তিনি ইউনিভার্সিটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হলেন। তার পর Lord Mintoকে চিঠি লিখলেন, একেই vice chancellor কর। যতদিন Lord Minto ছিলেন, আশুতোষের vice chancellorএর পদ অব্যাহত ছিল। Lord Hardingeএর সময় তাকে সরাবার চেষ্টা হয়েছিল, দু তিন বৎসর কিছুই করে উঠতে পারেন নি, তার পর সরিয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাধিকারী, Sanderson সাহেব, ডাক্তার নীলরতন সরকার vice chancellor পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন, কাজে গোলমাল হতে লাগল, Lord Ronaldshay দেখলেন, গোলমালে কাজ হবে না, তিনি সমস্ত ভার আশুতোষের উপর ন্যস্ত করলেন, তখন থেকে গোলযোগ আরম্ভ হল, তিনি যে সকল প্রকাণ্ড ব্যাপার করেছিলেন, নিজে আট নয় বৎসর vice chancellorএর পদে থেকে যে Scheme তৈরী করেছিলেন তা চালাবার ভার তাঁর উপর পড়ল, কিন্তু টাকা নেই, গোড়া থেকে টাকা দাও, টাকা দাও। যে টাক দেবে তার সঙ্গে ঝগড়া হবেই, India Govtএর সঙ্গে ঝগড়া হল হল, India Govt হাল ছেড়ে দিলেন। সে ভার Bengal Govtএর হাতে পড়ল, Bengal Govt গোড়াতেই দেউলে, আশুতোষও টাকা ছাড়বেন না, সে ঝগড়া এসে পড়ল Lord Lyttonএর ঘাড়ে, তিনি কি করেন? পরস্পর গালমন্দ হয়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেল, আরেক জনকে vice chancellor করা হল। কিন্তু তাঁকেও আশুতোষের হাতে পড়তে হল, আশুতোষ ছাড়া কাজ করা যায় না, ও দিকে টাকা নাই, budgetএর কর্ত্তা বল্লেন টাকা কোথায় পাব? আশুতোষ বল্লেন Govt দিতে বাধ্য, দেবেন না কেন? এই করতে করতে তিনি স্বর্গারোহন করলেন। এখন universityর কি অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে না। আশুতোষ অশ্বত্থ গাছের মত ছিলেন। সে গাছের আওতায় আর আর যত গাছ ছিল সব শুকিয়ে গেছে। ৩॥ লাখ টাকার deficit budget, কি করে এ টাকা পূরণ হবে? অনেকের সঙ্গে কথা কয়েছি, সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছেন। আশুতোষের university career আমি যতদূর জানি, বল্লাম।

দ্বিতীয় কথা—তাঁর সঙ্গে আমাদের সাহিত্য পরিষদের সম্বন্ধ। সাহিত্য পরিষদ অনেক দিন থেকে আশুতোষকে এখানে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, তিনি কখনও আসেন নি, তাঁকে সহকারী সভাপতি করা হয়েছে, আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়েছি, এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলতেন, শাস্ত্রী মহাশয়, আমাকে কেন সহকারী সভাপতি করেছেন? আমার university ছেড়ে আসবার যো নেই, আপনি আছেন, আমাকে কি করতে হবে বলুন? আর আপনি অনুগ্রহ করে আমার একটা কাজ করবেন, আমাকে বাংলা বইএর একটা Library করে দেবেন। আমি সময় সময় বই পেলে বলতাম, লম্বা লিষ্ট করে দিতাম, বাংলার প্রতি গোড়া থেকে তাঁর অনুরক্তি ছিল সন্দেহ নাই। সে অনুরক্তির

পরিচয় তিনবার পেয়েছি। প্রথম ১৮৯১ সালে, তখন বঙ্কিমবাবু ছিলেন, চেষ্টা করলেন universityতে বাংলা ঢোকাতে হবে। ইংরেজী, সংস্কৃত আছে, বাংলা নেই কেন? তার জন্য উদ্যোগ হল, সভা হল। বাংলা পশ্চিম এমন element ছিলেন, যাঁরা দাঁত আর মুখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলেন। আমরা পারলাম না। তখন Sir Gurudas vice chancellor ছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন সব ছাপা নেই। আমি সমস্ত শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এমন দিন আসবে যে দিন সমস্ত পরীক্ষা entrance, I. A., B. A. বাংলায় দিতে পারা যাবে এই বলে বাংলাভাষার গুণ গান করলেন। সেবার entrance examinationএ বাংলায় প্রবন্ধ লেখবার অনুমতি হল। তার জন্য স্বতন্ত্র certificate দেওয়া হত। দ্বিতীয়বার আমি উপস্থিত ছিলাম না, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বেশী করে বাংলা প্রচলন করতে চেষ্টা করেন ১৮৯৬।৯৭ সালে। আশুতোষকে এ বিষয়ে বেশী উদ্যোগী করবার জন্য তিনিই resolution move করবেন এইরূপ স্থির হয়। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহন করেন, ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে Universityতে B. A. পর্য্যন্ত বাংলা উঠল। যখন নূতন আইন মতে University র কার্য্য আরম্ভ হল, তখন ঠিক হল history, mathemetics এ সব বাংলায় হবে। সাহিত্য পরিষদ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এখন M. A. পর্য্যন্ত বাংলা হয়েছে। দেখাদেখি ঢাকা Universityতেও বাংলা হয়েছে।

আশুতোষ সাহিত্য পরিষদের কার্য্যে সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দিতে পারেন নি, এ জন্য মনে করবেন না সাহিত্য পরিষদের উপর তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল, একে তিনি অবজ্ঞা করতেন; তা তিনি করতেন না। তিনি যখন মায়ের নামে medal দিয়েছিলেন, তখন সেই কমিটীতে সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি থাকবে এই ব্যবস্থা করেছিলেন, সুতরাং পরিষদকে তাঁর নিজের মনে করতেন। তিনি মাকে কি রকম ভক্তি করতেন, তা জগৎ-বিদিত। তাঁকে বিলেতে নেওয়ার চেষ্টা করবার সময় Lord Curzon বলেছিলেন—By my command you go to your mother and tell her that I command her to allow you go to England, আশুতোষ উত্তর দিয়েছিলেন—viceroyএর আমার মাকে হুকুম দিবার ক্ষমতা নেই।

সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। নিজের কন্যার নামে—যে কন্যার বিধবা বিবাহ নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল, ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল সে কন্যা যখন মারা যায় তখন তার নামে কমলা Reader-ship স্থাপিত হল। মায়ের নামের মেডেলের কমিটীতে যেমন সাহিত্য পারিষদের প্রতিনিধি নিয়েছিলে, প্রিয়তমা কন্যার নামের মেডেলের কমিটিতেও সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যে সাহিত্য পরিষদকে কত অন্তরের সহিত ভাল বাসতেন তা বলে শেষ করা যায় না।

যে উদ্দেশ্যে সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি সে উদ্দেশ্য চিরকাল মনে করে রেখেছিলেন। সুবিধা হলেই সাহায্য করতেন, অনেক সময় সাহিত্য পরিষদের কথা শুনে কাজ করতেন, সুতরাং সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, সে কেবল কর্ম্ম ক্ষেত্রের সম্বন্ধ তা নয়, হৃদয়ের সম্বন্ধ।

আর একটা কথা বলি। না বল্লেই ভাল হত, সেটা ব্যক্তিগত কথা। প্রচার ছিল আমার সঙ্গে তাঁর অহিনকুলতা ছিল। কিন্তু কথাটা পুরো সত্য নয়। প্রথমে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তার একটা লক্ষণ এই ছেলে পুলে তাঁরও হয়েছে, আমারও হয়েছে, আমার ছেলেদের নামের শেষে "তোষ", আর তাঁর ছেলেদের নামের শেষে "প্রসাদ"। একটা কি মনে করেন শুধু accident ? তা নয়। আমাদের পরস্পরের প্রতি অস্ফুট অব্যক্ত অথচ গভীর প্রীতি ছিল। তবু বলব তাঁর সঙ্গে অহিনকুলতা হয়েছে; এমন কোন কোন কাজ ছিল, তিনি বলেছেন, ভাল হবে, আমি বলেছি, ক্ষতি হবে। সুতরাং ঝগড়া এক আধটু হবেই। যদি একজন ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে যায় তাকে সরিয়ে দেবেনই, তা না করলে কাজ করা যায় না। তাই আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন সেই জন্য তাঁকে admire করি; তাঁর কাজের ভিতর ঢুকে যদি সর্ব্বদা তাঁকে oppose করতাম, তা'হলে তিনি অত কাজ করতে পারতেন না। তার পর আরেকটা কথা। তাঁর মৃত্যুর মাস খানেক আগে এসিয়াটীক সোসাইটী কমলা Lectureship কমিটীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবেন, Anandale সাহেব বল্লেন, কমিটীতে এসিয়াটীক সোসাইটীর পক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় থাকবেন। আশুতোষের supporters যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বল্লেন, "সে হবে না, হবে না। Sir Asutosh অত্যন্ত বিরক্ত হবেন," একথা শুনে আমাদের chairman sir রাজেন্দ্র বল্লেন, "এ সব কি কথা? ভার দিয়েছেন তোমরা করবে, আমরা যাঁকে মনোনীত করি তিনিই হবেন, আশুতোষ বিরক্ত হবেন সে কি কথা?" আমি যখন ঢাকা থেকে ফিরে এলাম, Secretary বল্লেন Sir Asutoshকে এই সমস্ত কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছেন no better selection could be made। সুতরাং কোথায় অহিনকুলতা। Political ক্ষেত্রে ঝগড়া করি, যে প্রবল হয় সে দুর্ব্বলকে সরিয়ে দেয়, তা না হলে কাজ হয় না। হৃদয়ের ভাব ছেলেদের নামে প্রকাশ, কমলা Lectureshipএর প্রতিনিধি নিয়োগে প্রকাশ।

আশুতোষের মৃত্যুতে বাংলাশুদ্ধ লোক যেমন দুঃখিত, আমি তার থেকে এক বিন্দু কম দুঃখিত হই নি। ২৬শে মে বাড়ীতে একটা কাজকর্ম্ম ছিল, করে যখন বেরিয়ে এলুম, একটি ছোকরা এসে বল্ল, সতীশ বাবুর কাছে telephone এসেছে, তিনি বল্লেন আশুতোষ মুখার্জ্জি dead। আমি অবাক হয়ে রইলাম, তেল মাখছিলাম, হাত মাথা থেকে উঠলনা, যেমন ছিল তেমনি রইল। আশুমুখার্জ্জি যেমনটী গিয়েছে তেমনটী আর হবে না, আস্তে আস্তে গঙ্গা স্নান করতে গেলাম। চোখের জল সকলের পড়ছে, আমারও পড়ছে।

আশুতোষ সম্বন্ধে নিজের personal experience বল্লাম, বক্তৃতা করবার ক্ষমতা নাই, plain facts বল্লাম, আর কিছু বলব না আমাকে মাপ করুন

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(৯)

'মৃণালিনীর' পাঁচ ও ছয় বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস—'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ও 'রাধারাণী' (১৮৭৫) প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি অনেকটা আধুনিক ছোট গল্পের অনুরূপ—উপন্যাসের বিস্তৃতি বা প্রগাঢ়তা ইহাদের নাই। বিশেষতঃ ইহাদের প্রধান আকর্ষণ ঘটনা-বৈচিত্র্যে, চরিত্র চিত্রণে নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন অনেক সময় অনেক অসাধারণ, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাব হয়, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অযাচিত অনুগ্রহলাভ হয়, এই উপন্যাস দুইখানিও সেইরূপ আশাতীত শুভাদৃষ্টের, বিস্ময়কর মিলের (coincidence) কাহিনী। 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' ঠিক একই জাতীয় উপন্যাস; প্রভেদের মধ্যে এই যে প্রথমখানি অতীত যুগের কাহিনী, ও দ্বিতীয়টা ঘটনাকালসম্বন্ধে সম্পূর্ণ আধুনিক। কিন্তু এই প্রভেদ কেবল নাম মাত্র; 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করিবার কোন কারণ নাই; কোনরূপ ঐতিহাসিকতার ক্ষীণ আভাস মাত্রও ইহাতে নাই। তবে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে অতীত যুগের শ্রেষ্ঠী বণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া বঙ্কিম তাহাদের প্রেম কাহিনীকে কতকটা স্বাভাবিকতা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ও আধুনিক যুগের সন্দেহপ্রবণতা ও অবিশ্বাস হইতে রক্ষা পাইতে চাহিয়াছেন। হিরণ্ময়ী-পুরন্দরের প্রেমে যা কিছু অসামাজিকতা বা অসাধারণত্ব আছে, তাহা সুদূর অতীতের আশ্রয় লাভ করিয়া অনেকটা আমাদের চক্ষু এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে।

'রাধারাণী'তে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রা পূর্ণভাবেই অনুভব করা যায়। 'রাধারাণীর' প্রেম সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের বলিয়া, ইহার স্বাভাবিকতা ও সুসঙ্গতি রক্ষা করিতে লেখককে অনেকখানি বেগ পাইতে হইয়াছে। রাধারাণীর সহিত রুক্মিণীকুমারের বোঝা-পড়া দীর্ঘ চারি অধ্যায় ধরিয়া চালাইতে হইয়াছে, এবং এই চারি অধ্যায়ের মধ্যে লেখক পদে পদে একটা অস্বাভাবিক বাধা অনুভব করিয়াছেন, ও নানাবিধ কৈফিয়তের দ্বারা তাহা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি বঙ্কিমের সহজ প্রতিভা এই সমস্ত বাধা বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হইয়াও তাহাদের উপর আংশিক বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছে। বঙ্কিমের ক্ষমতার প্রধান পরিচয় এই যে তিনি এই একটা ছেলেমানুষী গল্পের মধ্য দিয়াও—যেখানে গভীর চরিত্র চিত্রণের কোন অবসর নাই—সেখানেও একটা মধুর ও গভীর রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন, এবং বর্ণনীয় বিষয়ের সমস্ত অসঙ্গতি কাটাইয়াও যে সমাধানে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না। অতিক্রান্ত বাধা ও গভীর-রস-সঞ্চারের ক্ষমতার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'রাধারাণী' 'যুগলাঙ্গুরীয়' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সমূহের মধ্যে অন্যতম। ইহাতে আমাদের পারিবারিক জীবনের সহিত বৃহত্তর রাজনৈতিক জগতের একটী সুন্দর সম্মিলন সংশোধিত হইয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আদর্শ, তাহার দিকে চন্দ্রশেখরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইয়াছে। আবার ইতিহাসের বৃহত্তর ধারার সহিত আমাদের ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য জীবনের সংযোগ বেশ স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। যদি কখনও রাজনৈতিক

জগতের প্রবল প্রবাহ আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকে, ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা বিক্ষোভ সৃজন করিয়া থাকে, তবে তাহা অরাজকতা ও জাতীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের যুগগুলিতে। চন্দ্রশেখরে এইরূপ একটা যুগ-পরিবর্ত্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তখন বঙ্গে মুসলমান-রাজত্ব ধ্বংসোন্মুখ, ও ইংরেজ বণিকগণ অর্থোপার্জ্জনের মোহে মুগ্ধ হইয়া সাম্রাজ্য স্থাপন অপেক্ষা প্রজা শোষণের দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। এই আধুনিক যুগের ইতিহাস দুর্গেশনন্দিনী বা মৃণালিনীর ঐতিহাসিক অংশের মত একেবারে শূন্যগর্ভ ও কল্পনাসর্ব্বস্ব হয় নাই। ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রথম পত্তন এই সে দিনের কথা; বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের যুগের সহিত তাহার মাত্র শতবর্ষব্যবধান; খুব নিকট অতীতের ব্যাপার বলিয়া সে যুগের স্মৃতি বাঙ্গালীর মনে উজ্জ্বল হইয়াই জাগরূক ছিল, বিশেষতঃ ইংরেজ তাহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার মুখ্য ঘটনাগুলিকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে দেয় নাই। সুতরাং চন্দ্রশেখরের ঐতিহাসিক চিত্রগুলিতে তথ্যের অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবেশ হইয়াছে; সেই যুগের একটা মোটামুটি ব্যাপক ধারণা করিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। নবাগত ইংরেজ শাসকদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, দুঃসাহসিকতা ও সর্ব্বপ্রকার নৈতিক সঙ্কোচহীনতার চিত্রটী উপন্যাসে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ দেশবাসীদের সহিত তাহাদের সম্পর্কটী একটা অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত হইয়া এক বিচিত্র রোমান্সের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

'চন্দ্রশেখরের' রোমান্স প্রধানতঃ এই সর্ব্বব্যাপী অরাজকতা ও কেন্দ্র-শক্তির শিথিলতা হইতে উদ্ভূত। ইহা আমাদের বাঙ্গালী জীবনের উপর রোমান্সের বৈচিত্র্য আনয়নের বেশ বৈধ ও সঙ্গত উপায় বলিয়াই মনে হয়। অরাজকতা, প্রবল বৈদেশিক শক্তির অভিভব অনেক সময় আমাদের শান্ত, অন্তর্জগতের গভীর ঘাত-প্রতিঘাত-শূন্য, বাহিরের-সহিত সম্পর্কবর্জ্জিত, স্রোতোহীন পরিবারিক জীবনের উপর অতর্কিত দৈব বিপ্লবের মত আসিয়া পড়ে, এবং ইহাতে একটা অননুভূতপূর্ব্ব গতিবেগ ও বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। আমাদের অন্তঃপুরের ব্রীড়াসঙ্কুচিত ফুলটীকে বাহিরের প্রবল ও পঙ্কিল বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই জাতীয় রোমান্স প্রায়ই বিশেষ গাঢ় ও গভীর হয় না, এই বৈদেশিক শত্রুর অভিভবে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে যে বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে, তাহাতে অন্তর্বিপ্লবের কোন গূঢ় সৌন্দর্য্য থাকে না, কেবল একটা বাহ্য ঘটনাবৈচিত্র্য থাকে মাত্র; আর অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সংঘর্ষে, যেখানে একপক্ষ কেবল পাইবার লোভে আক্রমণ করিতেছে, ও অপর পক্ষ ব্যাকুল দুর্ব্বল ভাবে অপ্রতিবিধেয় শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, সেখানে আমাদের মনে বিচিত্র সৌন্দর্য্যবোধ অপেক্ষা করুণরসেরই সমধিক উদ্রেক হইয়া থাকে, সমবেদনার অশ্রুজলে রোমান্সের সৌন্দর্য্য কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক অনেক লেখকই এই শ্রেণীর জাতীয় কাহিনীকে তাঁহাদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই ইহার স্বাভাবিক করুণরসপ্রবণতাকে অতিক্রম করিয়া ইহার মধ্যে রোমান্সের বিচিত্র সৌন্দর্য্য সৃজন করিতে পারেন নাই; তাঁহারা কেহই বঙ্কিমের কল্পনা-সম্পদ, গূঢ় কলা-কৌশল, ও মানব মনের সহিত গভীর পরিচয়ের অধিকারী ছিলেন না।

বঙ্কিম তাঁহার সমসাময়িক লেখকদের অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ, 'চন্দ্রশেখরে'র সহিত ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাসের তুলনা করিলেই, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রথচক্রতলে নিস্পেষিত একটী ক্ষুদ্র, সুন্দর প্রজাপতি দেখিলে আমাদের মনে যে ভাব হয়, শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসখানিও অনেকটা সেইরূপ ভাবেরই উদ্রেক করে, পাঠকের মনকে একটী অবিমিশ্র কারুণ্য-রসে ভরিয়া তোলে। কিন্তু তাহার মধ্যে অন্য কোন উচ্চতর কলা-কৌশলের নিদর্শন পাই না। ফুলজানি-উপন্যাসের সরলা স্নেহময়ী নায়িকার উপর যে কেন একটা এরূপ নির্ম্মম বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার এক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ছাড়া অপর কোনরূপ ব্যাখ্যা আমরা খুঁজিয়া পাই না, তাহার নিজ চরিত্রে এরূপ ভীষণ পরিণামের কোন বীজ লুকাইয়াছিল বলিয়া লেখক আমাদিগকে দেখান নাই। প্রতিকূল-দৈব-পীড়িতা নায়িকা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর মত নিতান্ত অকারণেই আমাদের সম্মুখে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে।

বঙ্কিমের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি শৈবলিনীকে চক্রাপিষ্ট পতঙ্গের মত কেবল বাহ্য-শক্তিনিপীড়িত করিয়াই দেখান নাই। যে প্রলয় ঝটিকা তাহাকে তাহার শান্ত গৃহকোণ ও সুরক্ষিত সমাজ-জীবন হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে, তাহার প্রকৃত জন্ম তাহার নিজ অশান্ত হৃদয় তলে। লরেন্স ফষ্টরের সহিত তাহার সম্পর্ক অত্যাচারিত-অত্যাচারীর সম্পর্কের ন্যায় নহে। বিদ্যুৎ-শিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ শৈবলিনীর অন্তর্গূঢ় জ্বালাময়ী প্রবৃত্তি ফষ্টরের রূপমোহ ও দুঃসাহসিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাচক্রের যে পরিণতি হইয়াছে তাহাতে উভয়েরই দায়িত্ব আছে। যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহাতে উভয়েই ইন্ধন যোগাইয়াছে। শৈবলিনীর মনে গূঢ় পাপের অঙ্কুর না থাকিলে শুধু ফষ্টরের পাপ ইচ্ছা ও প্রবল আগ্রহ তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারিত না; আবার ফষ্টরের দুঃসাহসিকতার অপ্রত্যাশিত আশ্রয় না পাইলে শৈবলিনীর মনের গোপন পাপ অন্তরেই চাপা থাকিত, প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিত না। সুতরাং শৈবলিনীর কাহিনীটী সাধারণ অত্যাচারের কাহিনী অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন, ও ইহার মানসিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াগুলি অনেক অধিক সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আর বিশেষতঃ শৈবলিনী ও ফষ্টরের মধ্যে কে যে অত্যাচারী ও কে অত্যাচারিত তাহা বলা কঠিন; ফষ্টর বলপ্রয়োগ করিয়া শৈবলিনীকে লইয়া গেলেও শৈবলিনীর ইচ্ছাশক্তি ফষ্টরের উপর জয় লাভ করিয়াছে; সে এমন কি ফষ্টরকে নিজ গূঢ়তর অভিসন্ধির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতে চাহিয়াছে। এবং এক অপ্রত্যাশিত দিক্ হইতে বাধা না আসিলে শৈবলিনী তাহার দ্বারা নিজ মনোরথ-সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া লইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরও অনেক দিক দিয়া চন্দ্রশেখর, সাধারণ ঔপন্যাসিকের অত্যাচারকাহিনী হইতে বিভিন্ন। যেমন শৈবলিনীর বিপদ তাহার অন্তরস্থ দুর্ব্বলতার ফল, সেইরূপ তাহার পরিণতিও একটা গুরুতর অন্তর্বিপ্লব ও প্রায়শ্চিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত! অন্যান্য উপন্যাসে মৃত্যু যে সুলভ সমাধানের পথ দেখাইয়া দেয়, বঙ্কিমের প্রতিভা তাহা গ্রহণ করে নাই। শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া

তাহার মূল্য কত বলা সুকঠিন ; সাধারণ মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত হইবে কি না তাহাও বলা দুরূহ, এত বড় একটা যুগান্তরকারী, বিপ্লবপূর্ণ অনুভূতির জন্য শৈবলিনীর চিত্ত ক্ষেত্র ঠিক প্রস্তুত ছিল কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়ে ; হয়ত বঙ্কিম যেরূপ অচিন্তনীয় দ্রুত গতিতে অসাধারণ আবেষ্টনের মধ্যেও এই মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, তাহা মানব হৃদয়ের ধীর বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা অপেক্ষা যাদুবিদ্যারই অধিক অনুরূপ হইতে পারে ; কিন্তু সমস্ত দৃশ্যটীর মধ্যে যে অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধির ও আশ্চর্য্য কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির (poetic vision) পরিচয় পাই, তাহা গদ্যসাহিত্যে তুলনারহিত। তাহা মিল্‌টন ও দান্তের নরকবর্ণনার সহিতও প্রতিযোগিতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে। বঙ্কিম এখানে কবির বিশেষ অধিকার দাবী করিয়া, ঔপন্যাসিকের যে কর্ত্তব্য,—মন্থর পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ, অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য কারণের শৃঙ্খল-রচনা—তাহা হইতে নিজকে অব্যাহতি দিয়াছেন ; এবং প্রতিভার বিদ্যুৎ-শিখার সম্মুখে সমালোচকের চক্ষুও তাহার বিচার-বুদ্ধি পরিচালনা করিতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতির ত্রুটি ধরিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

'চন্দ্রশেখরের' রোমান্স প্রধানতঃ এই কারণ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চমকপ্রদ সংঘটনের অভাব নাই। ফষ্টরের নৌকা হইতে শৈবলিনীর উদ্ধার, ও শৈবলিনীর প্রত্যুপকার, গঙ্গা-বক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর স্মরণীয় সন্তরণ, মুসলমান কর্ত্তৃক আমিয়টের নৌকা আক্রমণ ও ইংরেজদের মৃত্যুভয়হীন বীরত্বের প্রকাশ—এই সমস্ত বিবরণের গল্প হিসাবে আকর্ষণী শক্তি বড় কম নহে। মোটের উপর বঙ্কিম এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনায় ও রাজনৈতিক জটিলতাজালের বিবৃতিতে বেশ দক্ষতাই দেখাইয়াছেন, কোথাও অর্ব্বাচীনের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই—যুদ্ধের প্রত্যক্ষজ্ঞানরহিত বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। অবশ্য এ বিষয়ে বঙ্কিম যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহা বলা যায় না ; বিশেষতঃ শৈবলিনীর দ্বারা প্রতাপের উদ্ধার-ব্যাপার যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, পাঠকের মনে সে বিশ্বাস নাও হইতে পারে। প্রতাপের দ্বারা শৈবলিনীর উদ্ধার, প্রথম ঘটনা বলিয়া এবং ইংরেজদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলিয়া বরং বিশ্বাসযোগ্য বটে, কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে একই চাতুরীর পুনরাবৃত্তি আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতায় একটু রূঢ় রকমেরই আঘাত দেয়। বিশেষতঃ ইংরেজ নৌকার পশ্চাদ্ধাবনের আসন্ন সম্ভাবনার মধ্যে প্রতাপ শৈবলিনীর গঙ্গা-বক্ষে স্বচ্ছন্দ-বিহার ও তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্যার সমাধান-চেষ্টা একটু অসাময়িক বলিয়াই বোধ হয়। আবার উপন্যাস মধ্যে রমানন্দ স্বামীর ন্যায় অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের অবতারণা এবং শৈবলিনীর সম্বন্ধে তাঁহার সদা-সতর্ক দৃষ্টি ও অভ্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের বিশ্বাসকে বিদ্রোহোন্মুখ করিয়া তোলে। কিন্তু এই বাস্তবতা-প্রিয় যুগের কঠোর পরীক্ষায় বঙ্কিম সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেও মোটের উপর তাঁহার ঘটনা-সমাবেশ-কৌশল খুব উচ্চ প্রশংসার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমের ঘটনা-সমাবেশ-কৌশলের চরম বিকাশ শৈবলিনী-কাহিনীর সহিত দলনী-উপাখ্যানের গ্রন্থনে। এই দুইটী করুণ, বিষাদময় কাহিনী একসূত্রে গাঁথিয়া বঙ্কিম যে কি আশ্চর্য্য গঠন কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, উপন্যাস খানির ভাবগৌরব ও সার্থকতা কতখানি

বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়মগ্ন হইতে হয়। যে রাজনৈতিক ঝটিকা দরিদ্র গৃহস্থ গৃহের পূর্ব্ব হইতে শিথিলিত-মূল লতাটীকে সহজেই উড়াইয়া আনিয়াছে, তাহা নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রেয়সী মহিষীকে সমস্ত সম্ভ্রম গৌরবের মাঝখান হইতে টানিয়া আনিয়া একেবারে সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরের শিরোদেশে উপস্থাপিত করিয়াছে। শৈবলিনীর ন্যায় দলনীও প্রথমে ভ্রান্তি দ্বারা বাহিরের সর্ব্বনাশকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, অসাবধান মক্ষিকার ন্যায় রাজনৈতিক উর্ণনাভ জালের সহস্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। দলনী-জীবনের ট্রাজেডি ও ইহার অপ্রতিবিধেয় নির্ম্মম শক্তি ক্রূর দৈবের নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই আমাদিগকে একটা গভীর ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। ইহা আমাদিগকে স্বতঃই মেটারলিঙ্কের "Luck" নামক প্রবন্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং ঐ প্রবন্ধে তিনি নিরীহ, নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ নিয়তির অত্যাচারের যে সমস্ত রোমাঞ্চকর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান স্থান লাভ করে। দলনী স্বামীর অমঙ্গল সম্ভাবনায় ভীত হইয়া একবার দুর্গের বাহিরে পা দিয়াই প্রতিকূল দৈবরূপ যে দুরন্ত দানবকে জাগাইয়া তুলিল, তাহার ক্ষমাহীন হিংসা তাহাকে মৃত্যুপর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছে। সে বিপদ্ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে যতই চেষ্টা করিয়াছে, ততই সাংঘাতিক ভাবে নিয়তির দুশ্ছেদ্য জালে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। যে কেহ তাহার আনুকূল্য করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে-ই তাহার হিতৈষণাদ্বারা তাহাকে সর্ব্বনাশের অতল পঙ্কে আরও গভীর ভাবেই ডুবাইয়া দিয়াছে। যে কাল নিশীথে গুরগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দলনীর দুর্গপ্রবেশপথ রুদ্ধ হইল, সেই রাত্রে সন্ন্যাসীবেশী চন্দ্রশেখর তাহার সহায়তা করিতে গিয়া তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে আর এক পদ অগ্রসরই করিয়া দিলেন। আশ্রয়ব্যপদেশে তাহাকে সমস্ত রাজধানীর মধ্যে এমন একটী বাটীতে লইয়া গেলেন, যেখানে সর্ব্বনাশ তাহার কৃষ্ণ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া গিয়াছে, যেখানে বিপদ নূতন জাল পাতিয়া তাহার প্রতীক্ষাতেই বসিয়া আছে। সেই রাত্রেরই শেষ ভাগে একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভ্রান্তির বশে দলনী অতল গহ্বরের দিকে আর এক ধাপ নীচে নামিয়া গেল, শৈবলিনীভ্রমে ইংরেজ তাহাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গেল, ও নবাবের আগতপ্রায় ক্ষমার সীমানার বাহিরে, আসন্ন উদ্ধারের স্পর্শ হইতে দূরে ফেলিয়া দিল। মহম্মদ তকির অনবধানতা, ও দলনীর বিরুদ্ধে তাহার মিথ্যা অভিযোগ সৃজন, দলনীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ফষ্টর কর্ত্তৃক তাহার পরিত্যাগ, কুলসমের সহিত বিচ্ছেদ, ব্রহ্মচারীর নিষেধসত্ত্বেও মুঙ্গেরযাত্রার কৃত সঙ্কল্পতা—ঘটনার প্রত্যেক পদক্ষেপই দলনীর গলদেশে নিয়তির যে রজ্জু ঝুলিতেছিল, তাহার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছে। শেষে নিয়তি যে বিষপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার ওষ্ঠে তুলিয়া দিল তাহাতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রসের অমৃত সঞ্চার করিয়া দলনী তাহা পান করিল, এবং অদৃষ্টের অবিচ্ছিন্ন পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

এই অসাধারণ অদৃষ্ট-মন্থনে এক দিকে যেমন বিপদের হলাহল ফেনাইয়া উঠিয়াছে, তেমনি আর এক দিকে অন্তরের আলোড়নে ভাবের অমৃত বিষকে ছাপাইয়া বাহিরে আসিয়াছে। বাহিরের বিপদ্ সংঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেও একটা গভীর আলোড়ন চলিয়াছে, এবং হৃদয়ের

গভীর বৃত্তি ও ভাবসমূহ আশ্চর্য্য সমৃদ্ধির সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ যে অধ্যায়ে (ষষ্ঠ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ) কুলসমের তিক্ত-তীব্র সত্য ভাষণে নবাবের দলনী বিষয়ে ভ্রান্তি নিরাস হইল, তাহাতে মীরকাসেমের অসহ্য মনোপীড়া ও নিষ্ফল অনুতাপ গৈরিক অগ্নি-স্রাবের ন্যায়ই আমাদিগকে দগ্ধ করে। অন্যান্য তীব্রভাবপূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে সুষুপ্তা শৈবলিনীর সম্মুখে বসিয়া চন্দ্রশেখরের খেদপূর্ণ চিন্তা, ইংরেজ হস্ত হইতে উদ্ধারের পর শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, শৈবলিনী ও প্রতাপের গঙ্গা-সন্তরণ, দলনীর বিষপান, প্রতাপের মৃত্যুকালে আজীবন-রুদ্ধ প্রেমের জ্বালাময় অভিব্যক্তি এবং সর্ব্বোপরি বিরাট কল্পনার দ্বারা মহিমান্বিত শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ আমাদের মনের মধ্যে সুগভীর রেখায় কাটিয়া বসে, ও বিচিত্র-ভাব-নিলয় এই মানব হৃদয় ও গূঢ় রহস্যাবৃত এই মানব জীবনের প্রতি একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। অবশ্য ভাষা ও উপযোগিতার দিক্ দিয়া এই সমস্ত দৃশ্যই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। দুই একটী দৃশ্যে রোমান্সের অতি গাঢ় বর্ণোচ্ছ্বাস, বাস্তব জীবনের ধূসর বর্ণের সহিত তুলনায় একটা অতি প্রবল অসঙ্গত বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আর ভাষার দিক্ দিয়াও, বিশেষতঃ কথোপকথনের সময়, একটা আলঙ্কারিক শব্দাড়ম্বর সময় সময় বাস্তবতার স্তরটীকে ঢাকিয়া ফেলে, পুষ্পাভরণপ্রাচুর্য্যে মৃত্তিকার রস ও গন্ধ অন্তরালে পড়িয়া যায়। বঙ্কিমের যুগে বাস্তব জীবনের ভাষা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ-লাভ করে নাই; করিলেও আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা ভাবের এত উচ্চগ্রামে বাঁধা চলিত কি না সন্দেহ। সে যাহাই হউক, মোটের উপর কতকগুলি দৃশ্য কতকটা ভাষা-গত অতিরঞ্জনের জন্য, আদর্শ সৌন্দর্য্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কথোপকথনের দিকে যাহা হউক, বর্ণনা ও ব্যঞ্জনায় এই ভাব-সমৃদ্ধ, অর্থগৌরবপূর্ণ ভাষা একটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিতা শৈবলিনীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা, প্রতারণাশীল প্রভাত-বায়ুর বিপদ-গর্ভ ক্রীড়াশীলতা, শৈবলিনীর পর্ব্বতারোহণের পর প্রকৃতির ভয়ানক বিপ্লব, ও মানুষের সুখে-দুঃখে তাহার নির্ম্মম উদাসীনতারবর্ণনা, এবং প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্যগুলি বঙ্কিমের ভাষার চরম গৌরব স্থল।

চরিত্রাঙ্কণের দিক্ দিয়া এক শৈবলিনীর চরিত্রেই অনেকটা জটিলতা আছে; তাহারই অন্তরের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত বঙ্কিম আপনার তীব্রদৃষ্টি চালাইয়াছেন। অন্যান্য সমস্ত চরিত্র গুলিই অপেক্ষাকৃত সরল; তাহারা সম্পূর্ণ বাস্তব ও জীবন্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে অধিক গভীরতা নাই, দুই একটি প্রাথমিক প্রবৃত্তি বা গুণেরই প্রাধান্য আছে। সুতরাং এক শৈবলিনী চরিত্রেরই একটু বিস্তৃত সমালোচনা প্রয়োজন, ও তাহার গ্রন্থিবহুল জীবনসূত্রকে টানিয়া সোজা করিবার চেষ্টা করা উচিত। বঙ্কিম অতি সুকৌশলে শৈবলিনীর অধঃপতনের ক্রমবিকাশটি চিত্রিত করিয়াছেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপ শৈবলিনীর মধ্যে যে ব্যর্থপ্রণয়জ্বালা নিবারণের জন্য ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ হয়, তাহাতেই শৈবলিনীর স্বার্থপরতা ও চরিত্র দৌর্ব্বল্যের প্রথম বীজ দেখা দেয়। প্রতাপ নিজ প্রতিজ্ঞানুযায়ী ডুবিয়াছিল, কিন্তু শৈবলিনী শেষ পর্য্যন্ত ঠিক থাকিতে পারিল না, প্রাণের মায়া তাহার প্রণয়াবেগকে হঠাইয়া দিল। এই অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার বীজটাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে ক্রম বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে এক গুরুতর পদস্খলনের দিকে লইয়া গিয়াছে। তাহার পরই চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ। বিবাহের আট বৎসর পরে ভীম পুষ্করিণীর জলমধ্যে এই অমঙ্গলের বীজে আবার বারি-সিঞ্চন হইল, অন্তরস্থ পাপ প্রবল ও সতেজ হইয়া উঠিল। শৈবলিনীর বিবাহিত জীবনের এই আটবৎসরের ইতিহাস আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাই না—তবে চন্দ্রশেখরের আক্ষেপোক্তিতে তাহার একটি সহানুভূতিপূর্ণ চিত্রের আভাস পাই; চন্দ্রশেখরের বিষয়-বিমুখ পাঠনিরত চিত্তবৃত্তিতে শৈবলিনী তাহার প্রণয়তৃষ্ণা নিবারণের বিশেষ সুযোগ পায় নাই। তারপর শৈবলিনীর মানস পাপ বাহিরে প্রকাশ পাইল—ফষ্টর ডাকাইতি করিয়া তাহাকে সমাজ-বন্ধ ও গার্হস্থ্য জীবন হইতে ছিনাইয়া

লইয়া গেল। এইখানে বঙ্কিম একটি অভিনব প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন—তিনি শৈবলিনীর গোপন অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই,তাহার পাপের কাহিনীটি ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরাল হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। যেমন বাস্তব জীবনে ধীরে ধীরে পাপের আবিষ্কার হয়, অনুমান, সন্দেহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আভাস শেষে নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়, শৈবলিনীর ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছে; বঙ্কিম এখানে বাস্তব জীবনের অনুগামী হইয়াছেন। সুন্দরীর সহিত বাড়ী ফিরিতে অস্বীকার করণে তাহার পাপের প্রথম সন্দেহ পাঠকের মনে উদিত হয়, পরে প্রতাপের নিকট শৈবলিনীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে আমাদের সন্দেহ দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হয়। কিন্তু শৈবলিনীর যুক্তিধারাটী ঠিক আমাদের মনে লাগে না—ফষ্টরের সহিত কুলত্যাগ করিয়া গেলে প্রতাপের প্রণয়লাভ যে কি প্রকারে সুলভ হইবে, তাহা দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। পুরন্দর পুরের কুঠির বাতায়নে জাল পাতিয়া প্রতাপ পক্ষীকে ধরার বিশেষ কি সুবিধা ছিল জানি না, কিন্তু এখানে শৈবলিনী প্রতাপের চরিত্র সম্বন্ধে যে একটা প্রকাণ্ড হিসাব-ভুল করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত; বোধ হয় সেই প্রণয় মুগ্ধা ভাবিয়া ছিল যে সামাজিকব্যবধানই তাহার প্রতাপলাভের পথে প্রধান অন্তরায়। প্রতাপের ইংরেজ-হস্তে বন্দী হইবার পরও এই ভ্রমের নেশা তাহাকে ছাড়ে নাই—সে নবাবের নিকট দরবার করিয়া রূপসীর বিরুদ্ধে প্রতাপ-লাভের ডিক্রী পাইবার অসম্ভব আশাও মনে মনে পোষণ করিতেছিল। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ডকে ধরিয়া ভাসিবার চেষ্টার মত শৈবলিনীর প্রতাপ লাভের এই অসম্ভব আশার মধ্যে একটা pathos—সকরুণ দিক্—আছে। প্রতাপের উদ্ধারের জন্য তাহার যে সমস্ত দুঃসাহসিক চেষ্টা,তাহারাও তাহার প্রণয়াকর্ষণের তীব্রতার পরিচয় দেয়। তার পর সব শেষ—দীর্ঘকালসঞ্চিত সুখস্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল, নিদারুণ বজ্রাঘাতে আশারচিত প্রণয়সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। এই পর্য্যন্ত শৈবলিনী-চরিত্রের বিশ্লেষণ চলে। তাহার পর সে মর্ত্ত্যলোকের অনেক ঊর্দ্ধে এক অভিনব অনুভূতির রাজ্যে বিশ্লেষণের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রচণ্ড অনুভূতির ফলে ও ক্ষণস্থায়ী উন্মত্ততার অন্তরালে শৈবলিনীর মনের রাজ্যে একটা যুগান্তর সংঘটিত হইয়া গেল—তাহার মর্ম্মস্থান হইতে প্রতাপের প্রতি অনুরাগের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইল, এবং শৈবলিনী প্রকৃত পক্ষে নবজীবন লাভ করিল। কিন্তু এই শেষের দিকের শৈবলিনী আর সমালোচকের বিশ্লেষণের বস্তু নহে, খুব উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার অনুভূতির বিষয়।

'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিম যে নূতন কৃতিত্ব ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গার্হস্থ্য জীবনের উপর রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব এখানে বেশ সুন্দর ভাবেই দেখান হইতেছে। বিচিত্র রোমাঞ্চকর ন্যায় একটী জটীল স্ত্রী চরিত্রের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপন্যাসের মধ্যে এক 'মৃণালিনী'তে মনোরমার চরিত্র অনেকটা জটীল ও রহস্যময় বটে, কিন্তু মনোরমা মুখ্যত কল্পনা-রাজ্যের জীব, শৈবলিনী একেবারে আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশিনী। সকলের শেষে বঙ্কিম রোমান্সের বর্ণোচ্ছ্বাস গাঢ়তর করিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত বিরলবর্ণ জগৎকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কবি আসিয়া ঔপন্যাসিকের হস্ত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন। চন্দ্রশেখরের কল্পনাশক্তি সমৃদ্ধি ও সুসঙ্গতি আমরা উপভোগ করি বটে, ইহার কলাসৌন্দর্য্য আমাদিগকে একবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়; কিন্তু উপন্যাসক্ষেত্রে কবিত্বের এই অনধিকারপ্রবেশে যে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ নিহিত আছে ইহাও অনুভব করি। 'চন্দ্রশেখর' 'আনন্দমঠের' বাস্তব-সম্পর্কহীন আদর্শবাদের ও 'দেবী-চৌধুরাণীর' অনুশীলন-তত্ত্ব-প্রিয়তার অগ্রদূত।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নারীর কর্ত্তব্য

এই যে দেশে এত সভা সমিতি, এত আলোচনা চলিতেছে, ইহাতে কোন কাজ হয় না কেন? একমাত্র নারী শিক্ষার অভাবই ইহার মূল। আমরা ভারতবর্ষের, তথা বঙ্গদেশের নারীগণ সর্ব্বপ্রকারেই পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এতদিন নারী জাতির যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না। এখন মাঝে মাঝে দুইচারি জন মহিলা কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছেন। কর্ম্ম পথে চলিতে বিদ্যা ও সৎসাহস রূপ পাথেয় দরকার। যে দেশে শতকরা প্রায় ৫ জন পুরুষ শিক্ষিত এবং নারীরা ২শতে ১জন মাত্র শিক্ষিত তথায় আর আশা ভরসা কোথায়? যে কয়টি মহিলার প্রাণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই অল্প বিস্তর লেখা পড়া জানেন। এই জন্য আমাদের সর্ব্ব প্রযত্নে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। প্রত্যেক মাতা ও অভিভাবিকাকে কন্যার সৎশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে হিন্দু মেয়েদের অত্যন্ত অনাদর। বোধ হয় পণপ্রথা ও পরমুখাপেক্ষিতাই তাহার প্রধান কারণ। মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে, তাহার জন্য যত টাকাই লাগুক, আর যত লাঞ্ছনাই হোক, এই যে মনোভাব ইহাতেই এদেশের মেয়েদের এত অবনতি। বিবাহের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহাই জীবনের চরম ও পরম কর্ত্তব্য নয়। যেমন ছেলেদের বেলায় অগ্রে শিক্ষা পরে প্রয়োজন অনুসারে বিবাহের ব্যবস্থা আছে, মেয়েদেরও ঠিক সেই ব্যবস্থা করা দরকার। যদি প্রত্যেক পিতা মাতা কন্যাকে সর্ব্ব প্রকারে সুশিক্ষিতা করিয়া ব্রাহ্মচর্য্যব্রতে ব্রতী করেন এবং যাহাতে তাহারা নির্ভীক, স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, এরূপ শিক্ষা দেন, তবে এদেশের অনেক সমস্যার সমাধান হয়। বিবাহে তাহাদিগকে বাধ্য না করিয়া যদি রুচি অনুসারে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা থাকিয়া নানা প্রকার মঙ্গল কর্ম্মের সুযোগ তাহাদের দেওয়া যায়, তবে তাহাদেরও মঙ্গল হয়। দেশও অনেক অগ্রসর হইয়া যায়। এখন মেয়ে অবিবাহিতা রাখার কল্পনাতেই হয়ত অনেকে শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই, মেয়ের জন্য পাত্র প্রয়োজন, ইহা মনে না করিয়া কন্যার পিতাগণ যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া কেহবা সুপাত্রে, কেহবা অসঙ্গতি হেতু অপাত্রে মেয়েদের বিবাহ দিতেছেন, অথচ তাহাদের অধিকাংশই যদি বিধবা হয়, তবে কেহ শিহরিয়াও উঠেন না, জাতি ও সমাজের ভয়ও থাকে না। এই কুসংস্কার দূর করিয়া সকলে একমত হইয়া কিছুদিন বিবাহ বন্ধ রাখিলেই অথবা বিলম্বে নিষ্পন্ন করিলেই মেয়েদের আদর বোধগম্য হয়। অনেক সংসারে পুত্রকন্যার লালন পালনে এমন পার্থক্য দেখা যায় যে প্রাণে বেদনা অনুভব না করিয়া থাকা যায় না। বাল্যকাল হইতে অবজ্ঞা অশ্রদ্ধায় পালিত হইতে হইতে মেয়েদের আত্ম সম্মান ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বোধ জন্মেনা। তাহারাও যে মানুষ, জগতের প্রত্যেক কল্যাণ কর্ম্মেই যে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও সুমহান কর্ত্তব্য আছে তাহা তাহারা চিন্তা করিতেই শেখেনা। নারী শক্তি বিশ্বশক্তির অর্দ্ধাংশ, এই এক অংশ যদি বিশ্বজনীন কর্ম্মে অনধিকারী হয়, তবে ঐ শক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহের ন্যায় অবশ হইয়া পড়ে। এত যে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কনফারেন্সের অধিবেশন সর্ব্বদাই হইতেছে, অথচ দেশ আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না, তাহার মূল কারণ কেহই চিন্তা করেন না। দেশের কাজ ত

বহু দূরের কথা,—যে দেশের নারীরা নিজে নিজকে রক্ষা করিতে অক্ষম, আজ দিকে দিকে নারীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইতেছে, যাহা স্মরণ করিলে নিজের জাতির দুর্দ্দশা ও অক্ষমতার জন্য প্রাণ গভীর লজ্জায় ও বেদনায় ভরিয়া যায়, তাহার প্রতীকারের উপায় আমরা নারীরা কি করিতেছি ? এই বিষয়ের সর্ব্বত্রই আলোচনা হইতেছে। পুরুষেরা কোথাও বা মাতৃমঙ্গলসমিতি স্থাপন করিয়া, কোথাও বা আর্য্য সমাজীরা লাঞ্ছিতাদের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া, ইহার প্রতিকারের উপায় করিতেছেন। ইহাতে কোন সুফল ফলিবে কি ? আমার মনে হয় মাতৃমঙ্গলসমিতি নির্য্যাতিতা নারীদের স্বপক্ষে মামলা মোকদ্দমা করিয়া কিম্বা পুরুষ জাতি বিনিদ্রনয়নে নারীজাতিকে অহোরাত্র পাহারা দিয়া ইহার কোনই প্রতীকার করিতে পারিবেন না। সেই সত্য যুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত জগতে পাশবিক ও আসুরিক শক্তির অপ্রতুল নাই, নারীর প্রতি অত্যাচারেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যখন অসুরের অত্যাচারে দেবগণ লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইয়া চণ্ডীর শরণাপন্ন হইলেন, তখন চণ্ডী আসিলেন। অসুরেরা তাঁহার প্রতিও অত্যাচারসমুদ্যত। তখন তিনি নিজের শক্তিতেই অসুর নিধন করিয়া স্বর্গ রাজ্য উদ্ধার করিলেন। আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার জন্য ভারতীয় রমণীদের বীরত্বের কাহিনী গল্প নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরাও শক্তির অংশ, আবার সেই চণ্ডীর আরাধনা করিয়া ঘরে ঘরে সর্ব্বমঙ্গল কল্যাণী শক্তিশালিনী নারী গঠন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েদের বাল্যকাল হইতে অন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বলবৃদ্ধি ও ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রয়োজন হইলে তাহারা যাহাতে নিজকে ও অপরকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ শিক্ষা তাদের দেওয়া উচিত। জগতে পাশবিক বল কি, তদ্দ্বারা নারীরা কিরূপে বিপন্ন হয় এবং কিরূপেই বা আত্মরক্ষা করা যায় এসব বিষয়ের জ্ঞান গোড়াতে যদি তাহারা না পায় তবে কিরূপে তাহারা শক্তি ও সাহসসম্পন্না হইবে ? এসব বিষয় পুরুষদের নিকট বলিয়া কোন ফল নাই, তাঁহাদের অধিকাংশই দাসমনোভাব দ্বারা চালিত। নিজেরাই আত্মরক্ষার অক্ষম এবং অস্ত্র ব্যবহারে অনধিকারী, তাঁহারা আবার তাঁহাদেরও অধীন নারীজাতিকে কি উপদেশ দিবেন ? অনেকেরই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ এত উচ্চ, যে "মেয়েদের কথা যেন কেহ শুনিতে পায় না, তাহাদের মুখ যেন কেহ দেখিতে পায় না" ইহাই তাঁহাদিগের আপনার মত। জগতে কোথায় কি হয় তাহা জানিতে পায় না, কোথাও যাইতে হইলে আগে পাছে রক্ষক বেষ্টিত করিয়া লইয়া যাইতে হয় এবং সে জন্যও পুরুষগণ তাহাদিগকে জীবন্ত লাগেজ ইত্যাদি বলিয়া সম্মানিত করেন। নিজেরা স্বাধীনতার স্বরূপ না জানিলে অন্যকেও তাহা দান করা যায় না। কেহ কেহ স্ত্রী স্বাধীনতার এমন বিকৃত অর্থ করেন যে শুনিলেও অশ্রদ্ধার উদয় হয়। কাজেই তাঁহাদের নিকট এসব আশা বৃথা। যদি বাস্তবিকই আমরা মেয়েরা জগৎসমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাই, নিজদের সম্মান ও জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাই, জগতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ও মঙ্গল কর্ম্মে যোগ দিবার আশা রাখি, তবে আর আমাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমানিচ এই নীতি বাক্যের অনুসরণ করিয়া নিজেদের কর্ম্মের পথ নিজেদেরই গঠন করিতে হইবে। আমাদের কন্যাভগিনীগণকে উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা পরিহার করিয়া কায়মনবাক্য প্রভৃতি সংযত করিয়া শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হইয়া যাহাতে অসুরনাশিনী শক্তির ন্যায় সর্ব্ববিধ অমঙ্গলকেও দানবীয় শক্তিকে পদ দলিত করিতে পারি, শুধু বাক্যে নয় কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা করা উচিত। আমাদের শুভ ইচ্ছায় ঈশ্বর সহায় হইবেন।

শ্রীশ্যামমোহিনী দেবী

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] আশ্বিন, ১৩৩১ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

আজকের এই সভায় আমি যে কিছু বল্‌বো এতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। আজ আমি এই কথা মনে করে এসেছি, অনতিকাল পরে আমি যে পাশ্চাত্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেছি, সে কাজে সকলের কাছ থেকে—তরুণ ছাত্রমণ্ডলীর কাছ থেকে—অনুমোদন ও অভিনন্দন লাভ করবো। এইরূপে শক্তিসঞ্চয় করে, পাথেয় নিয়ে ভারতের বাণী উদ্‌ঘাটন করবার কাজে আমি যাব! গিয়ে সেখানে বল্‌বো, আমি ভারতের তরুণমণ্ডলীর অভ্যর্থনা গ্রহণ করে এসেছি।

তবু জানি এখানে কিছু বল্‌তেই হবে—কিন্তু আমার মনে কিছুই সুস্পষ্ট নেই। মনে যা আপনি উপস্থিত হয় তাই তোমাদের শোনাব। যে দেশেই আমি গিয়েছি, সকল দেশেই আমাকে কিছু না কিছু বল্‌তে হয়েছে। এবং এটা আমার সৌভাগ্য যে সব জায়গায়ই অল্পবয়স্কেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা, শুনে প্রীতিলাভ করেছে। মনে পড়ে আমি যখন আমেরিকায় গিয়েছিলাম, তখন সেখানে স্বাজাত্যাভিমান সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করেছিলাম। সে মত তখন প্রিয় ছিল না, পশ্চিম তা' গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। ইউরোপে তখন মহা যুদ্ধ চলছিল—স্বাজাত্যাভিমানের যা ফল। কিন্তু তার শেষ ফল তখনো দেখা দেয়নি। এসম্বন্ধে অনেক বাদপ্রতিবাদ হচ্ছিল, অনেকে অনেক সংশয় প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু তরুণদের উৎসাহের কথা আমার মনে আছে। বোষ্টনে যখন আমি আমার বক্তৃতা পাঠ করেছিলাম, বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র দুটি ছাত্র কম্পিত কলেবরে আমার হাত দুটি চেপে ধরে বল্লেন, "আজকে যা শুনলুম তা আর কারো কাছে শুনিনি; আপনার কথা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে। আমাদের কর্ত্তব্য কি তা আপনার কাছে শুনতে চাই।" সর্ব্বত্রই এইরূপ হয়েচে—তরুণেরা কখনও বিরুদ্ধাচরণ করেনি। গতবারে যখন ইউরোপে গিয়েছিলাম তখন সেখানে বার্লিনে, ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ডেনমার্কে, সুইডেনে ছাত্রসমাজের কাছে আমার বল্‌বার সুযোগ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার যে চিত্তের যোগ হয়েছিল তাতে আমি একটা আনন্দের বার্ত্তা অনুভব করেছিলাম—ভেবেছিলাম এদের হৃদয় যদি আমি আকর্ষণ করতে পেরে থাকি, তাহলে আমার মধ্যে এখনো কিছু তারুণ্য রয়েচে, যদিচ আমার বয়স বড় কম নয়, নইলে সুরে সুর মিল্‌তো না। আমার মধ্যে কিছু নবীনতা আছে বলেই এ যোগ সম্ভব হয়েছিল। এমনতর ঘটনা মাঝে মাঝে হয়েচে।

আমি যখন অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্ক ছিলুম, তখন কলিকাতায় ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাদের সঙ্গে আমি খুব সহজে মিশ্‌তে পারতুম। আমি সে সময়ে যে সব কাব্য লিখছিলেম, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা হতো। তখনকার নবীনেরা অবশ্য এখন সবাই প্রবীণ। যাহোক্, মাঝখানে যে একটা বিচ্ছেদ ঘটেছিল তা বল্‌তে পারিনে। এক সময়ে মনে করেছিলাম এ দেশে জরার হাওয়া বইছে, বলিচিহ্ন দেখা দিয়েছে—বড় বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলাম, আমি যে সুরে যৌবনের জয়গান করতে চাই, সে সুর বাজ্‌চে না এদের অন্তরে। মৃতের গৌরবানুভূতি এদের চিত্ত অধিকার করে রেখেচে, এরা জীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমি ভাব্‌লুম, সবে দাঁড়াই, এদের কাছে আমার বাণী পৌঁছবে না। এই উপলক্ষে একটা কথা বল্‌তে চাই—যা নিশ্চল, বর্ত্তমান জীবনপ্রবাহের সঙ্গে যার যোগ নেই, তাকে অন্তরের ভিতরে সঞ্চিত করে রাখ্‌বার মধ্যে একটা ব্যর্থতা আছে। মাদ্রাজে ছাত্রেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—অল্পকালমধ্যে বাংলা দেশ থেকে এমন অনেক লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা তাঁদের প্রতিভার স্বকীয় মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনুকরণ বা অনুবর্ত্তিতা নেই—স্বপ্রকাশ যে জ্যোতি তাই তাঁরা দেখিয়েছেন। কেন মাদ্রাজে আমরা সেরকম দেখ্‌তে পাইনে? এর উত্তর খুব সহজ নয়। আমার মনে যা এসেছিল তাই আমি তাদের বল্‌লুম। আমি বল্লুম, 'তোমাদের অতীত অত্যন্ত সুপ্রত্যক্ষরূপে তোমাদের সমস্ত চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে বসে রয়েচে, তোমাদের কল্পনা আবৃত করে রেখেছে। প্রাচীনতার আড়াল ভেদ করে তোমরা বর্ত্তমানের স্বরূপ দেখ্‌তে পাচ্ছ না।' একজন শেঠী ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন একটা মন্দির নির্ম্মাণের জন্য—তার গঠন হবে দুইহাজার বছর আগেকার প্রাচীন মন্দিরের গঠনের অবিকল অনুরূপ। নতুন করে কিছু গড়বার বা কিছু ভাব্‌বার সাহস তাদের আর নেই। পুরাতনের ভ্রূকুটি দিগন্ত আবৃত করে রেখেছে—এত বড় শাসন ঠেলে বর্ত্তমানের জয়গান তাদের জীবন থেকে উচ্ছসিত হয়ে উঠ্‌তে পারে না। পুনরাবৃত্তির চক্রপথে আবর্ত্তন করে করে তাদের নবোৎসাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন কীর্ত্তিসকল এমন করে সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে থাক্‌তে পারে না। বাংলাদেশ পলিমাটীর দেশ—এখানে জীবনের ফসল প্রতিবৎসর নতুন হয়ে, শ্যামল হয়ে সফল হয়ে ওঠে। এখানে পুরাতন যা কিছু—কালের বিচারে জীবনে যার আর কোনই অধিকার নেই বলে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে—তা সমস্ত জায়গা জুড়ে থাক্‌তে পারে না। সে সবই মাটিতে নিমগ্ন হয়ে গিয়েছে, বসুন্ধরা তাদের তাঁর অন্ধকার ভাণ্ডারে সরিয়ে নিয়েছেন—বলেছেন, জীবনের পথ অবরুদ্ধ করতে দেব না। নবজীবনের জয়পতাকা নিয়ে যারা ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, পুরাতনকালের আশ্চর্য্যকীর্ত্তি বা জয়স্তম্ভ তাদের বাধা দিতে পারবে না—এমন কথা বাংলাদেশের মাটি বলেছে। বাংলার নদী ক্রমাগত সব ধুয়ে মুছে নিচ্ছে, জীবনের ভগ্নাবশেষ সব সম্মার্জ্জিত করে ভাসিয়ে সমুদ্রের গর্ভে নিয়ে ফেল্‌ছে। এম্নি করেই সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এখানকার আকাশ পুরাতনের অচলসঞ্চয়ে অবরুদ্ধ নয়। হয়তো এতে ক্ষতিও থাক্‌তে পারে, কিন্তু ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশী। বাংলাদেশে নতুন একটা ভাব গ্রহণ করবার সাহস ও শক্তি আছে এবং আমরা তা বুঝিও সহজে। কেননা অভ্যাসের

জড়তার বাধা আমরা পাই না। এটা আমাদের গর্ব্বের বিষয়। নতুন ভাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে বাধা থাক্‌লে ক্ষতি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা পাওয়া বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই জড় অভ্যাসের বাধা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম বলে আমি মনে করি। প্রাচীন ইতিহাসেও তাই। বাংলায় যত ধর্ম্মবিপ্লব হয়েছে তার মধ্যেও বাংলা নিজ মাহাত্ম্যের বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়েছে। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাংলার যা বিশেষ রূপ, গৌড়ীয় রূপ, তাই প্রকাশ করেছে। আর একটা খুব বিস্ময়কর জিনিষ এখানে দেখা যায়—হিন্দুস্থানী গান বাংলায় আমোল পায়নি। এটা আমাদের দৈন্য হতে পারে। অনেক ওস্তাদ আসেন বটে গোয়ালিয়র হতে, পশ্চিম দেশ, দক্ষিণ দেশ হতে, যাঁরা আমাদের গান বাদ্য শেখাতে পারেন, কিন্তু আমরা সে সব গ্রহণ করিনি। কেননা আমাদের জীবনের স্রোতের সঙ্গে তা মেলে না। আকবর সার সভায় তানসেন যে গান গাইতেন সাম্রাজ্যমদগর্ব্বিত সম্রাটের কাছে তা উপভোগের জিনিষ হতে পারে, কিন্তু আমাদের আপনার হতে পাবে না। তার মধ্যে যে কারুনৈপুণ্য ও আশ্চর্য্য শক্তিমত্তা আছে তাকে আমরা ত্যাগ করতে পারিনে, কিন্তু তাকে আমাদের সঙ্গে মিশ খাইয়ে নেওয়া কঠিন। অবশ্য নিজের দৈন্য নিয়ে বাংলাদেশ চুপ করে থাকেনি। বাংলা কি গান গায়নি? বাংলা এমন গান গাইলে যাকে আমরা বলি কীর্ত্তন। বাংলার সঙ্গীত সমস্ত প্রথা, সঙ্গীত সম্বন্ধীয় চিরাগত প্রথার নিগড় ছিন্ন করেছিল। দশকুশী, বিশকুশী, কত তালই বেরুল, হিন্দুস্থানী তালের সঙ্গে তার কোনই যোগ নেই। খোল একটা বেরুল, যার সঙ্গে পাখোয়াজের কোন মিল নাই। কিন্তু কেউ বল্লে না, এটা গ্রাম্য বা অসাধু। একেবারে মেতে গেল সব,—নেচে কুঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। কত বড় কথা। অন্য প্রদেশে তো এমন হয়নি। সেখানে হাজার বৎসর আগেকার পাথরে গাঁথা কীর্ত্তি সমূহ যেমন আকাশের আলোককে অবরুদ্ধ করে রেখেচে তেম্‌নি সঙ্গীত সম্বন্ধেও সজীব চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে। বাংলা দেশের সাহস আছে—সে মানেনি চিরাগত প্রথাকে। সে বলেছে 'আমার গান আমি গাইব।' সাহিত্যেও তাই। এখানে হয়তো অত্যুক্তি করবার একটা ইচ্ছা হতে পারে, কেননা আমি নিজে সাহিত্যিক বলে গর্ব্বানুভব করতে পারি। ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে আমাদের গীতিকাব্য যে একটা স্বাতন্ত্র্য ও সাহসিকতা দেখিয়েছে, অন্য দেশে তা নেই। হয়তো আমার অজ্ঞতাবশতঃ আমি ভুল করেও থাকতে পারি—কোন কোন হিন্দী-গান আমি শুনেছি যাতে আশ্চর্য্য গভীরতা ও কাব্যকলা আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের বৈষ্ণব কবিরা ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে খুব দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। প্রচলিত শব্দ ভেঙ্গে চুরে বা একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে, যাতে তাঁদের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, ভাবের স্রোত উদ্বেল হয়ে উঠে, তেমনি শব্দ তাঁরা তৈরী করেছেন। আমি তুলনা করে কিছু বল্‌বো না, কেননা আমি সকল প্রদেশের সাহিত্যের কথা জানিনে। কিন্তু গান সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশ আপনার গান আপনি গেয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যা সম্পদ আছে তা আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো, কিন্তু তুলনা দ্বারা মূল্যবানের যথার্থ মূল্য যাচাই করে নেব। সুতরাং হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা দেবার আমি পক্ষপাতী, কিন্তু একথা আমি বল্‌ব না যে

'যা হয়ে গেছে তা আর হবে না'। হয়তো সেটাই উৎকৃষ্ট মনে করে কিছুদিন তার অনুবর্ত্তিতা করতেও পারি, কিন্তু তা টিঁকবে না। তাকে নিজস্ব করে, জীবনের স্রোতের কলধ্বনির সঙ্গে সুর বেঁধে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, নইলে তা টিঁকবে না। আগেও হিন্দুস্থানী গানের চর্চ্চা হয়েছে বটে, কিন্তু তেমন করে নেয়নি। আমাদের দেশের সৌখীন ধনী লোকেরা হিন্দুস্থানী গায়কদের আহ্বান করে আনতেন, কিন্তু বাংলার হৃদয়ের অন্তঃপুরে সে গান প্রবেশ করেনি— যেমন বাউল আর কীর্ত্তন এদেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল। এইটেই বাংলার গৌরব। এই জন্যই মাঝখানে কিছুদিন আমি আঘাত পেয়েছিলাম, মনে করে ছিলাম, জরার কাছে নৈবেদ্য দেবার, যৌবনকে জরাসন্ধের কারাগারে নিবদ্ধ করবার একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। জরা তাদের বেঁধে মেরেছিল। যাহোক্, এখন আমার আশা হচ্ছে যে সময় এসেছে, সে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু আমি একথা খুব সাহস করে বল্‌তে পারিনে, কেননা তোমাদের সঙ্গে আমার তেমন যোগ নেই। তোমরা প্রবীণের আসনে বসে বলেছ 'এর কথা শোনার যোগ্য নয়'—আমিও তাই ভয়ে ভয়ে সরেছিলুম। এখনো সে ভয় একবারে ঘোচেনি। আমি মনে করি বাঙালীর পক্ষে এটা অস্বাভাবিক। এটা ঘটেছিল একটা reaction থেকে, একটা বিদ্রোহের দরুণ, যখন জল নির্ম্মল থাকৃতে পারে না। রাষ্ট্রীয় কারণে হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণে হোক্, এটা এসেছিল—বাংলার যুবকেরা বলেছিল, আমরা নতুনকে নেব না। কিন্তু আশা করছি সেটা কেটে গেছে। আর যদি কেটে গিয়ে না থাকে—আজ যখন আমি ঘাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, ভারতের বাইরে থেকে আমার নিমন্ত্রণ এসেছে, তখন তোমাদের অভিনন্দন ত সত্য হতে পাবে না। চীন জাপান থেকে আমাকে ডেকেছিল—কেন? এমন কথা তারা আমার কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিল—যা কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর জিনিষ নয়, ভারতের কাছ থেকে তারা এমন কিছু প্রত্যাশা করেছিল যা বিশ্বজনীন--কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, যে সম্পত্তি নিয়ে লড়াই বা মোকদ্দমা করতে হয় বা যা রক্ষা করতে ভোজপুরী দরোয়ান রাখ্‌তে হয়, লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখ্‌তে হয়। যে জিনিষে সমস্ত মানুষের সমান দাবী থাকে, সেটা এর চেয়ে ঢের বড় জিনিষ। যখন আমি চীনে যাই তখন আমার দেশের লোক অনেকে ক্রুর হাসি হেসে বলেছিলেন, ইনি 'বিশ্ব' নিয়ে আছেন? 'বিশ্ব' কথাটা উচ্চারণ করা আমার দায় হয়েছে। যদি বক্তৃতা করতে করতে দৈবাৎ 'বিশ্ব' কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তবে দেখ্‌তে পাই বার আনা লোকের মুখ হাস্যকুটিল হয়ে পড়েছে। মাসিক পত্রেও অনেক আলোচনা দেখ্‌তে পাই যদি আমি 'ভূমা,' 'বিশ্বমানব' বা Humanity এই কথাগুলো বলি। মহা মুস্কিল হয়েছে! 'Infinite' বল্লে তো কেউ হাসে না, 'ভূমা' বল্লে কেন হাসে? এখন যদি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আমাদের দেশে আস্‌তেন তাহলে তাঁর যে কি রকম অভ্যর্থনা হতো জানিনে। কিন্তু উপায় নেই—আজকেও হয়তো আমাকে সে সব কথা বল্‌তে হবে।

আজকে এই বিদায় আয়োজন কেন? আমি কি বিদেশে যাচ্ছি আমাদের আর্থিক দৈন্য, রাষ্ট্রীয় দৈন্য নিয়ে? আমাদের ক'খানা হাড় বেরিয়ে পড়িয়েছে, পিঠে কটা চাবুকের

দাগ আছে তাই দেখিয়ে তাদের দয়া ভিক্ষা করতে যাচ্ছি? ঘরের কথা, ঘরের কোঁদল নিয়ে আমি যাব? আর গেলে কি তারা খুসী হবে? এঁর মতো দীনতা আর নেই। কেন, এ ছাড়া কি আর কোন কথা নেই? এ সব কথা বল্লে কি কেউ আমাদের শ্রদ্ধা করবে? বাইরের দৈন্যের সময়ই অন্তরের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করবার সুযোগ সব চেয়ে বেশী। চীন জাপান যদি আমার কণ্ঠে ভারতের বাণী শুনে থাকে সে তো উপনিষদের কথা। বিশ্ব, ভূমা এসব কথা, শুন্‌লে তারা তো হাসে না! এই টুকুই আমার সম্বল, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বের যোগ—এটাকে যদি আপনারা অশ্রদ্ধেয় বা অনিষ্টজনক বলেন, তাহলে আমি বেকার, আমার জায়গা নেই কোথাও। আমি সেই যোগে বিশ্বাস করি। ভারতের সঙ্গে যেখানে বিশ্বের যোগ সেইখানেই ভারত শ্রেষ্ঠ, সেখানে তার কোন দৈন্য নেই। অনেকে বলেছেন, কি বল্‌বো আমরা, যতক্ষণ আমরা স্বাধীন না হই? আমি বলি, আমাদের এমন একটা মহিমা আছে যাতে আমরা সকলকে আহ্বান করতে পারি। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি কাজ করে দেখেছি সবাই আনন্দলাভ করেছেন, কোথাও আমি ব্যর্থ হইনি। এটা আমার গর্ব্ব নয়। সুইডেনে আমি গিয়েছিলেম, খুব সমাদর পেয়েছি সেখানে। সেখানকার লোকেরা আমাকে বলেছিল, 'আমাদের একটা আভিজাত্য গৌরব আছে। নরওয়ের লোকেরা Democratic, কিন্তু আমরা aristocratic। খুব খ্যাতিসম্পন্ন কোন বিদেশীয় লোককেও আমরা এমন সমাদর করিনি। এমন ভাবে সমাদর করাটা আমাদের প্রথা বলে মনে কোরো না।' আমি বল্‌লুম, 'কেন? আমায় সম্বন্ধে তোমরা কি জান? আমি বাংলা কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার দেশের লোকদের মতামত যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহ'লে, তোমাদের সঙ্গে মিলবে না। কি এমন কাজ করেছি, যাতে আমাকে এত সমাদর করছ?' তারা বলেছিল, 'আমরা অনুভব করেছি তুমি কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে তোমার চিত্তকে বদ্ধ করে রাখনি। আমি বল্‌লুম, 'সে তো আমি নিজের বুদ্ধি থেকে কিছু করিনি। আমাদের দেশের ঋষিরা, বুদ্ধদেব, সকলেরই এই এক শিক্ষা—সকলকে আপনার মত করে যে জানে সে-ই সত্যকে জানে।' এর মধ্যে বুঝে দেখ্‌বার কথা আছে—এটা শুধু sentiment নয়, এটা intellectual, বুদ্ধির কথা। মানুষের সত্যরূপ কোথায়? সেইখানে যেখানে মানুষ সকল জীবের সঙ্গে একান্ত ভাবে আন্তরিক ঐক্য স্থাপন করেছে, সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এই কথাটা এমন জোরের সঙ্গে অন্য দেশে খুব কম লোকেই বলতে পেরেছে। আমি অবশ্য সব দেশের আধ্যাত্মিক ইতিহাস জানিনে। কিন্তু এটা আমি জেনেছি যে পৃথিবীতে যেখানে যত দুঃখ আছে সব কিছুর মূলে এই সত্যের বিরোধ। এই সত্যের বিরোধ যেখানে ঘটেছে সেইখানেই বিপ্লব। মানুষের সম্বন্ধ যেখানে বিচ্ছিন্ন, বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সেইখানেই পীড়া। আজকের দিনে সব মানুষ ক্লিষ্ট হয়েছে—রব উঠেছে, শান্তি নেই, বসুন্ধরা পীড়িত হয়েছেন। এর একমাত্র কারণ মানুষ আপনার সত্যকে উপলব্ধি করলে না। তথ্য ঘট্‌লো বটে, মানুষ বাইরে থেকে একত্র হলো—কিন্তু সত্যকে পাওয়া গেলনা, কাজেই একত্র হওয়াটা বিষম হয়ে উঠ্‌ল। কে কাকে মারবে, কাড়বে, কে কাকে দাসত্বের বন্ধনে জর্জ্জরিত করবে—এইটেই সবার লক্ষ্য হলো।

সত্যকে যদি আমরা গ্রহণ করতে না পারি তাহলে বিধাতা নিশ্চয় আমাদের শাস্তি

দেবেন। সত্যের অপলাপ করলে মানুষের নিষ্কৃতি নেই—তাকে patriotismই বল, আর nationalismই বল! সত্যের বিরোধ হলেই রক্তপাত হবে, মানুষের রিপু জয়ী হবে। যেখানেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধের প্রতি বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, অবমাননা হবে, সেইখানেই দুর্গতির আর সীমা থাকবে না।

ভারতবর্ষের এই সমস্যা। যতক্ষণ আমরা ঐক্যলাভ না করবো ততক্ষণ অন্য পথ দিয়ে কোন চেষ্টাই সফল হবে না। এবং যদি না সত্য সম্বন্ধে আমরা এক হই, তবে প্রয়োজনের সম্বন্ধে যে ঐক্য তা কখনো টিকবে না। এই অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় এটা আমার কাছে আরো সুস্পষ্ট হয়েছে।

আমাদের মধ্যে জাতীয় আত্মীয়তায় সম্বন্ধ যে কত শিথিল তার প্রমাণস্বরূপ একটা একটা কথা বলব। এই কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের একজন মস্ত বীরপুরুষ লড়াই করে গেছেন—লর্ড কিচেনার। মনে করুন লর্ড কিচেনার যদি এদেশে জন্মাতেন আর আমাদের মধ্যে কেউ বলতো, 'ওহে জান, কিচেনার অমুক যুদ্ধে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন,' তাহলে অনেকেই তা বিশ্বাস করত। সমস্ত জীবন দিয়ে যে যুদ্ধ করেছে তার নামে অতি ক্ষুদ্র একটা অপবাদ দিলেও আমাদের দেশের পনর আনা লোক খুব খুসী হয়েই তা বিশ্বাস বিশ্বাস করত। ইংলণ্ডে কেউ এমন অপমানের কথা বললে পরে অন্য সবাই তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলত। কেন? এর কারণ ঐক্য ও পরস্পরের প্রতি প্রীতির উপলব্ধি। সে দেশে যাঁরা মাননীয়, দেশবাসীরা তাঁদের শুধু উপাধি দিয়ে নয়, অন্তরের প্রীতি দিয়ে বন্দনা করে—সেখানে কেউ এমনতর অপবাদ দিতে সাহস করবে না। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে কেউ কোন মহৎ সম্মান লাভ করলে তাকে অপমান করেই অনেকে সুখ পায়। এর কারণ কি? যে ঐক্য বোধ হলে সমস্ত জাতির সম্মানের আধার যাঁরা, তাঁদের কেউ আঘাত করলে অন্তর পীড়িত ক্ষুব্ধ হয় সেই ঐক্য আমাদের মধ্যে নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ পরস্পরকে টানে সেটা আমাদের দেশে সত্য নয়—কাজেই এমন কোন অপবাদ নেই যা আমরা বিশ্বাস করিনে।

সমস্ত মানুষের জীবনক্ষেত্র আমাদের ক্ষেত্র। ইংল্যাণ্ডের, ফ্রান্সের বড় বড় পণ্ডিতেরা কামাস্কাট্‌কার কি ভাষা, মুণ্ডারা কি ভাষায় কথা বলে তা জানবার জন্যে প্রাণপাত করছেন। মানুষকে জানবার তাঁদের কি আশ্চর্য্য কৌতূহল! জ্ঞানের দিক থেকে অন্ততঃ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন আশ্চর্য্য রকম সফলতা লাভ করেছে, কেননা এই সম্বন্ধটা সত্য। একদিন যখন প্রথম ব্যাবিলনিয়া, চীন, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছিল তখন হয়তো কেউ জানতেন না এদের মধ্যে মর্ম্মগত স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা যতই হচ্ছে ততই ধর্ম্মেকর্ম্মে গল্পে ব্যবহারে মানুষের পরস্পরের সঙ্গে নাড়ীর যোগ প্রকাশ হয়ে পড়চে।

এই সমস্ত জেনে আমাদের জ্ঞানের বন্ধন মুক্তি হলো! এইখানে ভূমা কথাটা বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু বললুম না। এতে আমরা জ্ঞানের যে অসীম ক্ষেত্র, একটা বিরাট ঐক্য-ক্ষেত্র আছে তার পরিচয় পেলুম। সেখানেই জ্ঞানের আসল ভিত্তি—সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নয়।

তুলনামূলক আলোচনা—ছন্দ ভাষা, জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম্ম কাহিনী ইত্যাদি সম্বন্ধে—এটা এই বৈজ্ঞানিক যুগের একটা কত বড় জিনিষ। আমরা বলছি—'ও আমরা নেব না, ও বিদেশী জ্ঞান, ওর সঙ্গে আমাদের চিত্তের ভাসুর ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক, আমাদের আর ওদের জ্ঞান বিজ্ঞান ঔষধ সব আলাদা।' কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলেছেন—'সত্য সেইখানে যেখানে মানুষ সবাইকে জেনেছে আত্মবৎ—আপনার মত।' যারা বলেছে 'আমরা এই তেত্রীশ কোটি ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি, আমরা সাধারণ মানুষ নই', তারাই নীচে পড়ে যাবে। আমরা যে আজ দরিদ্র, অপমানিত তার কারণ আমরা সত্যভ্রষ্ট হয়েছি। মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানগত কৌতূহল, ভাবগত মিলন বা কর্ম্মগত ঐক্য—কোনটাই আমাদের নেই। আমরা বলি, 'তোমার সত্য একরকম বিশেষ সত্য, আমার সত্য অন্য রকম বিশেষ সত্য—তোমার মুক্তি হবে তোমার সত্য নিয়ে, আমার মুক্তি আমার সত্য নিয়ে।'

আমাদের সমস্ত দুর্গতির মূলে রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ—আমাদের উগ্র সামাজিক অভ্যাসের ফল যে অদ্ভুত আত্মপরের ভেদবোধ। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বাইরে অন্য কোন কথা বলা যায় না। উপস্থিতের যে মূল্য নেই তা আমি বলি নে, কিন্তু তা চরম নয়! আমাদের চিত্তের দারিদ্র্য এতে দূর হবে না। যতক্ষণ সেই সত্য জ্ঞানে কর্ম্মে ভাবে আমরা উপলব্ধি করতে না পারবো, ততদিন আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। এই আমার বিশ্বাস, আর এই কথাটিই আমি আজকে বল্‌তে চেয়েছিলেম।

[স্পেন যাত্রার প্রাক্কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতা। শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত।]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতএব বর্ব্বর যুগের ইহাই হইল বিশিষ্ট প্রকৃতি। এ যুগে সভ্যতার সকল উপাদানই একত্র তাল পাকাইয়া আছে; সকল প্রকার শাসনতন্ত্রেরই অঙ্কুর অবস্থা; একটা বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও সংঘর্ষ, যাহার মধ্যে বিরোধেরও কোন স্থায়িত্ব নাই, বাঁধাবাঁধি নাই। এই যুগের সামাজিক অবস্থা সকল দিক দিয়াই আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারি যে কোথাও এমন একটি ব্যাপার, এমন একটি তত্ত্ব পাওয়া যায় না, যাহা সুপরিব্যাপ্ত বা সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি কেবল দুইটি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব—(১) ব্যক্তি-বর্গের অবস্থা, (২) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা। তাহাতেই সমগ্র সমাজের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই যুগে আমরা চারি শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই—(১) স্বাধীন শ্রেণী, অর্থাৎ যাহারা

কোন উপরওয়ালা মুরুব্বির মুখাপেক্ষী নহে, যাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত, অন্ত কোন ব্যক্তির সহিত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ না হইয়া আপন আপন সম্পত্তি ভোগ করিত, আপন আপন জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। (২) আশ্রিতবর্গ বা প্রজাবর্গ,—ইহারা প্রথমে দলপতি বা সর্দ্দারদিগের সহিত অনুচরসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল, পরে, ভূস্বামী বা ঐরূপ কোন প্রধান ব্যক্তির সহিত প্রজা বা ভৃত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, ভূমি বা অন্ত কোন সম্পত্তির পরিবর্ত্তে তাহারা প্রভুর প্রয়োজনে শক্তিসামর্থ্য নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। (৩) স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসবর্গ। (৪) ক্রীতদাসবর্গ।

কিন্তু এই যে শ্রেণীবিভাগ করা গেল, এ বিভাগ কি স্থায়ী ও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল? কোন ব্যক্তি কোন একটি শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে একবার আসিলে সেই গণ্ডীর মধ্যেই কি চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়া যাইত? এই বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে কি কোন শৃঙ্খলা বা স্থায়িত্ব ছিল? কিছুতেই নহে। প্রায়ই দেখিবেন স্বাধীন শ্রেণীর লোক স্ব স্ব সামাজিক পদমর্য্যাদা ও অধিকার পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ভূমি বা অন্ত কোন দান গ্রহণ করত: তাহার দাসত্ব অঙ্গীকার করিতেছে, ও এইরূপে আশ্রিতশ্রেণীর মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। কোথাও বা আবার আশ্রিত শ্রেণীর লোক তাহাদের আশ্রয়দাতার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া পুনরায় স্বাধীন শ্রেণীর মধ্যে পুনঃপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বত্রই দেখিবেন একটা সচলতা, শ্রেণী হইতে শ্রেণ্যন্তরে অবিরত যাতায়াত চলিতেছে; বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের কোন স্থিরতা নাই, কোন স্থায়িত্ব নাই, কোন লোক দীর্ঘকাল এক পদবীতে অবস্থান করিতেছে না, কোন পদবীর চিরকাল একমূল্য থাকিতেছে না।

ভূসম্পত্তির অবস্থাও ঐরূপ ছিল। আপনারা জানেন যে সেকালে দুই শ্রেণীর ভূসম্পত্তি ছিল—(১) সম্পূর্ণরূপে দায়শূন্য; (২) দায়বদ্ধ, অর্থাৎ যে ভূসম্পত্তির দরুণ কোন ঊর্দ্ধতন অধিকারীর সহিত একটা বাধ্যবাধকতা থাকে। আপনারা জানেন যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভূসম্পত্তির মধ্যেও একটা সুস্পষ্ট ক্রমনির্দ্দেশের চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই সকল দায়বদ্ধ ভূসম্পত্তি প্রথমে কয়েকটি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বৎসরের জন্য বিলি করা হইত, পরে প্রজার জীবনকাল পর্য্যন্ত, এবং সর্ব্বশেষে সেগুলি বংশগত হইয়া পড়িল। বৃথা এ চেষ্টা! ভূমিস্বত্বের এই সকল প্রকারভেদ বিশৃঙ্খল ভাবে একই সময়ে বর্ত্তমান ছিল; আমরা একই সময়ে নির্দ্দিষ্টকালব্যাপী স্বত্ব, জীবনস্বত্ব, বংশপরম্পরাগত স্বত্ব, সকল প্রকার স্বত্বেরই অস্তিত্ব দেখিতে পাইব। ব্যক্তিবর্গের অবস্থার মধ্যেও যে স্থায়িত্ব ও স্থিরতার অভাব, ভূস্বত্বের অবস্থাতেও তাহাই। সকল দিকেই একটা বহুআয়াসসাধ্য বিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যায়, গতিশীল যাযাবর জীবন যাত্রার পরিবর্ত্তে স্থায়ী সুস্থির জীবন প্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে, মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে, মানবসম্বন্ধ ও সম্পত্তিগত সম্বন্ধ জড়াইয়া এক জটিল বৈষয়িক সম্বন্ধের উদ্ভব হইতেছে। এই সন্ধিক্ষণে সমস্তই বিশৃঙ্খল, সমস্তই অনির্দ্দিষ্ট, সমস্তই খণ্ডিত।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও সেই এক অস্থিরতা, সেই এক গণ্ডগোল। তিন প্রকার শাসনপদ্ধতি একই কালে বর্ত্তমান ছিল—একদিকে রাজতন্ত্র, অপর দিকে অভিজাততন্ত্র;

অর্থাৎ ভূসম্পত্তি ও মানুষের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষী সম্বন্ধ; এবং অন্য আর একদিকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের মন্ত্রণাসভা। কোন পদ্ধতিরই সমাজে একান্ত অধিকার ছিল না; কোনটিই অন্যগুলির উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই। স্বাধীন জনতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানাদি ছিল, কিন্তু জনসম্মিলনীতে যে সব ব্যক্তির যোগ দেওয়া উচিত তাঁহারা প্রায়ই উপস্থিত হইতেন না। এমন কি রাজতন্ত্র, যাহা অপেক্ষা সরল ও সহজনির্দ্দিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠান আর হইতেই পারে না, সেই রাজতন্ত্রেরও তখন কোন স্থায়ী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি ছিল না, তাহা কতকপরিমাণে নির্ব্বাচনমূলক, কতকপরিমাণে বংশপরম্পরাগত ছিল। কখনও পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হইতেছেন, কখনও বা পরিবার মধ্যে যিনি যোগ্যতম তিনিই রাজপদের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেছেন; কখনও বা আবার দূরবর্ত্তী কোন জ্ঞাতি বা কুটুম্ব, এমন কি সম্পূর্ণ বাহিরের লোকও নির্ব্বাচিত হইতেছেন। কোনও পদ্ধতিরই কোন প্রকার স্থিরতা নাই, সকল প্রতিষ্ঠান, সকল প্রকার সমাজব্যবস্থাই পাশাপাশি রহিয়াছে, পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতেছে এবং নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

রাষ্ট্রগঠনেও সেই পরিবর্ত্তনশীলতা, সেই উত্থান পতনের লীলা; এক একটি রাষ্ট্র মাথা তুলিতেছে, আবার তলাইয়া যাইতেছে, কখনও বা দুইটি মিশিয়া এক হইতেছে, কখনও বা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমানির্দ্দেশ নাই, নির্দ্দিষ্ট শাসনতন্ত্র নাই, নির্দ্দিষ্ট প্রজাসংঘও নাই, আছে কেবল নানা অবস্থা, নানা নীতি, নানা গোষ্ঠী, নানা জাতি, নানা ভাষার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই হইল বর্ব্বর ইউরোপের প্রকৃত স্বরূপ।

এই অদ্ভুতযুগের আরম্ভই বা কবে, শেষই বা কবে? ইহার জন্মকাল সম্বন্ধে কোন গোল নাই; রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আরম্ভ। কিন্তু এ যুগ শেষ হইল কবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে এই বর্ব্বর যুগের সমাজের যে অবস্থা নির্দ্দেশ করা হইল কি কি কারণে সেই অবস্থার উদ্ভব।

আমার মনে হয় ইহার দুইটি প্রধান কারণ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি বাস্তব কারণ, বাহ্য ঘটনার প্রতিঘাত হইতে তাহার উৎপত্তি, অপরটি নৈতিক, মানুষের অন্তর হইতেই তাহার উদ্ভব।

বাস্তব কারণটি হইতেছে বর্ব্বর আক্রমণের দীর্ঘকালব্যাপ্তি। পঞ্চমশতাব্দীতেই বর্ব্বর আক্রমণ শেষ হইয়া গেল, একথা মনে করা চলিবে না; এ মনে করিলে চলিবে না যে রোমীয় রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ধ্বংসস্তূপের উপর বিভিন্ন বর্ব্বর রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এবং যাহা কিছু গোলযোগ সঙ্গে সঙ্গে চুকিয়া গেল। রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর বহুকাল পর্য্যন্ত এ ব্যাপার চলিয়াছিল; ইহার প্রমাণাবলী সুস্পষ্ট।

প্রথমেই ফ্রাঙ্ক্ রাজগণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদিগকে কেবলই রাইন নদীর অপরপারে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চালাইতে হইয়াছিল; ক্লোটেয়ার ও ডাগোবের বারবার জার্ম্মানীতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, রাইন নদীর পূর্ব্বতীরে টুরিঞ্জীয় (Thuringian), ডিনেমার, স্যাক্সন প্রভৃতি যে সকল জাতির বাস ছিল তাহাদের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া-

ছিলেন। কেন করিয়াছিলেন? কারণ এই যে এই সকল জাতি রাইন নদী পার হইয়া পশ্চিমতীরে রোমসাম্রাজ্যের লুণ্ঠনে ভাগ বসাইতে চাহিয়াছিল। অপরদিকে ঐ সময়েই গল্-অধিবাসী ফ্র্যাঙ্কগণ যে বারবার ইটালী আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারই বা অর্থ কি? তাঁহারা সুইজারলাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, আল্পগিরিমালা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ইটালিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কি কারণে? কারণ এই যে উত্তরপূর্ব্বদিক হইতে নূতন নূতন জাতি তাহাদিগকে ঠেল দিতেছিল। তাঁহাদের যুদ্ধাভিযানের কারণ কেবল মাত্র লুণ্ঠনলোলুপতা নহে, প্রয়োজনের তাড়নাই তাহার কারণ। প্রথমাধিকৃত প্রদেশে তাহারা শান্তিতে বাস করিতে পাইল না বলিয়াই তাহারা অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যাত্রা করিল। এদিকে আবার একটি নূতন জার্ম্মান জাতির আবির্ভাব হইল, তাহারা ইটালীতে লম্বার্ড-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। গল প্রদেশে ফ্রাঙ্করাজবংশের পরিবর্ত্তন হইল, মেরোভিঙ্গীয়দের পরিবর্ত্তে কার্লোভিঙ্গীয় বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। এখন ইহা ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে যে বাস্তবিকপক্ষে এই রাজ-বংশ-পরিবর্ত্তনের অর্থ গলে নূতন করিয়া একটি ফ্রাঙ্ক-আক্রমণ; এই আক্রমণের ফলে গলে প্রাচ্য ফ্রাঙ্কের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্যফ্রাঙ্কজাতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পরিবর্ত্তনব্যাপার সমাপ্ত হইয়া গেল; কার্লোভিঙ্গীয় বংশই রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। পরে শার্লমেনের আবির্ভাব। মেরোভিঙ্গীয়েরা যেরূপ টুরিঙ্গীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, শার্লমেনও সেইরূপ সাক্সন দিগের বিরুদ্ধে, রাইন্‌নদীর পূর্ব্বতীরস্থ সমস্ত জার্ম্মান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন এই সকল জার্ম্মান্ জাতির পশ্চাৎ কে তাড়া দিতেছে? এখন তাড়া দিতেছে ওবোট্রাইট্, বিল্‌ৎস্ (Wilzes), সোরাব (Sorabes), বোহীমিয় প্রভৃতি শ্লাব জাতি। সমগ্র শ্লাব্ জাতি ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত জার্ম্মান জাতিগুলির উপর চাপ দিতে লাগিল ও তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিল। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সর্ব্বত্রই এই আক্রমণ ব্যাপার চলিতে লাগিল ও ইতিহাসের ঘটনাস্রোতঃ নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

দক্ষিণেও এইরূপ একটি ব্যাপার দেখা দিল—এই ব্যাপার, মুসলমান আরবের আবির্ভাব। জার্ম্মান্ ও শ্লাব্‌গণ যখন রাইন্ ও ডানিউব নদীর তীর অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, আরবরা তখন ভূমধ্য সাগরের সমগ্র উপকূলভাগে তাহাদের বিজয়যাত্রা আরম্ভ করিল।

আরব-আক্রমণের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহার মধ্যে দেশ-জিগিষা ও ধর্ম্মপ্রচারেচ্ছা এই উভয় ভাব সম্মিলিত ছিল। এ আক্রমণের উদ্দেশ্য এককালে দেশ জয় করা এবং ধর্ম্মপ্রচার করা। জার্ম্মান আক্রমণ ও আরব আক্রমণের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ। খৃষ্টীয় জগতে ঐহিক ও পারত্রিক শাসন তন্ত্রের শক্তিকেন্দ্র বিভিন্ন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যাঁহারা পারত্রিক শাসনতন্ত্রের পরিচালক, ধর্ম্মপ্রচারেচ্ছা যাঁহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহাদের সহিত দেশজিগীষু ঐহিকতন্ত্রপরিচালকদিগের কোন সম্বন্ধ ছিল না। একই লোকের পক্ষে এই উভয় প্রকৃতির উদ্যম অভিলাষ পোষণ করা সম্ভব ছিল না। জার্ম্মানরা যখন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, তখন তাহারা তাহাদের পূর্ব্বতন রীতিনীতি, ভাব আদর্শ রুচি সমস্তই বজায় রাখিল; পূর্ব্বের ন্যায় তখনও তাহাদের জীবন পার্থিব বাসনা, পার্থিব আসক্তি দ্বারাই চালিত হইতে থাকিল। তাহারা খৃষ্টপন্থী হইল বটে, কিন্তু মিশনরী হইল না। অপর

দিকে আরবেরা এককালে বিজেতা ও ধর্ম্ম প্রচারক। তাহারা একই হস্তে শস্ত্র ও শাস্ত্র ধারণ করিয়া আসিল। পরবর্ত্তী কালে এই শস্ত্র শক্তি ও শাস্ত্র-শক্তির সম্মিলনে মুসলমান সভ্যতার পরিণতি শুভকর হয় নাই। মুসলমান সভ্যতার মধ্যে যে একটা জবরদস্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে এই ঐহিক-পারত্রিক শক্তির একত্র সম্মিলন, বাহ্য শাসনতন্ত্র ও নৈতিক শাসনতন্ত্রের বিমিশ্রণ। আমার মনে হয় এই কারণেই মুসলমান সভ্যতা এখন সর্ব্বত্রই স্থাবর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় এ স্থাবরত্বের কোন লক্ষণই দেখা দেয় নাই। বরং উভয় শক্তির এই সম্মিলনের দরুণই আরব-আক্রমণের বেগ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নৈতিক উদ্যম ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সহায়তা পাইয়া আরবদিগ্বিজয় অতি অল্পকাল মধ্যেই যে বিরাট মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল, জার্ম্মান আক্রমণের মধ্যে সে বিরাটত্ব, সে মহিমা ছিল না। আরব জাতির যে উৎসাহ উদ্যম, মানব মনের উপর যে প্রভাব, জার্ম্মানদিগের সে পরিমাণে উৎসাহ উদ্যম প্রভাব মোটেই ছিল না।

পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের এই অবস্থা। দক্ষিণ হইতে আরবদিগের আক্রমণ, উত্তর হইতে জার্ম্মান ও স্লাব জাতিসমূহের, এই উভয় আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ইউরোপের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে নিয়ত বিপর্য্যস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া থাকিবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। লোকসংঘ, জাতিসমূহ কেবলই স্থানচ্যুত হইতেছে, একে অপরের স্কন্ধে গিয়া পড়িতেছে; কোন কিছুই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না; চারিদিকে পুনরায় একটা যাযাবর চঞ্চল জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে এ বিষয়ে কিছু কিছু বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের অন্য অন্য অংশ অপেক্ষা জার্ম্মানীতে এই বিশৃঙ্খলা কিছু অধিক ছিল, জার্ম্মানীই হইল এই চলাচলের মূলকেন্দ্র; আবার ইটালী অপেক্ষা ফ্রান্সের অবস্থা অধিক পরিমাণে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু কোন স্থানেই সমাজ স্থিরতা লাভ করিতে পারে নাই, শৃঙ্খলা-স্থাপন করিতে পারে নাই—চারিদিকে বর্ব্বরতারই বিস্তার হইতে লাগিল।

এই ত গেল ইউরোপের তাৎকালীন অবস্থার কারণ, ঘটনাপরম্পরার আঘাতসম্ভূত কারণ। এখন আমি আধ্যাত্মিক কারণটির আলোচনা করিব; মানবমনের আভ্যন্তরিক অবস্থা হইতে এই কারণের উদ্ভব, বাহ্য কারণ অপেক্ষা ইহার প্রভাব কিছু কম নহে।

বাস্তবিক পক্ষে বাহ্য ঘটনা যাহাই হউক না কেন, মানুষ নিজেই নিজের জগৎ সৃষ্টি করে। মানুষের ধারণা, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি অনুসারেই জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়, উন্নতিশীল হয়, মানুষের অন্তর প্রকৃতি অনুসারেই সমাজের বাহ্য প্রতিকৃতি গঠিত হয়।

একটা স্থায়ী সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে মানুষের কি চাই? অবশ্যই প্রথমে আবশ্যক যে সেই সমাজের উপযোগী, তাহার বিচিত্র সম্বন্ধের আলোচনায় প্রযোজ্য, কতকগুলি ধারণা ও সিদ্ধান্ত মানুষের মনে থাকিবে। এবং ইহাও আবশ্যক যে এই সকল ধারণা দুই এক জনের মনে আবদ্ধ না থাকিয়া সমাজভুক্ত অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রসারিত থাকিবে; এবং সর্ব্বশেষে আবশ্যক যে এই ধারণাগুলি কেবল বুদ্ধির কোঠায় আবদ্ধ থাকিবে না, মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর, কর্ম্ম চেষ্টার উপর প্রভাবশালী হইবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে মানুষ যদি নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে কোন

বিষয়ের ধারণা করিতে অসমর্থ হয়; তাহাদের নিজ নিজ জীবনের গণ্ডীর মধ্যেই যদি তাহাদের চিন্তারাজ্যের সীমা বদ্ধ হয়, সকলেই যদি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও কামনার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসে; যদি সকলের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ ধারণা বা অনুভূতি না থাকে যাহা লইয়া তাহারা একত্র হইতে পারে, তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে এরূপ লোক লইয়া কোন সমাজগঠন হইতেই পারে না, কারণ এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজ মধ্যে এক একটি বিক্ষোভের বীজ, প্রলয়ের বীজ লইয়া প্রবেশ করিবে।

যেখানেই লোক সাধারণের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য, যেখানেই মানুষ নিজের চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করে না, নিজের প্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বের বশ্যতা স্বীকার করে না, সেখানেই সাধারণের পক্ষে সামাজিকতা বা একতা প্রবল অসম্ভব। আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি সে যুগের ইউরোপের সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা কিন্তু ঠিক এইরূপ। আমি আমার পূর্ব্ব আখ্যানে বলিয়া আসিয়াছি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব, মানব ব্যক্তিত্বের ধারণা ইউরোপ জার্ম্মানদিগের নিকটই প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অতিমাত্র বর্ব্বর ও অজ্ঞান অবস্থায় এই তত্ত্বটি সামাজিকতাবিহীন পশুধর্ম্মী স্বার্থপরতার রূপ ধারণ করে। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত জার্ম্মানদিগের মধ্যে এই ব্যক্তিতত্ত্বের এই পর্য্যন্তই অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তাহারা কেবল নিজের স্বার্থ, নিজের প্রবৃত্তি, নিজের কামনাই গ্রাহ্য করিত, কেমন করিয়া তাহারা উন্নত সমাজবন্ধন দূরে থাক, কোন প্রকার নিয়ম সংযমের মধ্যে নিজকে আবদ্ধ করিবে? সমাজব্যবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, তাহারা নিজেরাই অনেকবার প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু প্রবেশমাত্রেই তাহারা হয় কোন অসতর্ক ব্যবহারের দরুণ, না হয় কোন উদ্দামবাসনার উন্মাদনায়, না হয় বা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় পুনরায় সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে। সমাজ বারবার গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে; বারবার মানুষের কার্য্যের ফলে, আধ্যাত্মিক উপাদানের অভাবে গঠনশীল সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। ইউরোপের বর্ব্বর অবস্থার এইটিই প্রধান কারণ। যতদিন পর্য্যন্ত এই দুই কারণ বর্ত্তমান ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ইউরোপের এই বর্ব্বর অবস্থা ছিল। এখন দেখা যাউক কখন ও কিরূপে এই অবস্থার অন্ত হইল।

ইউরোপ এই অবস্থা অতিক্রম করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া ছিল। মানুষ নিজের দোষেই এইরূপ দশাপ্রাপ্ত হইতে পারে সন্দেহ নাই, তথাপি সে অধিককাল এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে চাহেনা—ইহাই মানুষের স্বভাব। সে যতই অশিষ্ট, অজ্ঞান, স্বার্থনিরত স্বকামপরায়ণ হউক না, তাহার অন্তরের মধ্যেই এমন একটা সহজ প্রেরণাও সংস্কার আছে যাহার বলে সে জানিতে পারে ইহাতে তাহার জীবনের সাফল্য নাই, তাহার অন্তবিধ শক্তি আছে, তাহার নিয়তিও অন্যবিধ। অশান্তির মধ্যে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাহার অন্তর হইতে শৃঙ্খলার জন্য, উন্নতির জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উঠিতে থাকে, তাহাকে স্থির হইতে দেয় না। পাশবিকতা ও স্বার্থপরতার মধ্য হইতেই ন্যায়ের জন্য, দূরদর্শিতার জন্য, বিকাশ ও পুষ্টির জন্য তাহার একটা উদ্বেগ উপস্থিত হয়। বাহ্য জগৎ, সামাজিক জগৎ, অন্তর্জগৎ সর্ব্বত্রই সে সংস্কার ও উন্নতিসাধনের প্রেরণা অনুভব করে; এবং কোন্ অভাববোধের প্রেরণায় সে

প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা না জানিয়াও সে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদিও এই সকল বর্ব্বরজাতি সভ্যতা লাভ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অযোগ্য ছিল, যদিও সভ্যতার মূলনীতিসূত্রের সহিত পরিচিত হওয়া মাত্রই ইহার প্রতি তাহাদের একটা বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল, তথাপি ইহা সত্য যে ইহারা প্রাণে প্রাণে এই সভ্যতার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়াছিল।

উপরন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে রোম সাম্রাজ্যের বিরাট শাসনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ তখনও অনেক পরিমাণে রহিয়া গিয়াছিল। মানুষের চিত্তপটে, বিশেষতঃ পৌর পরিষদের সদস্য, বিশপ, যাজক প্রভৃতি রোমীয় জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট লোক শ্রেণীর চিত্তপটে সাম্রাজ্যের নাম, সেই বিশাল মহামহিমান্বিত সমাজের স্মৃতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছিল।

বর্ব্বর দিগের মধ্যেই এমন অনেকে ছিল যাহারা রোমসাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারা সাম্রাজ্যের সেনাভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, আবার পরে সেই সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে। রোমীয় সভ্যতার নামরূপের মহিমায় তাহাদের চিত্ত অভিভূত এবং অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে এই সভ্যতার অনুকরণ, পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের জন্য তাহারা আকাঙ্খা অনুভব করিতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ণিত বর্ব্বর অবস্থা অতিক্রম করিবার পক্ষে এ কারণটিও তাহাদিগকে প্রেরণা দান করিয়াছিল।

এই দুই কারণ ব্যতীত একটি তৃতীয় কারণের কথা সকলেরই মনে হইবে; সেটি খৃষ্টীয় চর্চ বা যাজক সঙ্ঘ। খৃষ্টীয় চর্চ ছিল একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থিত সমাজতন্ত্র; ইহার নির্দ্দিষ্ট নীতিপদ্ধতি ছিল, বিধিবিধান ছিল, নিয়ম শাসন ছিল, আর ছিল স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য বিজেতৃবৃন্দের পরাজয় সাধনের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্খা। এই যুগের খৃষ্টানদিগের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা নৈতিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়েই চিন্তা করিয়াছেন, সকল বিষয়েই যাঁহাদের সুদৃঢ় ধারণা ও মতামত ছিল, প্রবল মনোভাব ও আকাঙ্খা ছিল; এবং সেই সকল মতামত, সেই সকল ভাব প্রচার করিবার জন্য, বাস্তব রাজ্যে মুখ্য ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, শক্তিশালী করিবার জন্য সজীব আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল। পঞ্চম ও দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টীয় চর্চ যেমন চতুর্দ্দিকের সমাজে প্রভাববিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সমস্ত জগতের উপর নিজের বিশিষ্ট ছাপ মারিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে এরূপ কোন সমাজ বা সম্প্রদায় কোন কালেই করে নাই। এই চর্চ্চের ইতিহাস যখন বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে তখন চর্চ যে কি কি কাজ করিয়াছে তাহা সমস্তই দেখিতে পাইব। বর্ব্বরতাকে স্বীয় শাসনের অধীনে আনিয়া তাহাকে সভ্য করিয়া তুলিবে এই উদ্দেশ্যে বর্ব্বরতাকে সে সকল দিক দিয়া আক্রমণ করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে সভ্যতাবিকাশের এক চতুর্থ কারণ উল্লেখ করিব। এ কারণটির যথাযোগ্যরূপে মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব কিন্তু তাই বলিয়া ইহার যথার্থ্য, ইহার কার্য্যকারিতা কিছু কম নহে। এ কারণটি হইতেছে মহাপুরুষের আবির্ভাব। বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের কেন আবির্ভাব হয় এবং জগতের উন্নতিসাধনকল্পে তিনি ঠিক কি সহায়তা করিয়া যান তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেটা বিধাতার এক রহস্য। কিন্তু মহাপুরুষ যে যুগে যুগে আসেন এবং জগতের উন্নতিও যে সাধন করেন সে সম্বন্ধে কোন

অনিশ্চয়তা নাই। এমন সব মানুষ আছেন যাঁহাদের নিকট অরাজকতা ও সামাজিক অবনতির দৃশ্য অতীব পীড়াদায়ক, যাঁহাদের সমগ্র চিত্তবৃত্তি ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাঁহাদের চক্ষে এটা একটা বিসদৃশ বীভৎস ব্যাপার রূপে প্রতীয়মান হয়; এবং এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন জন্য, তাহাদের সম্মুখস্থ জগতের মধ্যে একটা নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁহাকে একটা সার্ব্বজনীন, সুনিয়ত স্থায়ী প্রকৃতি দান করিবার জন্য তাঁহাদের অন্তরে একটা অদম্য আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে। এইরূপে এক ভীষণ শক্তির উদ্ভব হয়, এ শক্তি অনেক সময় স্বেচ্ছাতন্ত্র হইতে পারে, সহস্র পাপ, সহস্র পদস্খলনে ইহার গতিপথ কলঙ্কিত হইতে পারে, কারণ এ শক্তি ত মানবশক্তি, মানবচরিত্রসুলভ দৌর্ব্বল্যের অতীত ইহা নহে; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে এ একটা মহাশক্তি, এ শক্তির একটা গৌরব আছে, একটা কল্যাণ কারিতা আছে, কারণ এ মানবজাতিকে মানব উদ্যমের দ্বারাই উন্নতির পথে, ভবিষ্যতের দিকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দেয়। *   (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

মাধ্বদর্শন

ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান দর্শন—অদ্বৈত ও বৈষ্ণব দর্শন। ভারতে এই উভয় দর্শনের খ্যাতি বরাবরই আছে।

অদ্বৈতদর্শনের মর্ম্ম 'তত্ত্বমসি' এবং 'ব্রহ্মনির্গুণ' এই দুই বাক্যে স্পষ্টীকৃত। অদ্বৈতদর্শন-মতে, কেবল ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা; জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক, ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; প্রভেদ-ভাব অবিদ্যা হইতেই হয়, জীব অবিদ্যামুক্ত হইলে, আপনার প্রকৃত স্বভাব জানিতে পারে এবং মুক্ত হয়। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, জগতের মিথ্যাত্ব, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, অবিদ্যার অনাদিত্ব এবং জগৎ-সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অদ্বৈতদর্শন দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে।

বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব এবং ব্রহ্ম পরস্পর হইতে বিভিন্ন, ব্রহ্ম এক প্রাকৃতিক নহেন, বহুত্ব ব্রহ্মেরই ভিতর নিহিত,—জড়জগতের উপাদান এবং বহু জীব, ব্রহ্মেরই অংশরূপে ব্রহ্মেরই মধ্যে নিহিত; ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, তিনি গুণপূর্ণ; সৃষ্টি (বা জগৎ) সত্য, কিন্তু নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; মায়া অচিন্তনীয় বা অপরিজ্ঞেয় নহে, মায়া ঈশ্বরেরই ইচ্ছা; ব্রহ্ম সত্য, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহাও সত্য; জগৎ ব্রহ্মেরই ইচ্ছার ফল, সুতরাং জগৎ সত্য।

অদ্বৈত ও বৈষ্ণব-দর্শন উভয়ই বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই বেদান্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তের যথার্থ তাৎ-

* শ্রীযুক্ত বিমলকুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

পর্য্য কি এখন তাহাই জিজ্ঞাস্য। উপনিষদে এমন অনেক মন্ত্র আছে, যাহা দ্বারা অদ্বৈত বাদ সমর্থন করা যাইতে পারে, আবার এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহা দ্বারা বৈষ্ণবমতও সমর্থন করা যায়। ব্রহ্মসূত্র বা ব্যাস সূত্রের ভিত্তি এই সকল উপনিষদ্-মন্ত্রের উপর। ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা ব্যাস উপনিষদ্-মন্ত্র সকলের তাৎপর্য্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই সেই অনুসারে সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সূত্রগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝিতে পারিলে, বাদরায়ণ শ্রুতিমন্ত্রসকলের তাৎপর্য্য কি বুঝিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র শ্রুতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই মতের বিরুদ্ধবাদী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাদরায়ণের সূত্রগুলি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে। ভাষ্যকারগণের ভাষ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সূত্রের অর্থ করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকারগণের মধ্যে এক শ্রেণীর ভাষ্যকারেরা অদ্বৈত মতাবলম্বী, এবং আর এক শ্রেণীর ভাষ্যকারেরা বৈষ্ণব দার্শনিক। সুতরাং শ্রুতির যে যথার্থ কি মত তাহা সাধারণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

মাধ্বগণ বলেন, শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে একটী প্রকৃষ্ট উপায় আছে। অষ্টাদশ পুরাণ ও ভগবদগীতায় শ্রুতির বড় সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ ও ভগবদ্গীতা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করে কি বৈষ্ণব দার্শনিকদিগের মত সমর্থন করে তাহা বিবেচ্য।

মানুষের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য কি তাহারই অনুসন্ধানের দিকে দর্শন-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। ধরিয়া লওয়া হয় মানুষের অবস্থা দুঃখজনক, অথবা মানুষের অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল। দুঃখ এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনের অবস্থা যাহাতে অতিক্রম করা যায় সেইদিকে সকল চেষ্টা নিয়োজিত করা চাই। দুঃখও আত্মার অভিপ্রেত নয়, পরিবর্ত্তনও নয় অথচ আত্মাকে দুঃখ ও পরিবর্ত্তনের অধীন হইতে হয়। আত্মা দুঃখ এবং পরিবর্ত্তন চায় না এই সকল হইতে মুক্ত হইতে চায়। কিন্তু দুঃখ এবং পরিবর্ত্তন হইতে কি করিয়া মুক্ত হওয়া যায়? দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইতে হইলে, দুঃখ ও পরিবর্ত্তনের কারণ কি, এবং ইহারা কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী তাহা জানিতে হয়।

আমাদের সম্মুখে যে জগৎ তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, আমরা যখন যে অবস্থার অধীন হই, তাহাও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আত্মার কোন সময় কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পরিবর্ত্তন একদিকে যেমন সুখোৎপাদক আর একদিকে তেমনই দুঃখোৎপাদক পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইতে পারিলে সুখদুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায়। একশ্রেণীর দার্শনিকদিগের মত সুখদুঃখের হাত এড়ানই কাজ। কিন্তু আবার বলিতে পারা যায়, দুঃখ মানুষের প্রিয় নয়, সকল মানুষই সুখান্বেষী; যে পরিবর্ত্তন সুখপ্রদ সেই পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইবার প্রয়োজন কি? অনেক দার্শনিকের মত এই যে, যাহাতে সুখ হয় তাহার চেষ্টায় কোন দোষ নাই, তাহা মঙ্গল-প্রদ। তাঁহাদের মত এই যে, দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুঃখকে পরাস্ত করিয়া, সুখ আনয়ন করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, পরিবর্ত্তন-জনিত সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সে স্থলে সেই সুখকে আলিঙ্গন করিলে,

দুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সুখকে আলিঙ্গন করা হয়। যাহার সহিত দুঃখের মোটেই সম্বন্ধ নাই, এমন যদি কোন সুখ থাকে, সেই সুখকে আলিঙ্গন করাই কাজ। আমরা জীবনে যত সুখের পরিচয় পাই, সবই পরিবর্ত্তনজনিত সুখ, দুঃখের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ, সুতরাং তাহা পরমার্থ নহে। যদি সম্পূর্ণভাবে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে, এরূপ সুখের হাতও এড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়।

দুঃখের হাত এড়ানই জীবনের উদ্দেশ্য। পরিবর্ত্তন সুখ এবং দুঃখের জনক। আমাদের যখনই এক অবস্থার পরিবর্ত্তে অন্য অবস্থা আসে, তখনই হয় সুখ না হয় দুঃখের অনুভব হয়, এবং এই সুখ এবং এই দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং সুখই বা কি দুঃখই বা কি উভয়ই পরিত্যাজ্য। অতএব সুখদুঃখের মূলীভূত পরিবর্ত্তন আত্মার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ নহে।

আত্মা যখন দুঃখ চায় না, তখন দুঃখের অতীত কোন অবস্থা আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। দুঃখের সহিত যখন সুখের সম্বন্ধ তখন সুখের অবস্থাও আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নহে। আমার স্বাভাবিক অবস্থা সুখদুঃখের অতীত এবং সকল পরিবর্ত্তনের অতীত। সাধারণ লোকে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, দার্শনিক ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেন। আবার আমাদের ভারতবর্ষীয় দার্শনিকরা সকলের চেয়ে ভালরূপে ইহা হৃদয়ঙ্গম করেন।

আবার এমনও দেখা যায়, একজন যাহাকে দুঃখজনক মনে করে, আর এক জনের পক্ষে তাহা দুঃখ নহে। যখনই মানুষ কোন অবস্থাকে দুঃখপ্রদ বলিয়া জানে, তখনই তাহা তাহার দুঃখজনক হয়। দুঃখকে দুঃখ বলিয়া না জানিলে, দুঃখও অনেক সময় সুখজনক হয়। সাধারণ লোক যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, দার্শনিক তাহাকে দুঃখ বলিয়াই জানে। দার্শনিক যাহা দুঃখ বলিয়া জানেন, সাধারণ লোক তাহাকে দুঃখ বলিয়া জানিতে না পারিয়া, তাহাই সুখকর বলিয়া মনে করে। সুখ এবং দুঃখ সবই মন লইয়া; যদি মনে করা যায়, সবই দুঃখ, আবার যদি মনে করা যায় সবই সুখ তাই আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের মত এই যে, বন্ধনই দুঃখের কারণ; প্রকৃত সুখ এবং দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই। আমরা বিশেষ বিশেষ সংস্কারের অধীন হইয়া, কোন অবস্থাকে দুঃখজনক, এবং কোন অবস্থাকে সুখজনক মনে করি। সংস্কারের বন্ধন কাটিতে পারিলেই, এ সকল জ্বালা আর থাকে না।

অনেক দার্শনিকের মত এই যে, সুখকর এবং দুঃখকর অবস্থাপরম্পরাই এই জগৎ, এবং এই সকল অবস্থা মনেরই কল্পনাসম্ভূত। সুতরাং জগতের প্রকৃত সত্তা নাই, জগৎ সেই হিসাবে মিথ্যা। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিলেই দুঃখের অবসান হয়।

শ্রীমধ্ব ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বলেন—জগৎ মিথ্যা কল্পনা হইতে পারে, অথবা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে পারিলে, জগৎ বা সুখদুঃখের হাত এড়াইতে পারা যাইতে পারে, কিন্তু জগৎকে যদি মনের কল্পনা বলা যায়, তাহা হইলে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবাও আর একটা মনের কল্পনা। যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে চান, তাঁহারা কল্পনায় সুখী হইতে চান। বিশেষতঃ জোর করিয়া জগতের অস্তিত্ব যদি আমরা অস্বীকার করিতে যাই, তাহা হইলে জগতের কল্পনা

আরও জোর করিয়া আমাদের মনে উদিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন চিকিৎসক কোন রোগীকে বলেন, ঔষধ খাইবার সময় সর্পের চিন্তা করিও না, তাহা হইলে ঔষধ খাইবার সময় রোগীর মনে সর্পের চিন্তা আপনি আসিয়া উদিত হইবে। জগৎ নাই ভাবিতে গিয়া জগৎই মনে হইবে।

মায়াবাদীর উপর এইরূপ আক্রমণ সমীচীন নহে। মায়াবাদীর উদ্দেশ্য নহে যে, জগৎ নাই ভাবিয়া জগতের হাত এড়াইতে হইবে। মায়াবাদী ঠিক চোক বুজিয়া বিপদের হাত এড়াইতে বলেন না। জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কারকে তাঁহারা চূর্ণ করিতে বলেন। সর্পের চিন্তা মনে উদিত হইলে কিছুই যায় আসে না; প্রকৃত সর্প আছে, এই বিশ্বাসই মনে ভয়ের উদ্রেক করে। যদি কাহারও মনে সংস্কার থাকে অমুক বৃক্ষে ভূত আছে, তাহা হইলে তাহাকে যদি বলা যায়, তুমি ঐ বৃক্ষের তলা দিয়া যাইবার সময়, ভূতের চিন্তা মনে আনিও না, তাহা হইলে তাহার প্রতি এই উপদেশ মঙ্গলপ্রদ হইবে না, কেননা সে ঐ গাছের তলা দিয়া যাইবার সময়, আপনা আপনিই ভূতের চিন্তা তাহার মনে উদিত হইবে, এবং সে ভয়ও পাইবে। পক্ষান্তরে ঐরূপ সংস্কারাপন্ন লোকের মন হইতে যদি ঐ ভ্রান্ত সংস্কার বিদূরিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার মনে ভূতের চিন্তা উদিত হইলেও তাহার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। শুধু জগৎ নাই বলিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। সে চেষ্টা যত করা যায়, ততই বিফল-মনোরথ হইতে হয়, অর্থাৎ ততই সে চিন্তা আরও জোর করিয়া মনে উদিত হয়। জগৎ আছে এই ভ্রান্ত সংস্কারকে বিচার বা যুক্তি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে, তখন মনের যে অবস্থা হইবে, সেই অবস্থায় জগতের চিন্তা যতই মনে উদিত হউক না কেন, তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। জগতের অস্তিত্বের ধারণা আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারি না। জগৎ আছে বলিয়া আমরা যে অনুভব করি, তাহা নিরর্থক নহে, নিশ্চয়ই তাহার মূলে কারণ আছে। জগৎ আছে বলিয়া অনুভব করার মূলে যে কারণ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সেই কারণে জগৎ যে একেবারেই মিথ্যা তাহা বলা যাইতে পারে না। কোন যুক্তিই মায়াবাদীকে (idealist) তাহার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা, খাদ্য প্রভৃতির চিন্তা হইতে বিরত করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতেই মায়াবাদ ঠিক খণ্ডিত হয় না, কারণ, মায়াবাদী আপনার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা, খাদ্য প্রভৃতির চিন্তারত থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি মনে মনে জানেন, ইহা মায়ারই ব্যাপার। কবেকার কি সংস্কার এখনও তাঁহার মনকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে; তাই একেবারে তিনি এসকল ভুলিতে পারিতেছেন না; কিন্তু ক্রমশঃ যত তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে, ততই তিনি এ সকলে আসক্তিশূন্য হইতেছেন। পরে একেবারে জগদ্ভ্রম বিদূরিত হইবে। দীর্ঘকাল গতিবিশিষ্ট রেলের গাড়ী চড়িয়া পরে যখন গাড়ী হইতে নামা যায়, তখনও যেন রেলের গাড়ী চড়িয়া যাইতেছি এরূপ মনে হইতে থাকে। সংস্কার একেবারে যায় না, অথচ তত্ত্বজ্ঞানী তাহাতে আসক্ত হয় না। আমরা অভ্যাসের বশে অনেক কাজ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের আত্মা তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে। কি মায়াবাদী কি অন্য কেহ, জগতের চিরস্থায়িত্ব বিশ্বাস করিতে বাধ্য, এই সকলই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। জগৎ যে এখনই আছে, পূর্ব্বে ছিল না, বা পরে থাকিবে না, এমন কেহ বিশ্বাস করে না। কোন

না কোন আকারে জগৎ পূর্ব্বেও ছিল, এবং পরেও থাকিবে, ইহাই সকলের বিশ্বাস। যদি তাহাই হয়, এবং আত্মা বলিয়া যদি অন্য কিছু থাকে, তাহা হইলে, এমন এক সূত্র আছে, যে সূত্রে জগতের সহিত আত্মার এমন এক সম্বন্ধ আছে যাহাতে জগৎ আত্মার সুখ দুঃখের মূলীভূত কারণ হয়। জগতের জীব যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া জাগতিক সুখ দুঃখের বশবর্ত্তী হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম এই সূত্রঘটিত। বস্তুতত্ত্ববাদীর এই কথার উত্তরে মায়াবাদী বলিবেন, এ সকলই আত্মার কল্পনা। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না, যদি থাকে আত্মার সহিত কোন সূত্রে তাহার কোন সম্বন্ধ চিন্তা করা যাইতে পারে না। যাহা আত্মার অতিরিক্ত তাহা অনাত্মা,আলোকের সহিত অন্ধকারের যে সম্বন্ধ আত্মার সহিত অনাত্মার সেই সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধই নাই ; তবে যে সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়, তাহা মিথ্যা। সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে আত্মার যে ধারণা তাহা মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা হইলেও এরূপ ধারণা হয়। সুতরাং ইহাকে মায়া ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। মায়াবাদী যুক্তিতে জগতের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পান না। তিনি যখন যুক্তি করিতে বসেন তখন দেখেন, জগৎ থাকিতে পারে না। কিন্তু জগৎ না থাকিলে জগৎ সম্বন্ধে সংস্কার কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহারও কোন উত্তর তিনি যুক্তিতে পান না। জগৎ আছে, একথা তিনি বলিতে পারেন না ; জগৎ নাই অথচ জগতের সংস্কার কেমন করিয়া হয়, একথাও বলিতে পারেন না। সুতরাং মায়াবাদের অবতারণা ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর নাই। যখন 'জগৎ না থাকিলে জগতের সম্বন্ধে সংস্কার হইতে পারে না', এ কথার প্রতিবাদ তিনি করিতে পারেন না, তখন তাঁহাকে প্রমাণ স্বরূপ শ্রুতিবাক্যের সাহায্য লইতে বাধ্য হইতে হয়।

ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হয়। বেদান্তেও ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে না পারিয়া উপনিষদ্ও ' নেতি ' ' নেতি ' বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে কি বলিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না, যাহা কিছু বলিতে যাওয়া যায় তাহাই তিনি নহেন। তাই বলিয়া কি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কিছুই নহেন। শ্রীমধ্ব বলেন, ব্রহ্ম যে কিছুই নহেন তাহা হইতে পারে না। চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবই গুণযুক্ত, কিন্তু ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। নির্গুণ বলিয়া ব্রহ্ম যে একেবারে কিছুই নহেন তাহা হইতে পারে না। আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না, যাহা একেবারে গুণাতীত। যে কোন বস্তু কল্পনা করা যাউক না কেন, তাহার কোন না কোন গুণ থাকিবেই। তবে ঈশ্বরকে কেমন করিয়া নির্গুণ বলা যাইতে পারে ? নির্গুণ কিছুই থাকিতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বরকে যদি নির্গুণ বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর কিছুই নহেন, এই ধারণাই হওয়া সম্ভব। শ্রীমধ্ব সেই কারণেই ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অথচ উপনিষদ্ ও বেদান্তের কথাও মিথ্যা নহে। শাস্ত্র যেখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছেন, " নেতি " " নেতি " বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে শাস্ত্রের অন্য তাৎপর্য্য আছে। যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলে শাস্ত্র যেখানে তাঁহাকে " সৎ " " চিৎ " "আনন্দ" বলিয়াছেন, সেখানে সেই শাস্ত্রবাক্যে কি বুঝিতে হইবে ?

শাস্ত্র বলেন তিনি নির্গুণ, তিনি ' নেতি ' ' নেতি, ' আবার শাস্ত্র বলেন, তিনি সৎ চিৎ আনন্দ, তিনি নিত্য, এবং শাস্ত্র আরও অনেক বিশেষণে তাঁহাকে ভূষিত করেন। শাস্ত্রের

এই সকল বাক্য আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই ?

যাহা কিছু গুণমণ্ডিত তাহাই অনাত্মা, একমাত্র আত্মাই গুণাতীত। আত্মা যাহা অনুভব করে, যাহা কল্পনা করে, তাহাই গুণমণ্ডিত, কিন্তু যিনি অনুভব করেন, কল্পনা করেন, তাঁহাতে গুণের লেশমাত্র নাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত যিনি, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অনুভূতি, যাঁহার কল্পনা, তিনি নির্গুণ। গুণমণ্ডিত বস্তুর গুণ প্রকৃতি হইতে জাত, এবং সেই প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি। ঈশ্বর গুণকে সৃষ্টি করেন, এবং গুণের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন ; কিন্তু জগৎ যেমন গুণের বাধ্য, তিনি গুণের বাধ্য নহেন। তবে সকল গুণের তিনি উৎস। যেখানে গুণ তাঁহার বাধ্য, অথচ গুণের তিনি বাধ্য নহেন, সেখানে তাঁহাকে গুণাতীত বলা যাইতে পারে। আত্মাই অনুভব করিতে পারে, আত্মাকে অনুভব করা যায় না, কারণ যাহাকে অনুভব করিতে হইবে, তাহাকে কোন না কোন রূপে গুণমণ্ডিত হইতে হইবে। আত্মাই দেখে, আত্মা দৃষ্ট হয় না। আত্মাই করে, আত্মা কৃত হয় না ; আত্মাই চালায়, আত্মা চালিত হয় না। সুতরাং যাহা দেখা যায়, করা যায়, পরিচালিত হয়, আত্মা এই সকলের অতীত, সুতরাং বিশ্ব-সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা আত্মার সদৃশ বা তুলনার যোগ্য হইতে পারে, সুতরাং আত্মাকে বুঝিতে গিয়া নেতি নেতি করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। বাস্তবিক আত্মা ইহাও নহে, উহাও নহে, তাই বলিয়া, আত্মা যে কিছু নহে, তাহা নহে, আত্মা যাহা, আত্মা তাহাই, আর কিছু নহে। তিনি নিত্য শুদ্ধ—অতি নির্ম্মল, অথচ সকলেরই উদ্ভব-কর্ত্তা, সকলেরই পরিচালক ও দ্রষ্টা।

সংসার দুঃখের মূল। সংসার হইতে অব্যাহতি পাইলে, দুঃখের হাত এড়ান যায়। সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, সংসার হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সংসারের সহিত সম্বন্ধের সূত্র মন। এই সূত্র বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, সংসারের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। আমার সংসারের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, সংসার থাকা না থাকা আমার কাছে সমান।

এখন কথা এই যে, সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করা যায় কি না। যদি বিচ্ছিন্ন করা না যায়, যদি বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে, সংসার মিথ্যা এমন কথা বলা চলে না। সংসার স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে ; অথবা সংসার মনের সংস্কার-সম্ভূত হইতে পারে ; অথবা সংসার আছে, কিন্তু সংসারের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এমনও হইতে পারে। যদি সংসার স্বতন্ত্রভাবে থাকে, এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ কোন কারণে হয়, তাহা হইলে, দুঃখের কারণ সংসারের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে পারিলে দুঃখ ঘুচিয়া যায়। সংসার যদি মনের সংস্কারসম্ভূত হয়, তাহা হইলে সে সংস্কারকে বদলাইতে পারিলে, দুঃখ আর থাকে না। কিন্তু সংসার যদি সত্য সত্যই থাকে, এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ এড়ান অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সংসার-মুক্তি হইতে পারে না, সে অবস্থায় সংসারকে সুখের করিবার চেষ্টা করাই পরমার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা।

সংসার আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আছে, এই মতকে দ্বৈতবাদ বলিতে হয় ; সংসার

আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, আত্মারই অংশরূপে আছে, এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈত বলা হয় ; আত্মাই আছে, সংসার বস্তুতঃ নাই, সংসার প্রতীয়মান এবং মায়া, এইরূপ মতই অদ্বৈতবাদ।

সংসার যদি আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত তাহা হইলে সংসারের অস্তিত্ব বোধগম্য হইতে পারিত না। যখন সংসারের অস্তিত্ব আমার বোধগম্য, তখন নিশ্চই জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতমতই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

মুক্তি সম্বন্ধে মাধ্বগণ বলিয়া থাকেন—

ত্যাগ, ভক্তি, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানা মুক্তির একমাত্র উপায়। ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে হয়।

স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তুকে ঠিক ভাবে জানিতে হইবে—অনুসন্ধান দ্বারা। অবহিতচিত্তে চিন্তা করিয়া বস্তুর বহিরভ্যন্তর অবগত হইবার চেষ্টাই ধ্যান।

চিন্তা, ধ্যান এবং ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে শুধু সাধনার দ্বারা তাহা হয় না। অপরোক্ষ লাভ হইলেই আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

শ্রুতি বলেন, "যখন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় বিদূরিত হয়, এবং কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।" কুম্ভকার যেমন কুম্ভকারের চাক ঘুরাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিলেও চাকটী ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধের অবশেষ যতকাল থাকে ততকালই অপরোক্ষিত জীবকে শরীব ধারণ করিতে হয়। "প্রারব্ধের অবসান হইয়া গেলে জীব একেবারে বিমুক্ত হয়, আর তাহাকে সংসারে ফিরিতে হয় না।" এইটী ব্রহ্ম সূত্রের শেষ সূত্র।

ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তী মুক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। মুক্তি বলিতে কি বুঝায়? ন্যায়-মতে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভই মুক্তি। অদ্বৈতমতে ব্যক্তিত্বের বিনাশ হইয়া ব্রহ্মে লীন হওয়াই জীবের মুক্তি। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নির্গুণ, সুতরাং সে অবস্থায় জীবও নির্গুণ হয়। সুতরাং সে অবস্থায় জীবের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বা সুখদুঃখ-ভোগ কিছুই থাকে না। বৈষ্ণব দার্শনিকদিগের মত এই যে, জীবসকল নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের সহিত একত্র আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা জীবাত্মার একত্ব স্বীকার না করিয়া বহুত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সকল জীব এক রূপও নয়, এক এক জীবের এক এক প্রকৃতি ; জীবের প্রকৃতিতে যে কলুষ আছে, তাহার নাশ হইলে জীব বিশুদ্ধ হয় ; বিশুদ্ধ জীব পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে, এবং ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, জীবের আর দুঃখ থাকে না। তখন ঈশ্বরের সঙ্গ-লাভ করিয়া জীব অপার আনন্দে থাকে।

দ্বৈতবাদীর মতে জীবের বিনাশ হইতে পারে না। জীবের বিনাশ হয়, এই মত, তাঁহাদের মতে ভ্রমাত্মক। মুক্ত জীবের যে সুখ দুঃখের জ্ঞান থাকে না, তাঁহারা এই মতের

বিরোধী। তাঁহারা বলেন সুখ দুঃখের জ্ঞান না থাকিলে জীবের অবস্থা জড়ের অবস্থার ন্যায় হইয়া যায়। জীব ও জড়ে তাহা হইলে প্রভেদ কি? স্ফটিক যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, ইহা খনিজ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহা হইলে সমুজ্জ্বল স্ফটিকেরই সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, দ্বৈতবাদী এরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে মুক্তি দুঃখাদির অবসান নহে, তাঁহাদের মতে মুক্তি, জ্ঞান পূর্ব্বক উপভোগের উপযোগী আনন্দ। মুক্তাত্মার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আনন্দময় ঈশ্বরের সঙ্গলাভে তাহার শাশ্বত আনন্দের উপভোগের সহায়তা করে।

জীব মুক্ত হইলে ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান হয় না; অন্যান্য মুক্ত জীবেরও সহিত এক বা সমান হয় না। জীব ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হইতে পারে না। ঈশ্বর হইতে জীব বিভিন্ন। সকল জীবই পরস্পর বিভিন্ন; এক জীব আর জীবের সহিত সমান বা এক হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রের মতে ব্রহ্মের সহিত জীবের যখন যোগ হয়, তখন যে ব্রহ্মের সহিত জীবের কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না, এমন নহে। ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের যোগ হইলেও কতিপয় বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের পার্থক্য থাকে। মুক্তাত্মারা ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের যোগ বুঝিতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মের সকল শক্তি ও সকল ভাব প্রাপ্ত হন না, এবং ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া একও হইয়া যান না।

মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ চরম উদ্দেশ্য কি? তাহাই অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি দার্শনিকের আছে।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখ অতিক্রম করা। মানব-জীবন দুঃখময়, কি সুখময়, কি সুখদুঃখময়?

মানব সকল সময় এক অবস্থায় থাকে না। মানবের অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়তই হইতেছে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা-পরম্পরার ভোগকর্ত্তা আত্মা। আত্মা নির্ব্বিকার এবং এবং নির্ব্বিশেষ। আত্মা নিত্য চৈতন্যময় এবং জ্ঞাতা। অবস্থা-পরম্পরা আত্মার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাতেই আত্মার সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। অবস্থা-পরম্পরা প্রকৃতির গুণসম্ভূত এবং গুণময়, আত্মা গুণাতীত, সুতরাং পরস্পরের আকাশ-পাতাল ভেদ। কিন্তু তথাপি যখন আত্মা অবস্থার বশবর্ত্তী হয়, তখন এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-সূত্র মানিয়া লইতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ঐরূপ প্রভেদ, সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তথাপি যে সম্বন্ধ বোধ হয় তাহা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। বিষয় ও বিষয়ী বলিয়া কিছুই নাই, আছে কেবল এক আত্মা। আত্মা বস্তুতঃ বিষয়ী নহে।

আত্মা চৈতন্যময় এবং জ্ঞানময়। যদি আত্মা জ্ঞানময় হয়, তাহা হইলে আত্মার জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই। যদি আত্মার জ্ঞানের বিষয় না থাকে তাহা হইলে আত্মা জ্ঞানময় বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। আত্মা জ্ঞানময় বা জ্ঞাতা না হইলে, আত্মা চৈতন্যময়ও হইতে পারে না।

যাহা জ্ঞানময় বা চৈতন্যময় নহে, তাহা কি ? আমরা যাহাকে জ্ঞান ও চৈতন্য-বিরহিত মনে করি তাহাকে জড় বলিয়া থাকি। এখন জিজ্ঞাস্য, জড় বলিয়া বস্তুতঃ কিছু আছে কি না। আমরা বলিতে পারি, যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় তাহাকেই আমরা জড় বলিয়া থাকি।

আত্মা জ্ঞাতা, সুতরাং আত্মার জ্ঞানের বিষয় আছে। জ্ঞাতা হইলেই জানিতে হইবে। কি জানিতে হইবে? যাহা কিছু জানিতে হইবে। আত্মার স্বভাবই কিছু না কিছু জানা। যাহা জানা যায় আমরা তাহার বস্তুগত পৃথক্ সত্তা অনুমান করি। আমাদের এই অনুমান যথার্থ হইতে পারে না। আত্মা যদি জ্ঞাতা হয় তাহা হইলে আত্মার যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা আত্মারই অংশ, তাহা আত্মা হইতে পৃথক্ কিছুই নহে। আমরা তাহাকে পৃথক্ বলিয়া অনুমান ও অনুভব করি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, তাহা আত্মারই অংশ। যদি তাহা অস্বীকার করা যায় তাহা হইলে বিশুদ্ধ আত্মাকে জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মার জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। আত্মারই জ্ঞানের বিষয় রূপে—সুতরাং আত্মারই অংশরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের আত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের কোন অংশ আত্মার জ্ঞানের বাহিরে থাকা সম্ভব নহে ; তাহা হইলে আত্মারই জ্ঞানের অভ্যন্তরে সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ বিদ্যমান ; তাহা হইলে জগতের সকল অংশ আত্মা যুগপৎ জানিতেছে। আত্মা জগৎকে আংশিকভাবে কখনই জানিতে পারে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে জগতের যে অংশ যখন আত্মার জ্ঞান-বহির্ভূত হইত তখন সেই অংশের বিদ্যমানতা আরম্ভ হইত। তাহা অচিন্তনীয়, সুতরাং জগতের সকল অংশই যুগপৎ আত্মার জ্ঞানের বিষয় হইতে বাধ্য। আমরা কিন্তু জগতের সকল অংশ যুগপৎ জানিতে পারি না, এবং যুগপৎ জানাও সম্ভব মনে করি না। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মার এমন এক অংশ আছে যাহা সমগ্র জগৎকে যুগপৎ জানিতেছে। আত্মার সেই অংশকে পরমাত্মা বলা হয়।

আমরা জানি, আত্মার জ্ঞানের বিষয় এই জগতের সামান্য একটি অংশ মাত্র যখন আমরা জানি, তখন তাহার অবশিষ্ট সকল অংশ আমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত থাকে। জগতের যে অংশটুকু আমার জ্ঞান-বহির্ভূত থাকে, সে অংশটুকু সকল জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। একেবারে সকল জ্ঞানের বাহিরে থাকা, একেবারেই না থাকা। আমার জ্ঞানের বহির্ভূত যে টুকু, সে টুকুকে অপর কোন জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইতে হইবে, নচেৎ তাহার একেবারে থাকা হয় না ; সুতরাং আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(১০)

চন্দ্রশেখরের পরের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে কালানুক্রমিক পারম্পর্য্য লইয়া কতকটা সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। শচীশ বাবুর তালিকায় চন্দ্রশেখরের অব্যবহিত পরেই 'রাজসিংহ' (১৮৮২) ও তাহার পর ক্রমান্বয়ে 'আনন্দমঠ' (ডিসেম্বর ১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), ও সীতারাম (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের আলোচনায় এই অন্বয় ঠিক অনুসরণ করার পক্ষে কিছু বাধা আছে। প্রথমতঃ রাজসিংহের প্রথম সংস্করণের সহিত বর্ত্তমান সংস্করণের (১৮৯৩) একেবারে মৌলিক ও গুরুতর প্রভেদ আছে। এবং এই শেষ সংস্করণ বঙ্কিমের অন্যান্য সমস্ত উপন্যাসের পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেও বর্ত্তমান সংস্করণের রাজসিংহ অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে অনেকটা বিভিন্ন; রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের প্রারম্ভে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে এই পার্থক্যের প্রকৃতি বুঝা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজ অভিমত এই বিজ্ঞাপন ব্যক্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত কাল্পনিকের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে লেখকের মতামত বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের সহিত বঙ্কিমের মতের কতখানি মিল আছে, তাহা রাজসিংহ আলোচনার সময় দেখা যাইবে। এখন এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বঙ্কিমের নিজের মতে রাজসিংহই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস; তিনি লিখিয়াছেন "পরিশেষে বক্তব্য যে আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারেনা। এই এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্য্যন্ত (ঐতিহাসিক ?) উপন্যাস-প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।" সুতরাং রাজসিংহকে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরমোৎকর্ষের উদাহরণ বলিয়া মনে করিলে, ইহাকে আনন্দমঠ, 'সীতারামের' পর আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত, সেইজন্য আপাততঃ রাজসিংহকে বাদ দিয়া 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামের' আলোচনা আরম্ভ করাই সমীচীন হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'চন্দ্রশেখরে' যে কল্পনাতিশয্যের সূত্রপাত, তাহা 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রকটতর হইয়াছে এবং বঙ্কিমকে অল্পবিস্তর ঔপন্যাসিক আদর্শ হইতে স্খলিত করিতেছে। বিশেষতঃ আনন্দমঠে এই কল্পনা-বিলাস বাস্তবতাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র বিস্তারিত পৃথক্ আলোচনার পূর্ব্বে তাহাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। উভয়েরই ঘটনা-কাল প্রায়ই এক—ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম পত্তনের সময়; দেবী চৌধুরাণীর আখ্যায়িকা আনন্দমঠের কয়েক বৎসর পরে মাত্র। বঙ্কিমের অধিকাংশ রোমান্সের কাল এই ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সূচনার সময়। বঙ্কিমের এই কাল নির্ব্বাচনের প্রধান হেতু এই যে এই যুগে ইতিহাসের

সহিত সাধারণ জীবনের সংযোগ ফুটাইয়া তোলা তাঁহার পক্ষে অধিক কষ্টসাধ্য ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা মৃণালিনীতে যে সুদূর অতীতের চিত্র তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে, তাহাতে তথ্যের অতি ক্ষীণসন্নিবেশ কল্পনাসমৃদ্ধির দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রশেখর আনন্দমঠ বা দেবী চৌধুরাণীতে তিনি যে সমাজ চিত্র দিয়াছেন, তাহা প্রায় আধুনিক যুগের ; সুতরাং তাহাদের মধ্যে তথ্যের অপেক্ষাকৃত ঘন সন্নিবেশ হইয়াছে, ও সাধারণ জীবনের উপর ঐতিহাসিক প্রতিবেশের প্রভাব অনেকটা স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুইখানি উপন্যাসেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার রন্ধ্রপথ দিয়াই আমাদের সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অলৌকিকত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিম এমন দুইটী ঐতিহাসিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সেই যুগের পক্ষে অভাবনীয় ছিল ; আনন্দমঠের সত্যানন্দ ও দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক উভয়েই এমন একই বিরাট আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, যাহা সে যুগের সামগ্রী বলিয়া আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। যে দেশ-ভক্তি ও রাজনৈতিক আদর্শ ইংরেজ রাজত্বে শতবর্ষব্যাপী সাধনার ফল, তাহা বঙ্কিম অনায়াসে মুসলমান শাসনের শেষ যুগের বিকাশ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; অতীতের চিত্রপটে ভবিষ্যতের বর্ণতুলিকা বুলাইয়া আমাদের সহিত একটা প্রকাণ্ড ভোজ-বাজীর খেলা খেলিয়াছেন। ইহার ফলে দুই-খানি উপন্যাসই অল্প-বিস্তর অবাস্তবতা-দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিক্ষোভের যে রাজনৈতিক আদর্শের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের প্রকৃত সমাজ জীবনের কোনও যোগ সূত্র দেখিতে পাই না। এই অবাস্তবতার ছায়া প্রায় সকল সময় সমা-লোচকের চোখই পড়িয়াছে ; এই দোষের প্রতি প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই অপরাধের গুরুত্বের পরিমাণ, ইহার দ্বারা উপন্যাসোচিত সৌন্দর্য্যের কতটা হানি হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সেরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়েই বিচার করিলে আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস হিসাবে উৎকর্ষ স্থির করার সুবিধা হয়।

এই উপন্যাসদ্বয়ের পাঠকের মনে যে সন্দেহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তাহা এই—সত্যানন্দ ও ভবানী পাঠক যেরূপ জ্বলন্ত দেশভক্তি, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠান-গঠন-কুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহা সে যুগের কোন বাঙ্গালী পক্ষে সম্ভব ছিল কি না, এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের এরূপ আশ্চর্য্য কল্পনা-প্রসার থাকিলেও তাহাকে একটা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার শক্তি রাজনীতি-শিক্ষাহীন, দেশাত্মবোধবর্জ্জিত বাঙ্গালীজাতির ছিল কি না। বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে এই সন্দেহ আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে ; এই শত-ব্যবধান-খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন জাতিকে একতাবন্ধনে বাঁধা, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা কত সুকঠিন, তাহার সাক্ষ্য আমাদের আজিকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত হইতেছে। বঙ্কিমের যুগে এই দুরূহ কাজের সম্পূর্ণ দুরূহতা উপলব্ধ হইয়াছিল কিনা সন্দেহ ; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিকূল সাক্ষ্য তখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই ; আদর্শ ও বাস্তব, কল্পনা ও কার্য্যের মধ্যে যে প্রকাণ্ড ব্যবধান তাহার মাপ লওয়া হয় নাই ; তখন কল্পনার একটা প্রথম সতেজ স্ফূর্ত্তি, একটা প্রকাণ্ড অবাধ সাহস ছিল। সেই অবাধ কল্পনার বলে বঙ্কিম মুসলমান

রাজত্বের ধ্বংসের সময় যে একটা বিরাট্ রাজনৈতিক আদর্শের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার দুঃসাহস আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। কিন্তু আমার মনে হয় যে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে এই অবাস্তবতার অভিযোগ অন্ততঃ কতক পরিমাণেও অতিরঞ্জিত হইয়াছে ; তাঁহার সপক্ষেও কতকগুলি কথা বলিবার আছে ; অন্ততঃ এই অবাস্তবতার মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতভাবের প্রেরণা ও বাস্তবসূত্র আছে। সম্পূর্ণ বিচার করিবার পূর্ব্বে এই বাস্তবসূত্রগুলির পরিচয় লওয়া আমাদের উচিত।

ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে ইংরেজ-রাজত্বে নিরবচ্ছিন্ন ও সুদীর্ঘ শান্তি ভোগ ও জ্ঞান-চর্চ্চার ফলে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সহিত পরিচয় আমাদের অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, ও সমাজের ঐরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা উজ্জ্বল বর্ণে কল্পনা করিবার শক্তিও আমাদের হ্রাস হইয়াছে। এখন অরাজকতা বস্তুটী আমাদের নিকট একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার মাত্র ; উহা আমাদের মনে একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকিতে পারে না। অরাজকতা বলিলে কি বুঝায়, আমাদের সাধারণ, প্রাত্যহিক জীবনের উপর ইহার কিরূপ প্রভাব, উহা আমাদের মনের কোন গোপন অপরীক্ষিত গুণগুলিকে টানিয়া বাহির করিবে, আমাদের যে চিন্তাধারা এখন শান্ত জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছে তাহাকে কোন নূতন অপরিচিত প্রণালীতে প্রবাহিত করিবে, এই অবিচ্ছিন্ন শান্তির যুগে আমরা তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি না। বিশেষতঃ মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের সময় একটা বিরাট শূন্যতার যুগ, একটা পুরাতন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারীবৃন্দ, কেন্দ্রশক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের হাতে যে রাজশক্তি ন্যস্ত ছিল তাহা স্বার্থসিদ্ধি ও দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারের কাজে অপব্যবহার করিতেছে, দেশের আকাশ বাতাস একটা অবিশ্রান্ত কোলাহল ও কাতর আর্ত্তনাদে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এই ধ্বংস স্তূপের মাঝখানে কোথাও কোন নূতন শক্তি গড়িয়া উঠার কোন চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। আবার ইহার উপর এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্য দিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রলয় ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে ; রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা যেটুকু বাকী রাখিয়াছিল, ইহা তাহাকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াছে। অরাজকতার যুগেও মানুষের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ণ থাকে ; সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক আকর্ষণ তাহাকে একতা সূত্রে গাঁথিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকে সমস্ত বৃহত্তর সত্তা হইতে বাহির করিয়া একেবারে আত্মসর্ব্বস্ব হইতে দেয় না। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙ্গলা দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে চূর্ণ করিয়া মানুষকে সমাজ ও পরিবারের আশ্রয় হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহার সমস্ত বৃহত্তর ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বিচ্ছিন্ন অণু পরমাণুগুলিকে ধূলির সহিত মিশাইয়াছে, চারিদিকে বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছে।

এই সর্ব্বব্যাপী-ধ্বংসের সময় জীবনের যে সমস্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিকাশ সম্ভব, তাহাদিগকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শে বিচার করিলে ঠিক হইবে না। যখন পুরাতন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, যখন দুর্ভিক্ষদানবের তাড়ায় মানুষ চিরকালের সামাজিক ও পারি-বারিক গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তখন যে তাহাদের মনে অপ্রত্যাশিত ভাবের শিখা

জলিয়া উঠিবে, তাহারা যে নানা প্রকার অভাবনীয় মিলনে সংঘবদ্ধ হইবে, ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে খুব বেশী বিস্ময়ের কারণ নাই। যাহারা সমাজের সহজ নেতা, যাহাদের হাতে সমাজের বিচ্ছিন্ন শক্তির কিয়দংশ এখনও রহিয়া গিয়াছে, সেইরূপ ক্ষুদ্র জমিদার বা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যে এই সময় সর্ব্বব্যাপী অত্যাচার ও অরাজকতার স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইবেন, তাহাও স্বাভাবিক। প্রথমতঃ হয়ত তাঁহাদের চেষ্টা কেবল আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইবে; পরে ধীরে ধীরে যেমন তাঁহাদের শক্তি সঞ্চয় হইবে, যেমন তাঁহারা বিরুদ্ধ শক্তির প্রকৃত বলনির্ণয়ে সক্ষম হইবেন, তেমনি তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্খা ক্রমশ: উচ্চতর পর্য্যায়ে পৌছিবে, তাঁহারা দেশের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হইবেন, বিশৃঙ্খল উপাদানগুলিকে আবার নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা নূতন রাজ্য স্থাপনের কল্পনা রহিয়া রহিয়া তাঁহাদের মনের মধ্যে বিদ্যুৎ শিখার মত খেলিয়া যাইবে। এই প্রণালীতেই প্রত্যেক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠে; শিবাজী হইতে প্রতাপাদিত্য, সীতারামের রাজ্যস্থাপনের এই একই প্রক্রিয়া। সুতরাং এই সর্ব্বদেশসাধারণ প্রণালীর দ্বারা, আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায় কি ভাবে গড়িয়া উঠিল, তাহার একরূপ সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পরেই যে বাধা মাথা তুলিয়া উঠে, তাহা দুরতিক্রমণীয় বলিয়াই মনে হয়। সন্তানসম্প্রদায় গঠনের মূলে যে আশ্চর্য্য দেশপ্রীতি, উন্নত আদর্শবাদ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রলোভনজয়ী নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সে কাল কেন, একালের আদর্শকেও অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে। এইখানে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসোচিত বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শলোকের রাজ্যে উঠিয়াছে। তারপর সন্তান সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপ, উদ্যোগ আয়োজন প্রভৃতি বর্ণনা করিতে গিয়াও বঙ্কিম বাস্তবতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সন্তানদের আনন্দকাননের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে লেখক কোন কথাই বলেন নাই; তাহার অনতিদূরে মুসলমান শক্তির আশ্রয়স্থলস্বরূপ যে 'নগরের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও একটা নামধামহীন ছায়ার মত অশরীরি হইয়াছে; নগরের এত নিকটে একটা এত বড় বিরাট্ প্রতিষ্ঠান কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, রাজ-শক্তির অগোচরে কিরূপে পুষ্টিলাভ ও শক্তি সঞ্চার করিল, ইতিহাসের দিক্ হইতে স্বাভাবিক এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাই না। একটা অসাধারণ আদর্শের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়; খুব নিকট হইতে সূক্ষ্মভাবে ইহাকে দেখিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

বঙ্কিম কিন্তু এই সন্তান সম্প্রদায়ের সহিত আরও কতকগুলি বাস্তবসূত্র জড়াইয়া কতকটা ত্রুটি সারিয়া লইয়াছেন। কেন্দ্রস্থ সন্তানসম্প্রদায় কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার কোনও ব্যাখ্যা দেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের কিরূপে সম্মিলন হইল, কিরূপ সহজে এই বুভুক্ষুদের দ্বারা তাহাদের দলপুষ্টি হইল, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। যদি দীক্ষিত সন্তান-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অদীক্ষিত জনসাধারণ কি করিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিল তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। এবং এই সমস্ত সাধারণ সৈনিকদের যুদ্ধ বিগ্রহ যে লুঠতরাজেরই নামান্তর, তাহারা যে নায়কদের আদর্শবাদের বা গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই, কেবল লুঠের লোভে বা একটা সুলভ আস্ফালন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার

জন্যই সন্তানদের সহিত মিশিয়াছিল, ইহা বঙ্কিমের বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি। বঙ্কিম এতটুকু পর্য্যন্ত বাস্তবতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। যখন ক্যাপ্তেন টমাসের সহিত প্রথম যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী সেনাপতিরা সত্যানন্দকে রাজধানী অধিকার ও বিজিত প্রদেশের শাসনের সুব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিলেন, তখন ধীরানন্দ দেখাইলেন যে রাজ্যজয়ের জন্য কোন সৈনিক পাওয়া যাইবে না, সকলেই লুঠের জন্য বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং এই লুঠই তাহাদের সন্তান-সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, এই উপলক্ষে বঙ্কিম সন্তানদের প্রকৃত দুর্ব্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কি অসার ভিত্তির উপর সন্তান-ধর্ম্মের আদর্শবাদের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার উপর একটা চকিতের জন্য আলোকপাত করিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রায়ই অলক্ষিত ইঙ্গিতের দ্বারা লেখক বাস্তবতার দাবী রক্ষা করিতে ও প্রকৃত অবস্থার ধারণা দিতে একটা ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এই কল্পনাপ্রসূত সৌন্দর্য্যালোকের পশ্চাতে, এক স্থানে নগ্ন বাস্তবতার কঙ্কাল তাহার গাঢ় কৃষ্ণ করাল ছায়াপাত করিয়াছে। উপন্যাসের প্রথম তিনটী পরিচ্ছেদে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানবের যে দানবোচিত বিকাশ দেখিতে পাই, তাহাই সে যুগের আসল স্বরূপটী প্রকাশ করিতেছে; তাহার উপর কোন কল্পনার বর্ণোচ্ছ্বাস, কোন মহান্ আদর্শের জ্যোতিঃ পড়িয়া তাহার সহজ বীভৎসতাটিকে আবৃত করিতে চেষ্টা করে নাই। বাস্তবতার দিক্ দিয়া এই কয়েকটী অধ্যায় উপন্যাসের অন্যান্য সমস্ত অংশ হইতে বিভিন্ন; এখানে বঙ্কিমের আখ্যায়িকা আশ্চর্য্য দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছে; ভাষার মধ্যে একটা অসাধারণ শুষ্ক, কঠোর ব্যঞ্জনা-শক্তি, একটা অব্যক্ত ভীতি সঞ্চারের ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে। সন্তানধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় আদর্শবাদের পশ্চাতে এই ভীষণ বাস্তব-জগতের ঈষৎ-প্রকাশ বঙ্কিমের শক্তির অন্য দিকেরও পরিচয় দান করে।

সন্তান-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সন্তানদের কার্য্য-কলাপ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ আছে আমরা সহজেই মনে করি যে শিক্ষাহীন, উপকরণহীন, সেনাপত্য-বর্জ্জিত কতকগুলি বাঙ্গালী চাষার দল ইংরেজ-সেনাপতিচালিত দুইদল সিপাহীকে পরাজিত করিল, ইহা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় কথা; ইহা কেবল একটা যুক্তিহীন স্বজাতিপ্রীতির উচ্ছ্বাস মাত্র; বাস্তব জগতে আমাদের হীনতা ও পরাজয়ের একটা সুলভ কলঙ্ক-ক্ষালন মাত্র। বাস্তবিক সময় সময় বঙ্কিমের ঘটনাবিন্যাস এরূপ সন্দেহ হইতে মুক্ত নয়। শান্তিকে দিয়া তিনি দুইবার দুইজন ইংরেজ সৈনিকের পরাজয় ঘটাইয়াছেন, একবার শান্তি গুলি করিতে উদ্যত কাপ্তেন টমাসের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছে, আর একবার লিণ্ডলেকে অশ্ব হইতে ফেলিয়া দিয়া ইংরাজদের গোপন অভিসন্ধি সত্যানন্দকে যথাসময়ে জানাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে। এই দুইটী উদাহরণ কেবল একটা অযথা জাত্যাভিমানপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়; ইহারা ইংরাজদিগকে বোকা বানাইয়া সন্তানদের বুদ্ধি ও কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একটা নিতান্ত সুলভ উপায়স্বরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। তার পর আধুনিক যুদ্ধপ্রথায় শিক্ষিত ও আধুনিক যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত ইংরাজের বিরুদ্ধে শিক্ষা-দীক্ষাহীন সন্তান সৈন্যকে জয়ী দেখাইয়া

যে তিনি একটা প্রবল অবিশ্বাসের অবসর দিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে ; সময় সময় সত্যের অনুরোধে তাঁহাকে কামান বন্দুকের কাছে লাঠি বল্লম-ধারী সন্তান-সৈন্যের পরাজয়ের কথা লিখিতে হইয়াছে। তবে এখানেও বঙ্কিমের অপরাধ যত গুরুতর বলিয়া মনে হয়, বোধ হয় ঠিক তত নয়। তাঁহার প্রতি সন্দেহের মধ্যে আমাদের দাসসুলভ মনোবৃত্তি যেন অল্প উঁকি মারিতেছে। মনে করুন সন্তানদের এই বিজয় যদি ইংরাজের বিরুদ্ধে না হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের অবিশ্বাসের মাত্রা এতদূর হইত না। বঙ্কিমের সপক্ষে বলিবার প্রধান কথা এই যে ঐ দুইটী জয়ই ঐতিহাসিক্‌ ; ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাই এই সন্ন্যাসীদের এই দুইটী জয়ের কথা এবং দুইজন ইংরাজ সেনাপতির প্রাণনাশের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে অবশ্য যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা-গুলি—সন্তানসৈন্যের আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে অবিচলিতভাবে দাঁড়ান, ভবানন্দ জীবানন্দের প্রশংসনীয় সৈনাপত্য-কৌশল প্রভৃতি—সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষয়ের সম্ভাবনীয়তার বিচার করিতে হইলে আমাদের তৎকালীন ইংরাজদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। আজকাল ইংরেজ শাসনাধীনে প্রায় দুইশতাব্দী বাস করার পর ইংরেজের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে দাঁড়ান যেমন কল্পনা শক্তিরও অগোচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইংরেজের সহিত প্রথম পরিচয়ের সময় অবশ্য তাহা হয় নাই ; তখন ইংরাজ আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে-ছিল, অথবা সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা বোধ হয় তখনও তাহার মনে উদিত হয় নাই। তখনও দেশবাসী ইংরেজের সহিত খণ্ড-যুদ্ধ করিতে একেবারে সঙ্কুচিত ছিল না ; আর ইতিহাসেই লিখিতেছে যে একটা তুচ্ছ সন্ন্যাসীর দলও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দ্বিধা করে নাই। সে সময় ইংরাজ জাতির অসাধারণ শৌর্য্য ও গৌরবময় ইতিহাস বাঙ্গালীর প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবেই অজ্ঞাত ছিল ; তখনও সে নেপোলিয়ন-বা জার্ম্মাণ-বিজয়ীর যশোমুকুট পরিয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় নাই, তখনও তাহার নামের মহিমা আমাদের শারীরিক ও মানসিক তেজকে একেবারে অসাড় করিয়া দেয় নাই। মোট কথা এখন যাহা আমাদের কল্পনা করিতেও ভয় হয়, তখন তাহা কার্য্যে পরিণত করার দুঃসাহসেরও অভাব ছিল না। সুতরাং এ বিষয়ে বঙ্কিমের অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলিয়াই মনে হয় ; এবং যদি এ সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাস উপন্যাসের রসোপভোগে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ দোষ লেখকের নহে।

আনন্দমঠের বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ—ইহার আখ্যান বস্তুর সহিত বঙ্গের প্রকৃত জীবনের কোন বাস্তব যোগ নাই—তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধেই এতক্ষণ আলোচনা হইল। এই অভিযোগের সাধারণ সত্যতা স্বীকার করিয়া, কোথায় কোথায় বাঙ্গালার বাস্তব জীবনের সহিত উপন্যাসের যোগসূত্র আছে, তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। দেবী চৌধুরাণীতে এই অভিযোগের কারণ কতকটা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু আনন্দমঠের সহিত তুলনায় আমাদের অবিশ্বাসের হেতু অনেক কম। প্রথমতঃ ভবানী পাঠকের মধ্যে সত্যানন্দের ন্যায় একেবারে অবিমিশ্র আদর্শবাদ নাই ; একটা বিশাল রাজ্যস্থাপনের কল্পনা তাঁহার মনে সেরূপ বদ্ধমূল হয় নাই ; তাহার মধ্যে দস্যুদলপতির চিহ্ন অনেকটা স্ফুটতর ; সন্ন্যাসীর

গৈরিক বসন বা সংস্কারকের আদর্শের জ্যোতি সেই চিহ্নকে একেবারে ঢাকিতে পারে নাই। সত্যানন্দের সহিত তুলনায় ভবানী পাঠকের উচ্চাভিলাষ অনেকটা সীমাবদ্ধ; সত্যানন্দের উদ্দেশ্য একটা নূতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন, ও এই নবধর্ম্মের ভিত্তির উপর একটা নূতন রাজ্য গঠন, ভবানীর উদ্দেশ্য একটী স্ত্রীলোকের চরিত্রগঠনদ্বারা তাহাকে দস্যুদলের নেত্রীপদের উপযুক্ত করিয়া তোলা। জনসাধারণের ভক্তি উদ্রেক ও কল্পনাকে মুগ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক সংঘেরই এরূপ একটা রাজা রাণীর প্রয়োজন হয়। দেবী চৌধুরাণীর সৃষ্টি যেন একপ্রকার নূতন রকমের পৌত্তলিকতার প্রবর্ত্তন। সত্যানন্দ-ভবানীপাঠকের মধ্যে আর একটা মৌলিক প্রভেদ আছে; সত্যানন্দ তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মাবরণের মধ্যে প্রধানতঃ একজন রাজনীতিজ্ঞ—politician। ভবানী তাঁহার সমস্ত দস্যুতা ও পরহিতব্রতের মধ্যে বাস্তবিক একজন শিক্ষক, গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মকে বাস্তব জীবনে ফুটাইয়া তোলার উদ্যোগী। আনন্দমঠে দেশপ্রীতিই মুখ্য বস্তু, ধর্ম্ম অপ্রধান, দেবী চৌধুরাণীতে ধর্ম্মই প্রধান, দেশসেবা বা অত্যাচারের প্রতিরোধ একটা নামমাত্র উদ্দেশ্য মাত্র। সুতরাং দেবী চৌধুরাণীতে বাস্তবতার অংশ আনন্দমঠ অপেক্ষা অনেক বেশী; বাঙ্গালার বাস্তব জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে উপন্যাসের অসাধারণ ঘটনাগুলি প্রবেশ করাইতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। আনন্দমঠে সত্যানন্দের গরীয়ান আদর্শটী বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না, দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্লের নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষার অংশ একেবারে বাদ দিলেও উপন্যাসের বিশেষ অঙ্গহানি হয় না।

এইবার 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণীর' অন্যান্য দিক্ আলোচনা করা যাইতে পারে। 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান হইবে যে ইহা উপন্যাস অপেক্ষা বরং মহাকাব্যের লক্ষণান্বিত। বঙ্কিম এখানে কেবল উপন্যাসের বাহ্য আকৃতির ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র; উপন্যাসের ছাঁচে তাঁহার উচ্ছ্বাসিত দেশভক্তি, তাঁহার বিরাট্ রাজনৈতিক কল্পনা ঢালিয়াছেন মাত্র। বাস্তবিক আনন্দমঠের উপন্যাসোচিত গুণ যে খুব বেশী আছে তাহা বলা যায় না। অতীতের চিত্র আঁকিবার ছলে বঙ্কিম ভবিষ্যতের দিকে অর্থপূর্ণ অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়াছেন। আনন্দমঠের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, তাহাদের এক পদ বাস্তবলোকে ও অপরপদ আদর্শলোকে স্থাপিত রহিয়াছে; বাস্তব ও রোমান্স—এই উভয়রূপ উপাদানের সংমিশ্রণে তাহারা গঠিত। ডিকেন্সের কতকগুলি চরিত্রের মত ইহারা একটা মধ্যলোকের অধিবাসী, আদর্শলোকের কল্পনা বাঙ্গালীর নাম ধরিয়া, বাঙ্গালীর সামাজিক ও পরিবারিক জীবনের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে যতটুকু বাস্তবতার দাবী করিতে পারে, ইহারা ততটুকু বাস্তব। সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ সকলেরই ব্যক্তিত্ব একটা কুহেলিকা-মণ্ডিত; ভবানন্দ ও জীবানন্দের প্রলোভন, ব্রতভঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্ত বাস্তব জীবনের সংঘাতের মত আমাদের মনের গভীর দেশে আঘাত করে না। বরং ভবানন্দের প্রলোভন ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কতকটা অন্তর্দৃষ্টি ও ক্ষমতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে, কেননা এখানে অন্ততঃ একপক্ষ—কল্যাণী—বাস্তব-জগতের জীব। বাহিরের জগৎ হইতে যে তিনটী প্রাণী—মহেন্দ্র, কল্যাণী, ও শান্তি—সন্তান ধর্ম্মের অপার্থিব রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে মহেন্দ্র-কল্যাণী এই দুই জনই তাহাদের বাস্তবতা ও ব্যক্তি

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। ইহাদের সংহত সন্তান-জগতের সম্পর্ক ও পরিচয় খুব অল্প দিনের; ইহারা বাহির হইতে যে প্রকৃতি লইয়া এই জগতে পদার্পণ করিয়াছিল, সে প্রকৃতি বিশেষ রূপান্তরিত হয় নাই, চারিবৎসরব্যাপী একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন ও অলৌকিক অনুভূতি হইতে জাগিয়া তাহারা আবার সেই পুরাতন, চিরপরিচিত বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। শান্তিকে সন্তান-রাজ্যের আকাশ-বাতাসের সহিত একাত্ম করিবার জন্য তাহার সমস্ত পূর্ব্ব জীবনকে বিকৃত ও একটা অপ্রকৃত বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইয়াছে। তবে বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে কোন চরিত্রই একেবারে অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য হয় নাই; তাহাদের বাক্যে ও ব্যবহারে ও পরস্পরের সহিত সম্পর্কে একটা সুন্দর ঐক্য ও সুসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। লেখক যে আকাশ-বাতাস সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বাস্তব না হউক, কোনরূপ আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিদুষ্ট হয় নাই ইহা নিশ্চিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে 'আনন্দমঠের' মধ্যে দুই একটী বাস্তব স্বরও আছে; উপন্যাসের সাধারণ অবাস্তবতা হইতে এই দৃশ্যগুলিকে সহজেই পৃথক্ করা যায়। প্রথম চারিটী অধ্যায় এইরূপ একটী ভীষণ বাস্তবচিত্র, আর এক নিমির চরিত্রেই এই খাঁটী বাস্তবতার সুরটী পাওয়া যায়। কিন্তু আনন্দমঠের প্রকৃত গৌরব বাস্তব উপন্যাস হিসাবে নহে। বাঙ্গলার পাঠক সমাজের উপর ইহা যে বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা এক ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন প্রকার সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যে আনন্দমঠ আধুনিক বাঙ্গলার জন্মদান করিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গালীর হৃদয় ও মনোবৃত্তি গঠিত করিয়াছে। যে দেশাত্মবোধ আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাধারণ মানস-সম্পত্তি, বঙ্কিমই তাহার প্রথম অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন। ইউরোপের দেশপ্রীতি, বাঙ্গালার বিশেষ অবস্থার মধ্যে, বাঙ্গালীর বিশেষ পূজোপকরণের সাহায্যে, বাঙ্গালী হৃদয়ের ভক্তি চন্দন চর্চ্চিত করিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের এমন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা নাই, যাহার প্রথম প্রেরণা এই আনন্দমঠ হইতে আসে নাই, বাঙ্গালীর রাজনীতি-চর্চ্চার বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক বক্তৃতায় ভাষা পর্য্যন্ত বঙ্কিমের কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্কিম পৌত্তলিক বাঙ্গালীর মানস স্বর্গে এক নূতন দেবী প্রতিমা সৃষ্টি করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভক্তিকে এক নূতন পথে চালিত করিয়াছেন। পৃথিবীর যে কয়েক খানি যুগান্তরকারী গ্রন্থ আছে, আনন্দমঠ তাহার মধ্যে একটী প্রধান। স্থান অধিকার করে। "বন্দে-মাতরম্" আধুনিক বাঙ্গালীর বেদমন্ত্র। সেই জন্যই আনন্দমঠকে কেবল সাহিত্য হিসাবে বিচার করিলে ইহার সম্পূর্ণ মহিমা ও প্রভাব বুঝা যাইবে না। ইহার স্থান সাধারণ সাহিত্য-লোকের অনেক ঊর্দ্ধে।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর খাদ্যবিচার

এবং শরীর সংরক্ষণে ও জাতিসংগঠনে তাহার উপযোগিতা নির্ণয়।

"খাদ্য বিচার" বলিলে কেহ যেন মনে করিবেন না আমাদের কি খাওয়া উচিত এবং কি না খাওয়া উচিত শুধু ইহারই আলোচনায় আমি এখানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শরীরের রক্ষা ও পুষ্টিসাধনের জন্য কি কি প্রকারের কি অবস্থার কি পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক তাহারই বিজ্ঞানসম্মত বিধি প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য, এবং বাঙ্গালীর বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার সহিত এই আবশ্যকীয় খাদ্য বস্তুর উপভোগের সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে কিনা তাহাও ইহার আলোচ্য বিষয়।

খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের সহিত ব্যক্তির ও জাতির স্বাস্থ্যের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অজ্ঞানতাবশতঃই হোক্ কিংবা অবহেলার দরুনই হোক্ অনেকেই এই বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিতে অক্ষম। মেয়েরা ত মোটেই ইহার আবশ্যকতা দেখিতে পান না—স্ত্রী-শিক্ষার অভাবেরই ইহা এক বিষময় ফল,—এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পুরুষেরাও এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না। তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে একে ত দেশের অধিকাংশ লোক অন্নসংস্থানের অভাবহেতু অনশন ও অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায়, এবং বাকী যাঁহাদের খাইবার সংস্থান রহিয়াছে তাঁহারাও খাদ্যাখাদ্যবিচারের জ্ঞানাভাবে হয় চিররোগী নয় ক্ষীণস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের দেহখানি একটি রাসায়নিক যন্ত্র বিশেষ। ইহার রক্তমাংস, গঠন, শ্বাসপ্রশ্বাস পরিপাক প্রভৃতি বিবিধ প্রক্রিয়া, নানাবিধ গ্রন্থির নিঃসরণ ক্রিয়া ইত্যাদি রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের পরিণামফল মাত্র। ভুক্তদ্রব্যই দেহের যাবতীয় শক্তির উৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার শক্তির উৎপত্তির মূল আমাদের ভুক্ত আহারীয় বস্তু নিচয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই কারণেই সর্ব্বদা মানবদেহকে বাষ্পপরিচালিত ইঞ্জিনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। ইঞ্জিনের শক্তি যেরূপ বাষ্প হইতে এবং বাষ্প যেমন আবার জল হইতে কয়লার সাহায্যে উৎপন্ন হয়, ঠিক তদ্রূপ আমাদের যাবতীয় শক্তিও ভুক্তদ্রব্য হইতেই আমরা লাভ করিয়া থাকি। সুতরাং দেহটাকে একটী রাসায়নিক ইঞ্জিন বলিলেও চলে। ইঞ্জিনের খোরাক যেমন কয়লা, দেহের খোরাকও সেইরূপ যাবতীয় ভুক্ত পদার্থ। ইঞ্জিন হইতে শরীর যন্ত্রের তফাৎ এই যে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের শরীরের ক্ষয় হইতেছে। এই ক্ষয়-পূরণের জন্যও আহারের প্রয়োজন। কাজেই এই ভুক্ত পদার্থের প্রকার ও পরিমাণ ভেদে যে দৈহিক শক্তির পরিমাণ ভেদ ঘটিবে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মোটের উপর শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয় নিবারণ ও শক্তি উৎপাদানের জন্য আহারের প্রয়োজন। অবশ্য প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের পক্ষে প্রথমটীর জন্য (পুষ্টির জন্য) খাদ্যের আবশ্যক হয় না।

কি কি প্রকারের কি পরিমাণ খাদ্য একটী সুস্থকায় যুবকের প্রয়োজন তাহা বহু

পরীক্ষার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে ।তদ্‌হিসাবে আমরা যে সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

১। শ্বেতসারপ্রধান, যথা—চাল, আটা, ময়দা, ভুট্টা গোলআলু ইত্যাদি।

২। আমিষজাতীয়, যথা—দাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধ ইত্যাদি।

৩। স্নেহজাতীয়, যথা—তৈল, ঘি, মাখন প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত নানাবিধ শাক সব্জী, ফলমূল আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি যাহাদিগকে উক্ত কোন বিশেষ শ্রেণীতে অর্ন্তভুত করা যাইতে পারে না। মোটের উপর শরীর পোষণের জন্য তিন প্রকার উপাদানের নিতান্ত প্রয়োজন, প্রথম শ্বেতসার, দ্বিতীয় আমিষ বা প্রোটিড্, তৃতীয় স্নেহ বা চর্ব্বি। ইহাছাড়া অল্প পরিমাণে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ লবণেরও আবশ্যক। প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যেই এই তিনটীর একাধিক বর্ত্তমান থাকে, যে খাদ্য দ্রব্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে থাকে তাহাকে সেই জাতীয় খাদ্য বলা হয়। অর্থাৎ শ্বেতসার খাদ্যে শ্বেতসারের ভাগ, আমিষ জাতীয় খাদ্যে প্রোটিড্ বা আমিষের ভাগ এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যে স্নেহ বা চর্ব্বির ভাগই বেশী বর্ত্তমান থাকে। শাক সব্জি ও ফল মূল হইতে আমরা আমাদের আবশ্যকীয় উদ্ভিজ্জলবণ গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্বেতসার শরীরাভ্যন্তরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া দৈহিক তাপের সৃষ্টি করে; ইহাতেই শারীরিক পরিশ্রমের শক্তি জন্মিয়া থাকে। আমিষ বা প্রোটিড্ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে রক্ত ও মাংসে পরিণত হয়। স্নেহ বা চর্ব্বি শরীরের চর্ব্বি উৎপাদনে ও চর্ব্বিবহুল গ্রন্থি বা কোষ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হয়। এই চর্ব্বিই শরীরে সঞ্চিত তাপ শক্তির ভাণ্ডারস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে। এই জন্যই দেখা যায় যাহাদের শরীর মেদবহুল তাহারা উপবাসেও বিশেষ ক্লান্ত হয় না। কারণ শরীর তখন তাহার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে শক্তি ব্যয় করিতে থাকে। এই চর্ব্বির দরুণই লোক কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে। নানাবিধ উদ্ভিজ্জ লবণ শরীরের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে। বিবিধ দেহগ্রন্থির ও দেহ যন্ত্রের জীবনীশক্তিপোষক স্রাবের এই উদ্ভিজ্জ লবণসমূহ একটী বিশিষ্ট উপাদান।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে পরীক্ষার ফলে কোন ব্যক্তির কত পরিমাণ কি প্রকার খাদ্য উপাদানের দরকার তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। মোটের উপর বলা যায় যে সুস্থকায় সবল মধ্যমাকারের পরিশ্রমী যুবকের পক্ষে প্রত্যহ নিম্নলিখিত পরিমাণে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের আবশ্যক।

প্রোটিড্ বা আমিষ	৩½	আউন্স	বা	১⅞ ছটাক।
স্নেহ বা চর্ব্বি	৩	আউন্স	বা	১½ ছটাক।
শ্বেতসার	১৪	আউন্স	বা	৭ ছটাক।

অবশ্য স্ত্রীপুরুষভেদে, সবলদুর্ব্বলভেদে, কৃশ ও স্থূলশরীরভেদে, পরিশ্রমী বা অলস ভেদে এবং দেশের জলবায়ুভেদে উপরোক্ত পরিমাণের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মপ্রধানদেশে চর্ব্বির অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন হয়। শারীরিক পরিশ্রমীর শ্বেতসারের এবং মানসিক পরিশ্রমীর আমিষের অপেক্ষাকৃত বেশী আবশ্যক হয়। কোন খাদ্যে কি

পরিমাণ খাদ্যউপাদান বর্ত্তমান, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষায় নির্ণয় করা হইয়াছে। সুতরাং প্রাত্যহিক খাদ্য দ্রব্যের প্রকার ও পরিমাণ হইতে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের মোট পরিমাণ সহজেই হিসাব করিয়া লওয়া যায়। নিম্নে বাঙ্গালীর সর্ব্বদা ব্যবহৃত কয়েকটী খাদ্য দ্রব্যে বিভিন্ন খাদ্যউপাদানের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইল।

	শ্বেতসার	আমিষ	স্নেহ	
চাল	৭৬	৬	·৪	(শতকরা)
দাল	৫২	২২	৩	"
মাছ	×	১৬	৫	"
ডিম	×	১২·৫	১২·১	"
মাংস	×	২০	৫	"

উপরোক্ত খাদ্যউপাদানের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী যুবকের প্রাত্যহিক শরীরপোষণোপযোগী নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্যের একটী তালিকা এইখানে দেওয়া যাইতে পারে।

চাল	১৬ আউন্স	বা	৮ ছটাক
দাল	৪ আউন্স	বা	২ ছটাক
ঘি বা তেল	৩ আউন্স	বা	১½ ছটাক
মৎস্য	৪ আউন্স	বা	২ ছটাক
শাকসব্জি বা ফল	৬ আউন্স	বা	৩ ছটাক
দুধ	৮ আউন্স	বা	১ পোয়া

মাংস ও ডিম এই তালিকায় দেওয়া হয় নাই; কারণ সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে এই দুইটীর ব্যবহার বিরল।

অবশ্য এই পরিমাণের কিঞ্চিৎ কম হইলেও আমাদের পক্ষে বিশেষ হানি হয় না, যেহেতু অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবকের শরীরের ওজন তেমন বেশী নহে। সাধারণতঃ শারীরিক পরিশ্রমও আমাদের বিশেষ করিতে হয় না। তবে বেশী কমাইতে গেলেই শরীর পোষণের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যে শরীর কৃশ, রোগপ্রবণ ও কার্য্যাক্ষম হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এই খানে খাদ্য সম্বন্ধে আর একটী নূতন তত্ত্বের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্যতত্ত্ববিষয়ক পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে উপরোক্ত তালিকা অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য উপাদান বিশেষ ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া গ্রহণ করিলে যথোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ সত্ত্বেও শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না।

কাশিমির ফাঙ্ক (Casimir Funk), মেককোলাম (McKolum) ও ডেভিস (Davis) প্রমুখ খাদ্যতত্ত্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে প্রমাণ করিয়াছেন যে সাধারণ প্রকৃতিজাত অকৃত্রিম ও অবিকৃত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে অবস্থিত আছে, যাহাদের উপর প্রাণিগণের বা জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে পরীক্ষার ফলে প্রমাণ হইয়াছে যে ইহারা সাধারণতঃ সতেজ ও পুষ্ট ফলে এবং শাক সব্জী ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু কোনরূপ কৃত্রিম প্রক্রিয়া প্রয়োগে, যেমন সিদ্ধ করিয়া, খোসা ছাড়াইয়া, বা শুকাইয়া লইয়া, শাক সব্জী বা ফল ইত্যাদিকে শোধিত করিবার চেষ্টা করিলে, উহাদের আভ্যন্তরীণ উপরোক্ত সূক্ষ্ম উপাদানের কার্য্যকরী শক্তির বিনাশ ঘটে, এই সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানকে Vitamine বা খাদ্যবীর্য্য বলা হইয়া থাকে।

এই পর্য্যন্ত মাত্র তিন প্রকার খাদ্যবীর্য্য পৃথক ভাবে আবিষ্কৃত ও তাহাদের প্রকৃতি

নির্ণীত হইয়াছে। তাহাদিগকে যথাক্রমে (১) স্কার্ভিনাশক "গ" (C) (২) স্নেহে দ্রবনীয় "ক" (A) ও (৩) জলে দ্রবনীয় খ (B) বলা হইয়া থাকে।

প্রথমটীর বা স্কার্ভিনাশক খাদ্যবীর্য্যের অভাবে বা হ্রাসে স্কার্ভি নামক রোগের উৎপত্তি হয়। যাবতীয় সতেজ ফলে ও শাকসব্জীতে ইহা পাওয়া যায়, সূর্য্যের কিরণে পক্ক বা উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে ইহার প্রাচুর্য্য দেখা যায়, এই কারণে মাটীর অভ্যন্তরে উৎপন্ন মূলাদিতে ইহার পরিমাণ অত্যন্ত কম দেখিতে পাওয়া যায়।

পাতি ও কাগজী লেবুতে এই প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। কাঁচা দুগ্ধেও ইহার প্রাচুর্য্য দেখা যায়; কিন্তু দুধকে সিদ্ধ করিলে বা বহুগুণ উত্তপ্ত করিয়া রাখিলে ইহার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। সুতরাং আমরা সাধারণতঃ সেই প্রকার দুধ খাইয়া থাকি বা দুগ্ধজাত অন্য কোন পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করি—উহাতে এই জাতীয় খাদ্যবীর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব।

স্নেহদ্রবনীয় "ক" এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাবে নানাবিধ চক্ষুরোগের উৎপত্তি হয়, ইহারই অভাব "রিকেট" নামক রোগের মূল কারণ বলিয়া সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দুধ মাখন ইত্যাদি প্রাণীজাত স্নেহ দ্রব্যে ও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত নানাবিধ উদ্ভিজ্জের সবুজ পাতায় ইহা বর্ত্তমান আছে। কড় মৎস্যের তৈলে (codliver oil) ইহার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নানাবিধ স্নেহ দ্রব্যে দ্রবনীয়; কিন্তু জলে দ্রবনীয় নহে। সাধারণ উত্তাপে ইহার শক্তির হ্রাস হয় না;

জলে দ্রবনীয় "খ" এই জাতীয় খাদ্যবীর্য্য জলে বিশেষতঃ জল মিশ্রিত অম্লে সহজে দ্রবনীয়। ইহার অভাব ঘটিলে "বেরী বেরী" (Beri beri) ও অন্যান্য স্নায়বীয় রোগের উৎপত্তি হয়। তরুণ বয়স্ক প্রাণীর বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। নানাবিধ অকৃত্রিম ও অবিকৃত প্রাকৃতিক খাদ্য দ্রব্যে ইহা প্রচুর পরিমানে বর্ত্তমান আছে। যথা—শস্যাদি, ডিম ও জন্তুগণের স্থানবিশেষের মাংস। নানাবিধ দালের সর্ব্বাংশেই ইহা পাওয়া যায়। শস্যাদির বহিরাবরণেও ইহা বর্ত্তমান আছে। অধিক উত্তাপে ইহার শক্তি কথঞ্চিৎ বিনষ্ট হয়।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে শুধু বিবিধ খাদ্য উপাদানের পরিমাণ প্রয়োজনমত ঠিক থাকিলেই শরীরের বৃদ্ধি বা স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। এই সব খাদ্য উপাদানের অকৃত্রিমতা, অবিকৃতি অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে স্বীয় প্রকৃতিগত খাদ্যবীর্য্যের অবস্থিতির উপর দেহের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। অতএব শরীর গঠন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ত্রিবিধ খাদ্য উপাদানের যথাযথ পরিমাণের মত তাহাদের আভ্যন্তরীণ ত্রিবিধ খাদ্য বীর্য্যের পরিমাণও বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞগণ ইন্দুরের উপর পরীক্ষা করিয়া ইহা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে যদি এক দল ইন্দুরকে খাদ্যবীর্য্যহীন খাদ্য উপাদান দিয়া রাখা হয় এবং অপর একদলকে যদি খাদ্যবীর্য্যপূর্ণ সেই পরিমাণের খাদ্য উপাদান দিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে প্রথম দলের ইন্দুরগুলি অল্পদিনের মধ্যেই কৃশ হইয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু অপর দলের স্বাস্থ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় না।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে রোগের আকর শুধু নানাবিধ রোগাণু microbes, bacilli, germsch নহে; খাদ্য দ্রব্যে খাদ্যবীর্য্যের অভাবও রোগের ও স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ। আমরা আরও দেখিয়াছি যে খাদ্য দ্রব্যকে কৃত্রিম, বিকৃত, বিশেষভাবে শোধিত বা পরিষ্কৃত করিতে গেলেই খাদ্যবীর্য্যের বিনাশ ঘটে। ধনীলোকের পরিবারে প্রায় দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণের সারবান খাদ্যের ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয় বা ক্ষীণ-স্বাস্থ্য লইয়া জীবন যাপন করে, কেন না ধনী লোকেরা প্রায়ই বড় বড় সহরে বাস করেন, এবং সহরের খাদ্যদ্রব্যেরই কৃত্রিমতা বেশী, তার উপর আবার রসনার পরিতৃপ্তির জন্য সহজ খাদ্যকে নানারূপে বিকৃত করিয়া তাঁহারা

ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহাদের ছেলে মেয়ে খাদ্যবীর্য্যবহুল সদ্য গোদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ঔষধির সাহায্যে রক্ষিত "Condensed" বা ঘনীভূত দুগ্ধ সেবন করে বা "Horlick's Milk" ইত্যাদি কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলে, তাহাদের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে ইহা কিছুই অপ্রত্যাশিত নহে।

সহর বাসী লোককে প্রায়ই বলিতে শুনা যায় শরীরে কিছুই স্ফূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে না; কোন রোগ নাই অথচ শরীর বা মনের স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রায়ই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে প্রমাণ করা হইবে যে তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যে খাদ্য বীর্য্যের অভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার ইহা একটা প্রধান অভিশাপ বা শাস্তি। মানবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিদেবী তাহার দেহবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্যের বিধান করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ তাহার রসনা তৃপ্তি বা উচ্চশিক্ষার দাম্ভিকতায় প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ বা আধিপত্য করিতে যাইয়া নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। ইহাকেই বলে শক্তির বা মস্তিষ্কের অপব্যবহার।

অবশ্য আমাদের দেশের পল্লীবাসীদের খাদ্যদ্রব্যে খাদ্যবীর্য্যের বিশেষ অভাব ঘটিতে প্রায়ই দেখা যায় না। কারণ পল্লীবাসীরা সাধারণতঃ প্রকৃতিজাত সদ্য শাক সব্জী ও শস্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য দিকে দারিদ্র্যবশতঃ তাহাদের ভুক্ত পদার্থে ত্রিবিধ খাদ্য উপাদানের পরিমাণ উপরোক্ত তালিকানির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে অনেক কম দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি পল্লীগ্রামে যাহাকে সচ্ছল অবস্থা বলে এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকেরও কোন বিশেষ বিশেষ খাদ্য উপাদানের পরিমাণ তালিকানির্দ্দিষ্ট আবশ্যকীয় পরিমাণের ½ অংশেরও সমান কিনা সন্দেহ।

গত গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামে থাকিয়া এই বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এই খানে অবশ্য বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি যে আমাদের গ্রাম—যেখানে এই সব তথ্য সংগ্রহ হইয়াছে—তাহা জেলার মধ্যে একটী প্রধান ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী এবং কৃষক এই বাস করে, গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ৪০০০ চারি হাজারের উপর। ইহাতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় অবস্থিত আছে। সুতরাং এই গ্রামের অধিবাসীগণের অবস্থা জেলার অন্যান্য গ্রামের তুলনায় অনেকাংশে উন্নত। অতএব নিম্নে এই গ্রামে অধিবাসীগণের প্রাত্যহিক খাদ্য উপাদানের সেই পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হীনাবস্থাপন্ন অন্যান্য গ্রামের তুলনায় অনেকাংশে শ্রেয়।

নং	পরিবারে লোক সংখ্যা বয়স্ক বালকবালিকা	ব্যবসা ও মাসিক আয়	প্রাত্যহিক খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ (সাপ্তাহিক গড় হইতে)	ভুক্ত খাদ্যে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের ব্যক্তিগত পরিমাণ
শ্রীঅ..	...৮+৪=১২ (একজন স্কুলে পড়ে)	চাকুরী, ২৫০৲	মোটা চাল—১০ সের দাল—½ সের মাংস—১ ছটাক মাছ—৩ ছটাক শুটকী মাছ—৩ ছটাক ডিম—৩টি দুধ—১ সের তৈল—২ ছটাক শাক সব্জী—সাধারণ মুড়ী মুড়কী ইত্যাদি জলখাবার	শ্বেতসার—১১ ছটাক আমিষ—১·২৫ ছটাক স্নেহ—·৩৩ ছটাক

২। শ্রীঃ......৯+৫=১৪ (দুই জন স্কুলে পড়ে) (প্রায়ই ধার করিয়া চলিতে হয়)	জমিশাসন,	১৯০৲	মোটা চাল—১২ সের দাল—৭ ছটাক মাছ—২ ,, শুকটী মাছ—২ ছটাক ডিম—৩ ছটাক দুধ—১ সের তৈল—২ ছটাক শাক সব্জী—সাধারণ জলখাবার—অতি সামান্য	শ্বেতসার—১১·১ ছটাক আমিষ—১·১ ছটাক স্নেহ—·২৫ ছটাক
৩। শ্রী......শর্ম্মা ৬+৫=১১ (১জন স্কুলে ও ২জন পাঠশালায় পড়ে)	তেজারতি ও যজমানি	১০০৲	মোটা চাল—৯ সের দাল—৩ ছটাক মাছ—২ ছটাক শুকটী মাছ—৯ ছটাক তৈল—১ ছটাক দুধ—½ সের শাকসব্জী	শ্বেতসার—১০·৫ ছটাক আমিষ—·৯৫ ছটাক স্নেহ—·১৪ ছটাক
৪। শ্রী......ভট্টাচার্য্য ৭+৫-১২ (২ জন স্কুলে ও ২ জন পাঠশালায় পড়ে)	দোকানদারী	১০০৲	মোটা চাল—৮ সের মাছ—৭ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক দাল—৭ ছটাক দুধ—½ সের শাকসব্জী	শ্বেতসার—৯ ছটাক আমিষ—১ ছটাক স্নেহ—·৮৩ ছটাক
৫। শ্রী..... কৈবর্ত্ত ৯+৫=১৪ (২ জন পাঠশালায় পড়ে)	বাণিজ্য,	২০০৲	মোটা চাল—১২ সের দাল—৪ ছটাক মাছ—১২ ছটাক শুকটী মাছ—৩ছটাক ডিম—৩টি মাংস—৪ ছটাক তৈল—২ ছটাক তরকারী	শ্বেতসার—১১ ছটাক আমিষ—১·২৫ ছটাক স্নেহ—·২৫ ছটাক
৬। শ্রীঃ......সদাগর ৭+১=৮ (মুসলমান)	কৃষি ও বাণিজ্য	১০০৲	মোটাচাল—৮সের দাল—২ ছটাক মাছ—৬ " মাংস—৭ " শুকটীমাছ—১ ডিম—৩ টি শাকসব্জী	শ্বেতসার :—১৩ ছটাক আমিষ :—১.৫ ছটাক স্নেহ :— .১৫
৭। শ্রী.. ...আলী ৬+২=৮ (মুসলমান) (১জন স্কুলে পড়ে)	কৃষি ও মজুরী	৭৫৲	মোটাচাল—৭ সের দাল—১ ছটাক তৈল—১ " মাছ—১ ,,	শ্বেতসার :—১১.২ ছটাক আমিষ :—১.০৪ স্নেহ :—.১৯ "

	মাংস—২ ছটাক ডিম—১½ টি শুকটীমাছ—১ ছটাক শাকসব্জী	
৮। শ্রী. ....দাস ৬+৪=১০ চাকুরী, ৭০৲ (২জন স্কুলে পড়ে)	মোটাচাল—৭সের দাল—৩ ছটাক তৈল—½ ,, মাছ—২ ,, শুকটীমাছ—২ দুধ—½সের শাকসব্জী	শ্বেতসার :—৯ ছটাক আমিষ :—.৯৪ ,, স্নেহ :—.১৭ ,,
৯। শ্রী......সেন ৯+৩=১২ চাকুরী ৮০৲ (১ জন স্কুলে পড়ে)	মোটা চাল—১০ সের দাল—৩ ছটাক মাছ—২ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক তৈল—১ ছটাক শাকসব্জী	শ্বেতসার—১০·৭ ছটাক আমিষ—·৯২৫ ছটাক স্নেহ—·১১৩ ছটাক
১০। শ্রী......দে ৭+৪=১১ চাকরী ও কৃষি ৫০৲ (১ জন স্কুলে পড়ে)	মোটা চাল—৮ সের দাল—২ ছটাক মাছ—২ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক তৈল—১ ছটাক দুধ—½ সের তরকারী	শ্বেতসার—৯·৩ ছটাক আমিষ—·৮৬ ছটাক স্নেহ—·১৫ ছটাক
১১। শ্রী......শর্ম্মা ৮+৪=১২ চাকরী ও পৌরহিত্য ৪০৲	মোটা চাল—৮ সের দাল—২ ছটাক মাছ—২ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক তৈল—১ ছটাক শাক সব্জী	শ্বেতসার—৮·৪ ছটাক আমিষ—·৮১ ছটাক স্নেহ—·১২৫ ছটাক
১২। শ্রী......শর্ম্মা ৩+২=৫ চাকরী, ২৫৲	মোটা চাল—৫ সের দাল—২ ছটাক তৈল—¾ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক সাক সব্জী	শ্বেতসার—১২·৭৫ ছটাক আমিষ—১·১৫ ছটাক স্নেহ—·০৮ ছটাক
১৩। শ্রী......সেন ৩+১=৪ চাকরী ১০৲	মোটা চাল—৩½ সের দাল—২ ছটাক তৈল—¼ ছটাক শাক সব্জী	শ্বেতসার—১১·৩ ছটাক আমিষ—·৯৭৫ ছটাক স্নেহ—·০৭৫ ছটাক
১৪। শ্রী......দে ৬+১=৭ মজুরী ২০৲	মোটাচাল—৬ সের দাল—১ ছটাক	শ্বেতসার :—১০.৯৩ ছটাক আমিষ :—১ ছটাক

			মাছ—৩ ছটাক	স্নেহ :—.১১৪ ছটাক
			শুকটীমাছ—½ ছটাক	
			তৈল—½ ..	
			দুধ—৪	
			শাকসব্জী	
১৫। মিঞা (মুসলমান)	৫ + ২ = ৭	কৃষি ও মজুরী ১৫৲	মোটাচাল—৫½ সের	শ্বেতসার—১০.০৩ ছটাক
			দাল—১ ছটাক	আমিষ—৮৯৭ ছটাক
			মাছ—১ ছটাক	স্নেহ—·০৪৮ ছটাক
			শুকটী মাছ—½ ছটাক	
			তৈল—½ ছটাক	
			শাক সব্জী	
১৬। মিঞা...... (মুসলমান)	৩ + ০ = ৩	মজুরী, ১০৲	মোটা চাল—২½ সের	শ্বেতসার—১০·৫৫ ছটাক
			শুকটী মাছ—½ ছটাক	আমিষ—·৯১ ছটাক
			শাক সব্জী	স্নেহ—·০৩ "
১৭। শ্রী......কৈবর্ত্ত	৩ + ১ = ৪	ফিরিওয়ালা ও মৎস্যজীবী ১৫৲	মোটা চাল—৩ সের	শ্বেতসার—৯·৬২৫ ছটাক
			দাল—১ ছটাক	আমিষ—·৯৫ ছটাক
			শুকটী মাছ—১ ছটাক	স্নেহ—·১১৭ ছটাক
			তৈল—¼ ছটাক	
			শাক সব্জী	
১৮। শ্রী..... দে	৪ + ৩ = ৭	কৃষি ও চাকরী ২৫৲	মোটা চাল—৫½ সের	শ্বেতসার—১০·০৯ ছটাক
			দাল—১ ছটাক	আমিষ—·৯০৫ ছটাক
			মাছ—১ ছটাক	স্নেহ—·০৭ ছটাক
			শুকটী মাছ—১ ছটাক	
			তৈল—¼ ছটাক	
			শাক সব্জী	
১৯। শ্রী......কৈবর্ত্ত	৫ + ১ = ৬	মৎস্যজীবী, ১৫৲	মোটা চাল—৫ সের	শ্বেতসার—১০·৬ ছটাক
			দাল—১ ছটাক	আমিষ—৯৪৫ ছটাক
			শুকটী মাছ—১ ছটাক	স্নেহ—·০৮ ছটাক
			তৈল—¼ ছটাক	
			শাকসব্জী	

এতদ্ব্যতীত যাহাদের আয় ১০ টাকারও কম, যাহারা অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া চলে বা যাহারা ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন যাপন করে, তাহাদের খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক মনে করিলাম না। পাঠকগণ নিজেই তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

(এক সের শুকটী মাছ ৪ সের মাছের সমান পুষ্টিকর, কিন্তু বড়ই দুষ্পাচ্য)

উপরোক্ত যে কয়টী বিভিন্নশ্রেণীর পরিবারের ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক উপাদানের পরিমাণ হিসাব করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট আবশ্যকীয় খাদ্য উপাদানের পরিমাণের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে—

(১) সকল শ্রেণীর লোকেরাই প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া থাকে।

(২) আমিষের পরিমাণ প্রায়ই সকল পরিবারেই বিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে অনেক কম, দু'একটি সচ্ছল অবস্থাপন্ন পরিবার ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্বত্রই আমিষের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের প্রায়ই অর্দ্ধেক বলা যাইতে পারে।

(৩) কি অবস্থাপন্ন কি দরিদ্র সকল পরিবারের খাদ্যেই স্নেহের পরিমাণ অত্যন্ত কম, অবস্থাপন্ন পরিবারেও ইহা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ½ ভাগও নহে ; এবং দরিদ্র পরিবারে ইহা ⅒ ভাগ হইতেও কম, অবশ্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্নেহের পরিমাণ কিছু কম হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না বটে কিন্তু বেশী অভাব ঘটিলে স্বাস্থ্য হানি অনিবার্য্য, বেশী পরিমাণে শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া স্নেহের ন্যূনতা পূরণ করা যাইতে পারে বটে—কিন্তু তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে, অধিক পরিমাণে শ্বেতসার গ্রহণের দরুণই বাঙ্গালীর খাদ্য পরিমাণবহুল ; ফলে পাকস্থলীর উপর অনাবশ্যক গুরুভার অর্পণহেতু উহার শক্তির হ্রাস ঘটে, বিশেষতঃ স্নেহ পদার্থটী শরীরে শক্তির সঞ্চয় করিয়া রাখে ; তাহাতে দেহের নানাবিধ রোগ প্রতিরোধের ও কষ্ট সহিষ্ণুতার শক্তি বাড়িয়া যায়।

খাদ্যদ্রব্যে এই দুইটী মূল্যবান উপাদানের (স্নেহ ও আমিষ্য) ন্যূনতাই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও বাঙ্গালী জাতীর শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ গ্রামবাসী বাঙ্গালীর খাদ্যে তাহাদের শাকসব্জীপ্রিয়তা ও মোটা চাউলের ব্যবহারের দরুণ খাদ্য বীর্য্যের অভাব বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতির একমাত্র প্রধান কারণ, খাদ্যে স্নেহ ও আমিষের স্বল্পতা, ইহার মূলে যে অবশ্য যে উক্ত দুই প্রকার খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা এবং বাঙ্গালী জাতির অপরিসীম দারিদ্র্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবস্থাপন্ন সহরবাসী লোকদের মধ্যে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে অজ্ঞতাই স্বাস্থ্যহানির মূল কারণ। অতিভোজনে ও গুরুভোজনে, খাদ্যে কৃত্রিমতা বশতঃ খাদ্য বীর্য্যের অভাবে তাহাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটে, তবে এইরূপ লোকের সংখ্যা দেশে শতকরা ৫ জনও আছে কিনা সন্দেহ, কারণ দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, এবং গ্রামবাসীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, অর্থাভাবেই তাহারা নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণে অক্ষম, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যাভাবেই আজ সমস্ত জাতি রুগ্ন, পীড়িত, অক্ষম ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, দেহে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, মস্তিষ্কে চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই, এবং হৃদয়ে সাহস নাই, বাঙ্গালী ছাত্র স্কুল অতিক্রম করিয়া কলেজে প্রবেশ করিতে না করিতেই চশমা ধরিতেছে, হয়তঃ আরো ১০।১৫ বৎসর পরে দেখিতে পাইব ভদ্র পরিবারের অধিকাংশ সন্তানই ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, ইউরোপে লোকের জীবন কাল কাল গড়ে ৫০ ধরা যাইতে পারে, আমাদের ভারতবর্ষে তাহা ২০।২৫ এর বেশী হইবে কিনা সন্দেহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদের যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা হইয়াছে তাহার বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে শতকরা ১০ জন ছাত্রকেও সুস্থ বলা যাইতে পারে না, কাহারো চোখের দোষ, কাহারো কানের দোষ, কাহারো হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য, কাহারো ফুস্‌ফুসের দোষ ইত্যাদি নানাবিধ ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত অজীর্ণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ত কথাই নাই, এই সব ভাবিতে গেলে আমরা যে মৃতপ্রায় জাতি ইহাতে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ থাকে না। ইউরোপ যেখানে বিজ্ঞান বলে বলীয়ান হইয়া নব নব দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে, হিমালয়ে আরোহণ, তুষারাবৃত মেরু প্রদেশ আবিষ্কার বা বায়ু সমুদ্র বিমানপোতে বিজয় করিতে চেষ্টা করিতেছে—আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি হারাইয়া, গৃহের চতুষ্কোণের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া, "মলিন তাস সজোরে ভাঁজিয়া", পূর্ব্বপুরুষের দর্প করিয়া, প্রত্যহ ১০টা হইতে ৫টা আফিসে কলম পিষিয়া এবং নির্ব্বিবাদে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে কষ্টলব্ধ বেতনটী গ্রহণ করিয়া নিদ্রা, আলস্য ও কলহে কাল কাটানই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়াছি। এই প্রকার জীবনে না আছে শক্তি লব্ধ ভোগের রস আর না আছে ত্যাগের মহিমা। আমাদের ভোগের শক্তির অভাবকে যাঁহারা সংযম মনে করিয়া উচ্চাসন প্রদান করেন—তাঁহারা শুধু নিজকে প্রতারণা করিয়া নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। কারারুদ্ধ কয়েদী বা বনে নির্ব্বাসিত মানুষকে যদি সংযমী বলা যায় তবে আমাদিগকেও ত্যাগী বলা যাইতে পারে। এই

প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। দেশে এখন অনেকেই বলেন যে আমাদের বিলাসিতার দরুণই আমাদের দারিদ্র্য, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বিলাসিতা আমাদের বর্জ্জনীয়। বিলাস বর্জ্জন এবং সরল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আনন্দে মগ্ন থাকাই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ, সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া জ্ঞানে আনন্দ লাভ করাও যে মনুষ্যত্ব বিকাশের একটী পরম পন্থা, ইহাও স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই। তবে "বিলাস" শব্দটার প্রকৃত অর্থ লইয়াই যত গোল যোগ। "বিলাস" শব্দের দ্বারা আমাদের বোঝা উচিত যাহা কিছু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনাবশ্যক বা প্রতিকূল, তাহাই "বিলাস", যাহারা অনশনে, অর্দ্ধাশনে বা অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছে তাহাদিগকে বিলাস বর্জ্জন বা ত্যাগের পথ অবলম্বন কবিতে উপদেশ দেওয়া বৃথা। তাহাদের পক্ষে ত্যাগ আর আত্মহত্যা দুইই সমান। আমাদের দেশে শতকরা ৯০ জন লোকও দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারে কিনা সন্দেহ, পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে শক্তিহীন হইয়া ম্যালেরিয়া ও যক্ষার কবলে তাহারা অহরহ আত্মসমর্পন কবিতেছে। সে দিন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে আমাদেব দেশে প্রতিঘণ্টায় ১২ জন করিয়া লোক যক্ষা রোগে জীবন দান করিতেছে। কেহ হিসাব কবিলে দেখিতে পাইবেন যে ম্যালেরিয়ায় হয়ত মিনিটেই ১০।১২ জন করিয়া মরিতেছে। ইহার প্রধান কারণ যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ইহাতে সন্দেহ নাই, এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকের সম্মুখে ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করা আর উপবাসে মৃত প্রায় লোকের সম্মুখে উপবাসের মহিমা বর্ণনা করা দুইই সমান। তবে একটী কথা অস্বীকার করা যায না যে আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অনেক সময় অনাবশ্যক সামাজিক আচার অনুষ্ঠানেব অনুবর্ত্তী হইয়া ও সভ্যতার আনুষঙ্গিক বাহিক পোষাক পরিচ্ছদের মাত্রা রক্ষা করিতে যাইয়া নিজের ও স্ত্রীপুত্র কন্যার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান করিতে পারেন না। পুত্রগণের উচ্চশিক্ষার ও মেয়েদের গান বাজনা ও ইংরাজী শিক্ষার এবং তাহাদের বর্ত্তমান সভ্যতানির্দ্দিষ্ট জামা, জুতা, কাপড়, ও শাড়ী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে যাইয়া, স্ত্রীর অলঙ্কার ও কাপড়েব আবদার রক্ষা করিয়া, মেয়েদের বিবাহের জন্য টাকা জমাইয়া তাঁহাদের স্বল্প বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাতে পরিবারের সকলের জন্য আবশ্যকীয় পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সভ্যতার আবদার বা দাবী রক্ষা করিতে যাইয়া, হয় তাহাদিগকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়, নতুবা পেটের উপর বাণিজ্য করিতে হয়। ফলে পরিবারের সকলেই, রুগ্ন, স্বল্পআয়ু ও অক্ষম হইয়া পড়ে; এবং ডাক্তারেব ও ঔষধের দাবী মিটাইতে যাইয়া আবো বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এই বুদ্ধি বিভ্রম না ঘুচিলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের আর কল্যাণ নাই।

আর যাহাদের ঘরে অর্থ অপ্রতুল নহে, তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য বিচারে জ্ঞানাভাব বশতঃ অতি ভোজন, গুরু ভোজন ও কৃত্রিম ভোজনে রসনা তৃপ্তি করিতে যাইয়া নিজেদের ও পুত্র কন্যার স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিতেছেন, এই শ্রেণীর পক্ষে ত্যাগ ও সংযমের আদর্শের অনুকরণই এক মাত্র শ্রেয়ের পথ।

পরিশেষে এই মরণোন্মুখী জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে কি ব্যবস্থা ও প্রয়াস আমাদের করিতে হইবে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষদিয়া এইখানে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহারই আয়োজন করা। এই জন্য গ্রামে গ্রামে সহযোগ বা সমবায় (Co-operative)-প্রণালীতে কৃষি, গোপালন, মৎস্য ও পক্ষী পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে অল্পব্যয়ে অকৃত্রিম দুধ, ঘি, ও মৎস্য ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য সাধারণ লোকের ব্যবহারে আসিতে পারে এইরূপ ভাবে তাহাদের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য

তালিকাকে কথঞ্চিৎ ভাবে সংশোধিত করা আবশ্যক। দুবেলা অন্নের পরিবর্ত্তে যদি এক বেলা ভাত ও অন্য বেলা আটার রুটী খাইতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে আমরা একই খরচে অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যউপাদান পাইতে পারি। কারণ চাল অপেক্ষা গম বা আটা অনেক অনেক বেশী পুষ্টিকর। তৃতীয়তঃ যাঁহারা সহরবাসী ও অবস্থাপন্ন তাঁহারা কৃত্রিম বা রাসায়নিক উপায়ে রক্ষিত সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য (preserved food) এবং হোটেলে (Restaurants) বা আশ্রম প্রভৃতিতে প্রস্তুত যাবতীয় রসনাতৃপ্তিকর বিকৃত খাদ্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত এই প্রকার খাদ্য দ্রব্য শরীরের পুষ্টিসাধন না করিয়া সমূহ অনিষ্ট করিতে থাকে। অমৃতভ্রমে তাঁহারা অহরহ গরল পান করিতেছেন, আমাদের যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ই এই সমস্ত হোটেল ও আশ্রমের বিশেষ ভক্ত দেখিতে পাই। তাঁহারা তাঁহাদের অভিভাবকদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ এই প্রকারে শুধু নষ্ট করিতেছেন না, অধিকন্তু নিজের অমূল্য স্বাস্থ্যের মূলেও কুঠারাঘাত করিতেছেন। এইপ্রকার দুর্ম্মূল্য খাদ্যভ্রমে বিষ গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা অতি সহজেই ও অল্পমূল্যে নিম্ন লিখিত প্রকৃত পুষ্টিকর, অকৃত্রিম খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন। অবশ্য প্রথম প্রথম এই সব খাদ্য তেমন রসনাতৃপ্তিকর না হইতে পারে; কিন্তু অভ্যাস করিলে ইহাতেও তাঁহারা যথেষ্ট রসাস্বাদ পাইবেন। স্বাস্থ্যহানিকর হোটেলের কৃত্রিম ঘৃতভর্জ্জিত ও রোগবীজানুবাহী বাসীমাংস ও মাছ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা জলসিক্ত চিড়া, দধি ও কলা ইত্যাদি দিয়া বেশ পুষ্টিকর ভাল খাবারের ব্যবস্থা করিতে পারেন কিম্বা কিছু মুগ বা ছোলা জলে ভিজাইয়া আদা ও লবণ যোগে গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ প্রাকৃতিক খাদ্য যেমন পুষ্টিকর তেমন অভিত খাদ্য বীর্য্য (Vitamine) বহুল বলিয়া ইহারা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। খাদ্যবীর্য্যবিহীন দুষ্পাচ্য লুচি মিষ্টি ইত্যাদি তাঁহারা যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া চলিবেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেক অর্থঅপচয়ও বন্ধ হইবে এবং স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

মোটের উপর এই মৃতপ্রায় জাতিকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে খাদ্য সমস্যার ও স্বাস্থ্য রক্ষার বিধানের দিকে আমাদের এখন বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। জাতিগঠনের ও স্বরাজপ্রতিষ্ঠার ইহাও একটী প্রধান ভিত্তি বলিয়া মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

হিন্দী সাহিত্য

বাঙ্গালীর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। তাহারই গর্ব্বে বাঙ্গালীর চরিত্রে একটা ক্ষুদ্রতা ঢুকিয়াছে। গত এক শতাব্দী ধরিয়া প্রতীচ্যের সভ্যতার দূতরূপে ইংরেজ তাহার ঐশ্বর্য্য-সম্ভার দেখাইয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া আসিয়াছে; প্রতীচ্যের এই স্পর্শে আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া গিয়াছে ইহাই আমাদের ধারণা; ইহার মধ্যে যে কিছু সত্য

আছে সেটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; প্রতীচ্যের স্পর্শে আর এক প্রকারের সঙ্কীর্ণতা আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতীচ্যের দানগ্রাহী হইয়া আমরা ভারতবর্ষের প্রতি অবিচার করিতে বসিয়াছি। হিন্দী ও অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতেছি।

স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে বাঙ্গলার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কথা বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়াছিল। বাঙ্গালী বাঙ্গলার সেবায় কায়মনে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যে রাষ্ট্রীয়বোধ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা প্রাদেশিকতায় অনুরঞ্জিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের অন্তরে যে সত্য জাতীয়তা বোধ আছে, যাহা জাতিধর্ম্ম-প্রদেশবর্ণের অপেক্ষা রাখে না, যাহাতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেরই সাধারণ অধিকার, যাহাতে উদ্বোধনে গুজরাট ও বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও সিংহল এক সঙ্গে মিলিতে পারে, সেই পরম সত্য জাতীয়তাবোধ জাগে নাই। প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য ফুটাইবার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল; অন্তর্প্রাদেশিক সহানুভূতির দিকে আমাদের দৃষ্টি যায় নাই; তাই সকল প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের সমবায় ও ঐক্যে ভারতীয় সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহার কথা আমরা ভুলিয়াগিয়াছিলাম। ফলে মহারাষ্ট্র বাঙ্গলাকে বুঝিতে পারে নাই, অবজ্ঞা করিয়াছে, ঘৃণা করিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডারে পাঞ্জাবের দান বাঙ্গলা বোঝে নাই। তাই বাঙলা ও অন্যান্য প্রদেশের মিলনস্থান ছিল একমাত্র নীরস ব্যর্থ রাষ্ট্রীয় দাবী করিবার সভা। ভারতীয় ঐক্য বোধের এই অভাব দেশপ্রেমিকেরা বুঝিয়াছিলেন কিনা জানি না, যতদূর মনে হয় তাঁহারা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে ভারতের ঐক্যের কথা বুঝিলেও ভারতীয় সভ্যতার ঐক্য, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রদেশের ঐক্য বোঝেন নাই।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রতি বাঙালীর এই অবজ্ঞা বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেয়। যতদিন না আমরা আমাদের এই প্রাদেশিকতার গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া অন্যান্য প্রদেশের ভাষার ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে চেষ্টা করিব ততদিন ভারতীয় সভ্যতার অন্তরের ঐক্য এই কথাটা আমাদের পক্ষে অর্থহীন হইয়া থাকিবে।

পাঞ্জাবকে বুঝিতে হইলে নানক ও অন্যান্য শিখগুরু ভারতকে কি দিয়াছেন বুঝিতে হইবে, পাঞ্জাবের ভাষা, সাহিত্য ধর্ম্ম রীতিনীতি বুঝিতে হইবে। ভারতের সম্পদভাণ্ডারে মহারাষ্ট্রের দান বুঝিতে হইলে, একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মনীষিগণের বাণী বুঝিতে হইবে। আজ দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার একমাত্র উপায় বৈদেশিকগণের লিখিত কয়েকখানি পুস্তক মাত্র, অথচ আমাদের এই প্রতিবেশীগণের পরিচয় আমরা অতি সহজেই লইতে পারি। তাহার জন্য অপরিচিতের সাহায্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নাই।

মধ্যযুগের ভারতের সকল প্রকার আন্দোলনই হিন্দী সাহিত্যের উপর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; সুতরাং অন্ততঃ দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতকে বুঝিতে হইলে হিন্দী-সাহিত্যের আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চদশ শতকের বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত হিন্দীভাষার একটী অত্যন্ত নিকট যোগ আছে; মিথিলার আদি কবিকে আমরা বাঙ্গালী কবি করিয়া লইয়াছি। তখনকার পূর্ব্ব-

হিন্দীর নিকট বাঙ্গলা ভাষা ঋণী; সুতরাং বাঙ্গলার প্রকৃতি বোঝার পক্ষে সে ভাষার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন, শুধু ভাষা নহে, বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসেও ইহার প্রভাব দেখিতে পাই।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস জানিতে হইলে হিন্দী সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক। এই যুগ ভারতের পক্ষে এক অপূর্ব্বযুগ, এক হিসাবে ইহাকে য়ুরোপের রেনাসাঁর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সময়ে হইতে ভারতবর্ষের ইসলামসভ্যতার ও প্রতীচ্যের প্রভাব ধারাবাহিক ভাবে আরম্ভ হয়। এই সময়ে ভারতের চিন্তাজগতে এক বিপ্লব আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। শঙ্করের জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম ভারতের মাটীতে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিল তাহা রামানুজ রামানন্দ বল্লভাচার্য্য শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির চেষ্টায় ভক্তিবৃক্ষে পরিণতি লাভ করিতেছিল। কবির নানক একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছিলেন। চিন্তা ও ধর্ম্মজগতে এই যে বিপ্লব চলিতেছিল তাহার জন্য ভারতের সমাজ ও সাহিত্য বিচিত্ররূপ ধারণ করিতেছিল। এক একজন মহাপুরুষ আসিতেছিলেন, সাহিত্যকে নূতন নূতন রঙ্গে সাজাইয়া যাইতেছিলেন। সেই যুগ হিন্দী সাহিত্যের প্রাদুর্ভাবের যুগ।

হিন্দীই তখন উত্তর ভারতের মুখ্যভাষা ছিল এবং মহারাষ্ট্র ব্যতীত অন্যসকল প্রদেশের (উত্তর ভারতের) ধর্ম্মসংস্কারকগণ হিন্দীতেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবীর তুলসীদাস নানক প্রভৃতি নিজেদের রচনাদ্বারা মুখ্যতঃ হিন্দী সাহিত্যেরই সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি সংস্কারকগণ লৌকিক ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া তখনকার দিনের পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত সংস্কৃতকেই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাহা হয় নাই। কবীর স্পষ্টই বলিয়াছিলেন।

"সংসকিরত হৈ কূপজল
ভাষা বহতা নীর"

সংস্কৃত ও কূপজল ভাষা স্বচ্ছসলিলা গতিশীলা নদী, কূপের জল লইয়া কি করিব? এইখানে কবীর প্রভৃতি মনীষিগণ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহার ধর্ম্মপ্রচারে সংস্কৃতের সহায়তা লইয়াছিলেন তাঁহাদের চেয়ে, অনেক অধিক সুবিধা পাইয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে শঙ্কর প্রভৃতির প্রচারিত মতবাদ সুদৃঢ়ভাবে যে বসিতে পারে নাই আর যেটুকুও বসিয়াছিল তাহাও বিকৃতি-ভাবে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলা যাইতে পারে, সংস্কৃতকে বোঝাইবার জন্য যে টীকাটিপ্পনীর কুজ্‌ঝটিকার সৃষ্টি হইত তাহার মধ্য হইতে সত্যনির্ণয় করা জনসাধারণের পক্ষে শক্তই হইয়া দাঁড়াইত। এই জন্যই তুলসী কবীর প্রভৃতি জনসাধারণের নিকট সত্যশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, শঙ্কর প্রভৃতি তাহার পরিবর্ত্তে অন্ধ বিচার হীন ভক্তি লাভ করিয়াছেন।

অনেক মনে করে পৃথ্বিরাজের মন্ত্রীও বন্ধু চাঁদ (চন্দ্‌ কবি) রচিত পৃথ্বিরাজ রাসোই হিন্দীর আদি বাক্য। তাহার পূর্ব্বে হিন্দীভাষা কথিতভাষা মাত্র ছিল।

আমীর খসরু চাঁদের পরে অতি অল্পদিনের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান,

কিন্তু হিন্দী সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'পহেলিয়ার' ভাষা চাঁদ কবির ভাষা হইতে বহু পরিমার্জ্জিত ও নবীন। এই কারণে কেহ কেহ বলেন চাঁদের পূর্ব্বেও অনেক হিন্দী কবি ছিলেন এবং সেই সময়েই হিন্দীর দুইটী শাখা হয়, একটীর—যেটীর ভাষা বিশেষরূপে উন্নত হয়—প্রতিনিধি চাঁদ এবং অপরটীর প্রতিনিধি আমীর খসরু।

যাহাই হোক হিন্দী সাহিত্য যে অন্ততঃ ছয়শত বৎসরের প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। চাঁদের পরে এই দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ধরিয়া বহু সাহিত্যিক এই সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

বাঙ্গালীদেশের মাটীতে ভক্তি সহজ। বাঙ্গলার আদি কবি প্রেমভক্তির কাহিনী গাহিয়াছেন; এমন কি শ্রীরামের চরিত্র অঙ্কণ করিতে গিয়া বাঙ্গলার কবি তাঁহাকে মুখ্যতঃ অজেয় বীর না করিয়া বাঙ্গলার জলমাটি আবহাওয়ায় মানুষ নাম করিয়া তাঁহার চরিত্রে প্রেমভক্তিই প্রধান করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মহাবীর আমাদের দেশে পূজা পান নাই। আমাদের রামায়ণের মহাবীর মহাভক্ত, ভক্তিই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান। তাই আদি কবি হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সকল কবিরই লেখনীতে প্রেম যেরূপ সহজে ফুটিয়াছে, বীর্য্য তেমনভাবে জমিয়া উঠিতে পারে নাই। মাইকেল বিদেশ হইতে বীররসের আমদানী করিয়াছেন, তাহা খাঁটী বাঙ্গলার জিনিষ নহে; বাঙ্গলার নিজস্ব বাউল, ভাটিয়াল কীর্ত্তন প্রভৃতি চারণগীতি নহে।

হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গলার এইখানে একটী মস্ত বড় পার্থক্য রহিয়াছে। হিন্দী যে সকল প্রদেশের ভাষা সেগুলা পরাধীনতার নাগপাশে সহজে ধরা পড়ে নাই, সে দেশের পুরুষগুলা শেষ পর্য্যন্ত যুঝিয়াছে, হারিয়াছে, ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, মরিয়াছে, যখন কোন উপায় নাই তখন তাহাদের মেয়েরা আগুনে ঝাঁপ দিয়াছে। ভারতের এই সকল প্রদেশের লোক বীর, তাহারা সহজে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেয় নাই। আর ভারতের যত কিছু বহিরাক্রমণ যুদ্ধ বিগ্রহ বিপ্লব পশ্চিম প্রান্তেই হইয়াছিল, পূর্ব্বপ্রান্ত বেশ শান্তিতে, নিশ্চিন্ত সুখে দিন কাটাইতে পারিয়াছিল। কয়েকটী বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া বাঙলার শৌর্য্যচর্চ্চার উদাহরণ পাওয়া যায় না; বিপ্লব বা অরাজকতা বাঙলার মাটীতে বেশীদিন টিঁকে নাই। তাই বাঙলার দুয়ারে যখন শত্রু আসিয়া ডাক দিল তখন বাঙালী অতি সহজেই নির্ব্বিবাদে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে শান্তি ভিক্ষা করিয়া লইল।

পশ্চিম প্রান্তেই বারবার শত্রু আসিয়াছিল, পশ্চিমের প্রদেশগুলি তাই প্রথম যুগে নিশ্চিন্ত ভাবে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার অবসর পায় নাই, যখন পাইয়াছিল তখন হিন্দীতেও প্রেমের কাব্য ভক্তির গাথার সৃষ্টি করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত শান্ত পরবর্ত্তী যুগেও কিন্তু তাহার মধ্যে বীররসের কাব্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

মুসলমানদের ধারাবাহিকরূপে আক্রমণের প্রথম যুগে খৃষ্টিয় দশম একাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে হিন্দীভাষার সংগঠন আরম্ভ হয়। তখনকার কবি তাই প্রেমের কবিতার চেয়েও বীর্য্যের গাথা রচনা করিবার উপাদান পাইয়াছিলেন। হিন্দী আদি কবি তাঁহার কাব্যের নায়করূপে পৃথিরাজকে বরণ করিয়া অমর ভাষায় তাঁহার বীরত্ব কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দীর প্রথম কবি ভাটচারণগণ। হিন্দী সাহিত্যে এই ভাবে বীররস প্রধান্যলাভ করিয়াছিল।

রাসো প্রভৃতি কাব্যগুলি যদিও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লেখা হইয়াছে তথাপি তাহাদের মধ্যে কতখানি ঐতিহাসিকতা প্রামাণিকতা আছে তাহা বলা কঠিন। অধিকাংশস্থলে কবিগণ যে রাজার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাহারই সভাসদ ছিলেন সুতরাং উৎসাহের আতিশয্যে সত্যের অপলাপ হয়ত অনেক সময়েই হইয়াছে। তবে এই সকল কাব্যে সমসাময়িক ভারতের রীতিনীতি ধর্ম্ম সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়।

এইস্থলে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই শ্রেণীর গাথা কবিতা ভাটচারণের মুখে মুখে দেশে দেশে গীত হইত সুতরাং অনেক স্থলেই আদিকবির ভাষা পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও নবীনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা সত্বেও পৃথ্বিরাজ রাসোর ভাষা অতি কঠিন এবং দুর্ব্বোধ্য এবং টীকার সাহায্য ব্যতীত তাহার রসগ্রহণ সম্ভবপর নহে।

চাঁদের পরবর্ত্তীযুগের কবিগণ চাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতকে শারঙ্গধর পদ্ধতির রচয়িতা শারঙ্গধর হামিরের বীরত্ব কাহিনী অবলম্বনে হাম্মীর রাসো, হাম্মীর কাব্য ইত্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পরে যে ভারতবর্ষের পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বীররসের চর্চ্চা কমিয়া যায়, তৎকালীন সাহিত্যেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার পর মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে ভারতবর্ষের আবার যখন স্বাধীনতার প্রচেষ্টা হইল, সেই সময়কার কবি তখন তাহাই অবলম্বনে যে সকল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যেও বীর্য্যের পরিচয় পাই। মধ্যযুগের কবি ভূষণ মতিরাম প্রভৃতি কয়েকজন কবি তৎকালীন ভারতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টার নেতাদের অবলম্বন করিয়া যে কাব্য রচনা করেন তাহা সর্ব্বাংশেই এ শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। শিবাজী তখন দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র জাগ্রতির প্রতিনিধি, ভূষণ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া "শিবরাজভূষণ" ও "শিবা বাবণী" রচনা করেন; শিবাজীর এই প্রচেষ্টার সহকারী পান্নাধিপতি ছত্রসালের চরিত অবলম্বনে 'ছত্রসালদশক, প্রভৃতি খণ্ড কাব্য রচিত হইয়া এই শ্রেণীর কাব্যের সম্মানরক্ষা করিয়াছে। রাণা প্রতাপসিংহের স্বাধীনতাসংগ্রাম অবলম্বনে যে সকল চারণগীতি রচিত হইয়াছিল দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি সাহিত্যে স্থান পায় নাই। ভূষণ মতিরামের পরে বা অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাদের যুদ্ধবর্ণনার স্থান বিশেষে যে বীররস চিত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সেগুলি পূর্ব্বোক্ত কারণে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই; উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে তুলসী দাসের রাম চরিত মানসের লঙ্কাকাণ্ড যুদ্ধবর্ণনা; তাহাতে শব্দচ্ছটা, বর্ণনা বৈচিত্র্য আছে সত্য কিন্তু ভূষণের শিবাজী চরিত্রাঙ্কণের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

মুসলমান আক্রমণের প্রথম যুগের পর যখন ধীরে ধীরে মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, দেশে অরাজকতা বিপ্লব অন্তর্হিত হইল তখন হিন্দী সাহিত্য আবার নূতনরূপ ধারণ করিল। ইহাই হিন্দীর মধ্যযুগ ও সুবর্ণ যুগ। হিন্দীর গ্রিয়ার্সন খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অগষ্টান্ এজ্ (Augustan Age) বলিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথের যুগ বা লাতিন সাহিত্যের অগষ্টান্ যুগের সহিত ইহার তুলনা করিতে পারা যায়। কবীর,

নানক, দাদু, মীরা, তুলসী, সুরদাস, বিহারীলাল, কেশব প্রভৃতি এই যুগের কবি সাহিত্যসাধক। রাজনৈতিক বিপ্লবের অবসান হইয়াছিল ও বাহিরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম ও চিন্তা জগতে তখন একটা বিপ্লব চলিতেছিল।

বৌদ্ধ প্রভাবের শেষাশেষি যখন দেশময় ভোগব্যভিচারের চরম হইয়াছিল তখন তাহার প্রতিবাদ রূপে বর্ণাশ্রমের শেষ আশ্রমটীকে বিশেষ ভাবে বড় করিয়া আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। তাহার ভিত্তি ছিল জ্ঞানের উপর।

কিন্তু জ্ঞান সকলের অধিগম্য নহে এবং শঙ্করাচার্য্য তাঁহার যে অসাধারণ প্রতিভাদ্বারা জ্ঞানমার্গকে সরস করিয়া দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তীকালে সেইরূপ প্রতিভার অভাবে তাহা শুষ্ক নীরস মায়াবাদে ও সন্ন্যাসবাদে পরিণত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের ব্যর্থতার অন্য একটী কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জনসাধারণের মন তখন এই নীরসতা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রেমের ধর্ম্ম আসিল, তাহার পরিণতি একদিকে কবীরের প্রেমরসসিক্ত একেশ্বরবাদ, মিলনপ্রয়াসী জ্ঞানবাদে, অন্যদিকে রামানন্দ বল্লভাচার্য্য শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির ভক্তিরসপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্মে।

মুসলমানগণ তখন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন; সুতরাং তখনকার সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতে তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রভাব আরম্ভ হইয়াছিল। কবীরের প্রচারিত মতবাদ সুফীগণের নিকট কতখানি ঋণী তাহা বিচার করিবার বিষয়।

কবীর যে ব্রহ্মের কথা প্রচার করিলেন তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, তাঁহার নিকট হিন্দুমুসলমানে ভেদ নাই, তিনি অনন্ত প্রেমের আধার। কবীর প্রাদেশিকতায় বদ্ধ হন নাই; তৎপ্রচারিত পন্থা ভারতপন্থা নামে পরিচিত। ভাষা হিসাবে কবীরের ভাষা খুব পরিমার্জ্জিত নহে, কিন্তু ভাবসম্পদে তাহা পরিপূর্ণ। তাঁহার ভাষায় মুসলমানদের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কবীরের বাণী সম্পাদিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

নানক যখন ধর্ম্মপ্রচার করেন তখন বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছেন। তাই নানকের ধর্ম্মে জাতীয়ভাবের পরিচয় পাই। একহিসাবে তাঁহার ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিবাদ। রাজশক্তি যখন ইসলাম অবলম্বন করিয়াছিল, তখন লোভে ও স্বীয় নষ্টপ্রায় কলুষিত ধর্ম্মে আস্থা হারাইয়া হিন্দুগণের মন স্বভাবতই ইসলামের দিকে গিয়াছিল, তবে ইহার আরও অন্য কারণ ছিল। নানক দেশকে পরম দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি দিবার জন্যই যেন শিখ-ধর্ম্মের প্রচার করেন। শিখ শব্দ শাস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাঁহার ধর্ম্মে প্রেমের বিশেষ স্থান নাই। নানক প্রাচীন পশ্চিমী হিন্দী ভাষায় রচনা করেন। তাঁহার রচনা বাহুল্যবর্জ্জিত, সংযত। তাঁহার সময়ে গুরুমুখীর সৃষ্টি হয়; তাঁহার ভাষার প্রাদেশিকতা ও পারসী ভাষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী শিখগুরুগণের অনেকেরই রচনা হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। অর্জ্জুন, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি হিন্দীভাষাতেও রচনা করিয়াছিলেন। শিখদের আদিগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেবে' বহু প্রাচীন হিন্দী সাধক কবিগণের বাণী সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহার অধিকাংশই প্রাচীন হিন্দীতে রচিত।

এইস্থলে হিন্দীর ভাষার বিভিন্ন রূপগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। উত্তরভারতের এক বাংলা ও উড়িষ্যা ছাড়া অন্যসর্বত্রই কোন না কোন রূপে হিন্দী প্রচারিত। পাঞ্জাবের গুরুমুখীকে মুখ্যতঃ হিন্দীরই কন্যা বলা যাইতে পারে; গুজরাতীর সৃষ্টিও ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে। গুজরাতের আদি কবিগণের লেখা প্রাচীন হিন্দী হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে এগুলি সকলই বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পশ্চিমে মাড়বাড়ী, পূর্ব্বে মৈথিলী, দক্ষিণে ছত্রিশগড়ী ও বুন্দেলী এগুলিকেও হিন্দীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা মূলতঃ দুইটী dialect অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমটী ব্রজভাষা ও পূর্ব্ব হিন্দী (কাশী প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ভাষা); দ্বিতীয়টী পরে খড়ী বোলীনামে পরিচিত হইয়াছে। মধ্যযুগের হিন্দী কবিতাগুলি সাধারণতঃ ব্রজভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তাহার কারণ এইকালের হিন্দী সাহিত্যের পরিণতি বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া লইয়াছিল এবং মথুরা ছিল সেই ধর্ম্মের কেন্দ্র মথুরা ও বৃন্দাবন বৈষ্ণবের পরমতীর্থ; শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। সুতরাং সেই প্রদেশের ভাষায় যে এই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই, তাহা ছাড়া ব্রজভাষার পক্ষে কবিগণের বাহন হইবার অন্য একটী বিশেষ কারণও ছিল; ব্রজভাষা ব্যাকরণের নিয়মাবলীর নাগপাশে ততটা বদ্ধ নহে; সুতরাং ব্রজভাষার সহায়তায় কবিগণ ভাষাহিসাবে যথেষ্ট নিরঙ্কুশতা লাভ করিয়াছিলেন।

এই কারণেই খড়ী বোলির কবি বিশেষ দেখা যায় না; ব্যাকরণনিগড়ে পদে পদে ব্যাহত হইয়া তাহা কবিকুলের বিভীষিকার কারণ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ব্রজভাষার একটী স্বাভাবিক মাধুর্য্য আছে। হাথরস্, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসিগণের কথা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। সুরদাস মীরাবাই প্রভৃতির কবিতা ব্রজভাষার ভূষণ।

এই যুগের মুসলমানগণও হিন্দী সাহিত্যের আদর করিতেন। তাহার প্রমাণ প্রথম যুগের আমীর খসরু, কুতবন সেখ ও পরবর্ত্তী যুগে মালিক মহম্মদ জ্যায়সী, রসখান্ প্রভৃতির রচনা। খসরুর 'পহেলিয়া' (প্রহেলিকা) হিন্দি সাহিত্যে বিখ্যাত। জ্যায়সীর পদ্মাবত রূপকচ্ছলে মনোরম প্রেমের কাহিনী; রসখানের বৈষ্ণব কবিতাগুলি বৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তু ও মুসলমানের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ হইয়া আছে।

মুসলমান শাসনের প্রথম আমলে হিন্দী সাহিত্য নানাভাবে রাজদরবারের অনুগ্রহলাভ করিয়াছিল। সাহজহাঁর সময়ে উর্দ্দুভাষার সৃষ্টি হয়; তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দী সাহিত্য নানা মুসলমান কবির রচনায় পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আকবর স্বয়ং সুকবি ছিলেন, এবং হিন্দী সাহিত্যের রসগ্রাহী ছিলেন। আকবররায়ের ছদ্মনামে রচিত তাঁহার কবিতা এখনও পাওয়া যায়। তাঁহার রাজসভায় বহু হিন্দী কবি আসন পাইয়াছিলেন। হাস্যরসিক বীরবলের রচিত গল্প এখনও হিন্দীতে প্রচলিত আছে। সভানায়ক তানসেনের রচিত বহু পদ এখনও পাওয়া যায়। আকবরের সভাসদ আবদর রহিম খানখানা নিজেই বহু কবির পৃষ্টপোষক ছিলেন। কথিত আছে তিনি বিহারীলালের প্রত্যেক দোঁহার জন্য এক একশত মোহর দিতেন। তৎরচিত নীতিবিষয়ক দোঁহাগুলি হিন্দী সাহিত্যে আদর

লাভ করিয়াছে। আকবরের দরবারের গংগ কবির খুব কম পদই এখন পাওয়া যায় কিন্তু ভিখারীদাসের মতে তিনি তুলসীদাসের সমকক্ষ ছিলেন। এইরূপে চিত হরিবংশ গংগ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবির কত রচনাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এককালে যাহা শত শত লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিত আজ তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু

কবিতার স্বরূপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কবিতার উদ্দেশ্য আছে আর একটা, যেটা অনেকে জানেন, অনেকে মানেন না; অনেকে বলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কবিতার উদ্দেশ্য। আর্টের জন্যই আর্টের অস্তিত্ব, আর্টের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহা নয়, আর্টের উদ্দেশ্য মহান, তাহা শিক্ষাদান। এই শ্রেণীর কলাবিদ্‌রা বলিয়াছেন যে কবি শুধু কবি নন, তিনি আচার্য্যও বটেন। যাঁহারা পূর্ব্বমত পোষণ করেন তাঁহারা বলেন "শিক্ষা-পূর্ণ কবিতা" এই কথাটাতেই পরস্পরবিরোধী ভাবের সমাবেশ। শিক্ষা দিবে দর্শন, আনন্দ দিবে কবিতা।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে কাব্যরাজ্যের অমর সৃষ্টিগুলি শুধু আনন্দ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। সেই আনন্দ দান অতি সূক্ষ্ম, পরোক্ষ ও নিগূঢ় ভাবে মানুষের চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে নূতন রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন। জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই আনন্দদানের ভিতর দিয়া শিক্ষা দেন। কবির এক উদ্দেশ্য আনন্দ দান, কলার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া। আর এক উদ্দেশ্য জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর তাহাদের প্রধান দ্বন্দ্বগুলির সমস্যা পূরণ করিয়া জীবনকে রসময় করিয়া তোলা। এবং ইহাই তাঁহার শিক্ষাদান। কবি গাহিয়া যান ছন্দে, তালে, আপনহারা হইয়া; তিনি নিজের কল্পনা ও ভাবের তীব্র আলোকে সর্ব্বদা নিজেকে লুকাইয়া রাখেন; তাই আমরা কবির কাব্যকে পাই, কবিকে পাই না। কিন্তু কবি সেই গানের ভিতর দিয়াই সমস্যা পূরণ করেন, লোকশিক্ষা দেন কিন্তু জানিতে দেন না। দর্শনের সহিত কবিতার এই খানেই প্রভেদ। দর্শন শিক্ষা দেয় প্রত্যক্ষভাবে যুক্তির ভিতর দিয়া। কবিতা শিক্ষা দেয় পরোক্ষ ভাবে আনন্দের ভিতর দিয়া। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কবিতার ভিতর অনেক সময় আমরা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের একটা চেষ্টা দেখিতে পাই। সে জন্য ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থকে অনেক সময় ধর্ম্মযাজক বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে কবি শেলি এমন সমস্ত মহান্ সত্য মানবজাতির সম্মুখে ধরিয়াছেন যে তাহাদের তুলনা নাই। কিন্তু সে শিক্ষার উপর তাঁহার কবিত্বের সোনার কাঠির পরশ লাগিয়াছে। কল্পনার রঙিন্ জালটী তাঁহার কবিতাকে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই শেলির কবিতা সর্ব্বদাই রঙীন্ ও কল্পনাময়। তাই তাঁহার কবিতার অবাধ গতি, অনন্ত ঝঙ্কার, অফুরন্ত গান, অপ্রতিহত ধ্বনি!

রবীন্দ্রনাথের ভিতর এইরূপ "আর্ট" ও আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা দান আছে।

সময়ে সময়ে কবিতার পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্যের ভিতর ও আর্টের উৎকর্ষ সাধনের মধ্যে এই শিক্ষণীয় বিষয়টি এমন নিগূঢ়ভাবে লুকাইয়া আছে যে প্রথমে আমাদের কবিতার আর্টই মুগ্ধ করে। কিন্তু গভীর চিন্তার পর যখন আমরা ভাবময় কবির অন্তরের গোপন কথাটির সন্ধান পাই তখন আমরা অমিয়নির্ঝর আবিষ্কার করার মত এতটা পুলক অনুভব করি। প্রবীণ সাহিত্যিকের এই বিশেষতাটুকু তাঁহার পরিণত বয়সের রচনার ভিতর বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। "বলাকার" কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের রত্নরাজি বলিলেও চলে। প্রতি কবিতার ভিতর কবি একটা "মিষ্টিক" ভাবের ভিতর দিয়া পাঠককে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। নূতন যুগের নূতন আলোর সন্ধান বলিতেছেন আর উত্তেজনার উন্মাদনায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। দুর্দ্দিনের দুর্দ্দশাকে মানবের মত, বীরের মত আহ্বান করিতে হইবে। পুরাতনকে ধ্বংশ করিয়া নূতনকে সিংহাসনে বসাইতে হইবে তাই কবি বলিতেছেন

দূর হতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জ্জন ?
ওরে দীন ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল।
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

কবিতা জীবনকে বুঝাইতে চায়। জীবনের জটিল রহস্যের সমাধান করিতে চায়। জীবনকে নূতন ভাবে, নূতন আলোকের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চায়। কিন্তু তাহা বুঝায় ভাব ও কল্পনার ভিতর দিয়া, সৌন্দর্য্য বিকাশের মধ্যে।

কবিতা হৃদয়কে স্পর্শ করে। মর্ম্মস্পর্শী বলিয়াই কবিতার আদর। এই যে মর্ম্মস্পর্শ করিবার ক্ষমতা ইহা কবিতা পায় কোথা হইতে? ইহা প্রধানতঃ আসে ছন্দের ভিতর দিয়া, ছন্দ আনে ঝঙ্কার, ছন্দ আনে গতি ও লীলা, ছন্দ আনে মনভোলান সুর। এই জন্যই গদ্য অপেক্ষা কবিতা এত আদরের। বিশ্বসাহিত্যের আদিম ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে কবিতা গদ্য অপেক্ষা বহুপূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। গদ্য যখন মানবমস্তিষ্কের চিন্তার মধ্যেও স্থান পায় নাই তখন বেদের সামগান, আবেস্তার স্তোত্রপাঠ চলিতেছে; প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে অর্দ্ধসভ্য টিউটন্ ও অ্যাংগ্লোস্যাক্সনদের ভিতর "বিউলফ্"এর বীরত্বগাথা রাজসভায় গীত হইতেছে। কারণ এই যে মানব-মন শীঘ্র মুগ্ধ হয়, শব্দের ঝঙ্কারে, ভাষার মাধুর্য্যে ও ছন্দে। ভাবকে লীলায়িত করে ছন্দ। এইবার প্রশ্ন আসিতে পারে যে, ছন্দ আদবেই প্রয়োজনীয় কিনা। যদি ঝঙ্কার ও গতিই ছন্দের প্রাণ হয় এবং সেই ঝঙ্কার ও গতিই যদি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে গদ্যেও ত সেই ঝঙ্কার, উন্মাদনা ও গতি আনিতে পারা যায়। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক ও কবি কোলরিজ ছন্দ যে কবিতার অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি খুব জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে অতি উচ্চ অঙ্গের কবিতাও ছন্দ ব্যতীত সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি প্লেটো, জেরিমি টেলার প্রভৃতির রচনা দেখাইয়াছেন। এই ভাবের সমলোচকদের সমালোচনার মূল কথাটা এই—

কবিতার প্রাণ ভাব ও কল্পনা, ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি, এইগুলি যদি কোন একটী সাহিত্য বস্তুর ভিতর বেশীমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে তাহাকেই কবিতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ছন্দবহুল কবিতা অস্বাভাবিক হয়, তাহাতে স্বাভাবিক লীলা থাকে না। তাহাতে লেখকের বা কবির ছন্দের দিকেই বেশী ঝোঁক থাকে, ভাবের উপর জোর চলিয়া যায়। শেষে শব্দের ঝঙ্কারই কবিত্ব মনে হয়। কবিত্ব জিনিষটা অতি উচ্চ। তাহাতে শব্দ ঝঙ্কারের সম্বন্ধ অতি সামান্য। তাহা না থাকিলে বা ছন্দ পতন হইলেও কবিতা কবিত্ব হারায় না। এমন অনেক সমালোচক আছেন যাঁহারা কবিতার সমালোচনা করেন ছন্দের দিক দিয়া। আরম্ভ করেন ছন্দ পতন হইয়াছে বলিয়া। আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা দেখেন ভাব ও কল্পনা; অতি মধুর ছন্দ থাকিলেও তাঁহারা তাহাকে 'কবিতা' আখ্যা দেন না, 'ছড়া'র মধ্যে ফেলেন। অনেক সময় মেয়েলি ছড়ার মধ্যে বেশ ঝঙ্কারময় ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমালোচকদের মতে জগতে পদ্যকাব্যও বিরল নয়। এমন কি ইংরাজী সাহিত্যে এমন কয়েকজন আছেন (ডিকুইন্সি, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি) যাঁহারা ছন্দ পর্য্যন্ত গদ্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া ছন্দকে নির্ব্বাসিত করা যায় না, কবিতার রাজ্য হইতে। গদ্যে গীতিমাধুর্য্যের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু কবিতার গীতিমাধুর্য্য এবং ভাবকল্পনার সমাবেশ সমভাবেই প্রয়োজন। গীতের ঝঙ্কার না থাকিলে কবিতা মর্ম্মস্পর্শী হয় না। ছন্দ না থাকিলে কবিতা চলিতে পারে না। ঝঙ্কার ও গতি কবিতাকে গদ্য হইতে পৃথক করিয়া দেয়। বনভূমির মধ্যে, পাহাড়ের গা বাহিয়া, অবাধ ঝঙ্কারে ঝরিয়া পড়া ঝর্ণার মত কবিতা অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া যাইতে চায়, কোথাও বাধা পাইতে চায় না। কাজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে গদ্যে ভাব, কল্পনা ও ভাব প্রবণতা সমভাবেই বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে **"কবিত্বপূর্ণ"** বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে **"কবিতা"** বলা যাইতে পারে না। কবিতার ভাষায় একটা ঝঙ্কারময় বিশেষত্ব থাকা চাই।

কবিতার ছন্দের আরও একটা সার্থকতা আছে। ছন্দের মাধুরীর সঙ্গে সঙ্গেই কবিতার সৌন্দর্য্যও বাড়াইয়া তুলে। "উর্ব্বশীর" মত ছন্দ না হইলে আমরা উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য অত নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠা রূপসীর বর্ণনা যদি তরল "ত্রিপদী"তে হইতে তাহা হইলে কবিতার সৌন্দর্য্য ত বর্দ্ধিত হইতই না, রূপসীকে মানস চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিতাম না হয়ত। তাই "উর্ব্বশী" পড়িয়া অবাক হই; তাই কীট্‌সের "সাইকির প্রতি" কবিতার মধ্যে ছন্দের অপরূপ লীলার ভিতর সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। 'ছন্দ' কবিত্বভাব প্রকাশের প্রধান সহায়; তাই কবিত্ব যতই প্রগাঢ় হইতে থাকে ছন্দ ততই মধুর এবং বিশেষত্বপূর্ণ হইয়া অশ্রান্ত সুরে ঝরিয়া পড়ে।

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] কার্ত্তিক, ১৩৩১ [৭ম সংখ্যা

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(১১)

'দেবী চৌধুরাণী' 'আনন্দমঠে'র দুই বৎসর পরে (১৮৮৫) প্রকাশিত হয়, এবং আনন্দমঠের ন্যায় ইহাতেও একদল doctrinaire বা উচ্চ-আদর্শ-অনুপ্রাণিত দস্যুর অবতারণা হইয়াছে। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'র উপাখ্যানের মধ্যে অসাধারণত্বের ঈষৎ স্পর্শ থাকিলেও, ইহাতে বাস্তবতারই প্রাধান্য, ইহার মধ্যে অলৌকিক উপাদান যাহা আছে, তাহা আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত সহজেই মিশিতে পারে, আমাদের অভিজ্ঞতার বা দেশের বাস্তব অবস্থার বিরোধী নহে। ভবানী পাঠক সত্যানন্দের ন্যায় অতিমানব মহাপুরুষের স্তরে উন্নীত হন নাই; প্রফুল্লের নিষ্কামধর্ম্মশিক্ষার মধ্যে যাহা কিছু অবাস্তবতা আছে, তাহা সমগ্র উপন্যাসটীর উপর ছায়াপাত করিতে পারে নাই, ও ইহার বাস্তবতার সুরটী ঢাকিয়া ফেলে নাই। আমাদের সামাজিক জীবনের সহজপ্রীতি-পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র-বিরোধ বিড়ম্বিত চিত্রটীই ইহার অধিকাংশ ব্যাপিয়া আছে। গ্রন্থশেষে কঠোর বৈরাগ্য ও দেশহিতব্রতের উপর গার্হস্থ্যধর্ম্মেরই জয় বিঘোষিত হইয়াছে। দেবী চৌধুরাণী তাহার সমস্ত রাণীগিরির ঐশ্বর্য্য ও দেশের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রীর উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া, আবার গৃহধর্ম্মপালনের জন্য হরবল্লভের সঙ্কীর্ণ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার নিষ্কামধর্ম্মের শিক্ষা দীক্ষা এই নূতন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে পরমসার্থকতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিল। বৈকুণ্ঠেশ্বর ও ব্রজেশ্বরের মধ্যে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাতে ব্রজেশ্বরই জয় লাভ করিল; বৈকুণ্ঠেশ্বর তাঁহার বিরাট সত্ত্বা সঙ্কুচিত করিয়া ব্রজেশ্বরের পশ্চাতে আত্মগোপন করিলেন, এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ রমণীহৃদয়ের যে দেবদুর্ল্লভ প্রেম ও ভক্তি উপহার পাইলেন, তাহাতে বোধ করি তাঁহার ক্ষোভের কোন কারণ থাকিল না। 'দেবী চৌধুরাণী'র আরম্ভ একেবারে সম্পূর্ণ বাস্তব; সামাজিক কারণে নিরপরাধিনী স্ত্রীর পরিত্যাগ, আধুনিক বাস্তবতা-প্রধান লেখকলেখিকাদের বিশেষ প্রিয় ও নিতান্ত সাধারণ বিষয়; কিন্তু ইঁহারা যেমন এই বিষয়ের মধ্য দিয়া সামাজিক অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া ধরেন, বঙ্কিম তাহা করেন নাই; তিনি সমস্ত বিষয়টীকে

একটী গোপন প্রেম ও নিগূঢ় সহানুভূতির ধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়াছেন। আমাদের হিন্দু সমাজে একটী স্বাভাবিক সংযম, ভক্তিশীলতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য বিদ্রোহের খুব তীব্র আত্মপ্রকাশ বড় একটা হইতে পায় না—সে একটা গোপন ক্ষোভের মতই বক্ষঃতলে নিরুদ্ধ থাকে। অবশ্য এই প্রতিরুদ্ধ ভাবের প্রভাব আমাদের জীবনের পক্ষে যে সর্ব্বদা হিতকর বা প্রকৃত পৌরুষ-বিকাশের পক্ষে অনুকূল, তাহা বলা যায় না, অনেক সময় দুই পরস্পর বিরোধী কর্ত্তব্যের মধ্যে যেটা আমরা বাছিয়া লই, তাহা কাপুরুষোচিত নির্ব্বাচনই হইয়া দাঁড়ায়, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস ও মনের বল আমাদের থাকে না বলিয়াই আমরা সহজের বাঁধা রাস্তাটাই অবলম্বন করিয়া ফেলি। এই সব চরিত্র আর্টের দিক্ দিয়াও খুব সার্থক হইয়া উঠে না; সামাজিক ব্যবস্থার দাসসুলভ অনুবর্ত্তিতা তাহাদিগকে আর্টের দিক্ দিয়াও ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিত ও বর্ণলেশশূন্য করিয়া ফেলে। বঙ্কিম ব্রজেশ্বরের চরিত্রে এই সমস্ত দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রেম ও পিতৃভক্তির একটী সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন, তাহাকে একদিকে উদ্ধত অবিনয় ও অপর দিকে নিষ্ঠুর হৃদয়-হীনতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। স্কটের উপন্যাসসমূহের প্রায় সমস্তগুলিতেই নায়কের চরিত্র নীরস ও বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে, স্কট তাহাকে সর্ব্বগুণোপেত করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় তাহার মধ্যে প্রাণের ধারা মন্দীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার হৃদয়ের গভীর স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে তিনি ব্রজেশ্বরকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিয়াও তাহাকে ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলেন নাই। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে আমাদের বাঙ্গালী সমাজের কতকগুলি বিশেষত্বই ব্রজেশ্বরের চরিত্রকে একটা বৈশিষ্ট দিয়াছে, ও তাহাকে স্কটের নায়ক হইতে পৃথক করিয়াছে। প্রথমতঃ তাহার বহুপত্নীকত্ব —সাগরবৌ, নয়ান বৌ, ও প্রফুল্লের সহিত তাহার ব্যবহারের বিভিন্নতা, ও তাহার দাম্পত্য ব্যাপার সম্বন্ধে ব্রহ্মঠাকুরাণীর সহিত সরস কথোপকথন ও পরিহাসকুশলতা তাহাকে আদর্শ নায়কের রক্তমাংসহীন অশরীরি অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছে। যাহাকে একাধিক স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হয়, এবং সে বিষয় লইয়া ঠানদিদির সহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ আলোচনা চালাইতে হয়, তাহার চারিদিকে একটা লঘু-তরল হাস্যরসের আবেষ্টন সৃষ্টি হয়; এবং সেই জন্যই আদর্শ-নায়কের অবাস্তবতার ছায়া তাহার গায়ে লাগিতে পায় না। প্রফুল্লের সহিত তাহার ব্যবহারের মধ্যেও একটা সংযত অথচ গভীর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা সর্ব্বপ্রকারে নাটকীয় উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য-বর্জ্জিত; বিশেষতঃ এই বিষয়ে তাহার সহজ, সরল কথাবার্ত্তা স্কটের নায়কদের গুরুগম্ভীর সাড়ম্বর বাক্যবিন্যাসের অপেক্ষা গভীরভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিক উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই; আবার দশবৎসর বিচ্ছেদের পরে প্রফুল্লকে চিনিবার পরে তাহার দস্যুবৃত্তির প্রতি ঘৃণা ও তাহার প্রতি উদ্বেল প্রেমের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দ্বটুকু তাহার বাস্তবতা বাড়াইয়া দিয়াছে। ব্রজেশ্বরের শ্বশুরবাড়ী হইতে রাগ করিয়া চলিয়া আসা, ও সাগরের প্রতি দুর্জ্জয় অভিমান; বজরাতে ডাকাইতির সময় তাহার নির্ভীক, সপ্রতিভ ভাব, ও দেবীচৌধুরাণীর বজরাতে বন্দীভাবে নীত হইবার পর দেবীর সহচরীদের হাতে তাহার দুরবস্থা—এই সমস্তই তাহাকে আদর্শ-

লোক হইতে নামাইয়া বাস্তব জগতের আসনে দৃঢ়তর করিয়া বসাইয়াছে, ও তাহার সহিত পাঠকের একটা মধুর-প্রীতিপূর্ণ সখ্যভাব স্থাপন করিয়াছে। আবার প্রবল, অপ্রতিরোধনীয় প্রেমের মধ্যে পিতৃভক্তির অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা রক্ষা, প্রফুল্লকে পাইবার লোভেও পিতার সহিত জুয়াচুরি করিতে অস্বীকার করা, তাহার চরিত্রের উপর একটা দৃপ্ত পৌরুষের উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। মোটের উপর ব্রজেশ্বর উপন্যাসজগতের চরিত্রদের মধ্যে একটী বিশেষ সজীব সৃষ্টি। স্কটের নায়কেরা প্রায়ই রোমান্স জগতের জীব, সুতরাং প্রকৃত জগতে পদার্পণ করিয়াও তাহারা সম্পূর্ণ সজীবতা লাভ করিতে পারে না; ব্রজেশ্বর আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশী, দুই একটী অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হইয়াও তাহার বাস্তবতার কোন হানি হয় নাই

অবশ্য গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ দুর্ব্বলতা ব্রজেশ্বরকে লইয়া নয়, প্রফুল্লকে লইয়া, এবং প্রফুল্লের প্রতি গ্রন্থকার যে অসাধারণত্বের আরোপ করিয়াছেন, তাহাই উপন্যাসটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিচারবিতর্কের বিষয়। অধিকাংশ সমালোচকই গ্রন্থের এই অংশটুকু একটু বিস্ময়মিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন, যেন এইখানে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ-প্রচারক বঙ্কিমের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ৺পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ধর্ম্মতত্ত্বের উপর আদিরসের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় দেখিয়াছেন, গ্রন্থকার প্রফুল্লকে নিষ্কাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, দশ বৎসর বনে জঙ্গলে দস্যুদলের সহিত ঘুরাইয়া, শেষে আবার তাহাকে হরবল্লভের অন্তঃপুরে আত্মগোপন করিতে পাঠাইয়াছেন; এই পরিণতির জন্য শিক্ষা-দীক্ষার এত সুদীর্ঘ আড়ম্বরের বা পাঠকের নিকট খুব উচ্চকণ্ঠে এই শিক্ষার মাহাত্ম্য-বিজ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবিক এই সমস্ত সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সত্য আছে, এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে উপন্যাসটীর মধ্যে পর্ব্বতের মূষিকপ্রসবের ন্যায় একটা হাস্যজনক অসঙ্গতি আছে। কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে বঙ্কিমের অপরাধ তত গুরুতর বলিয়া মনে হইবে না। প্রফুল্লের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটী গ্রন্থের উপর ধর্ম্মতত্ত্বের একটা বাহ্য প্রলেপ মাত্র, ইহার প্রভাব কেন্দ্র-স্তর পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে নাই। এই নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রফুল্লের প্রকৃত চরিত্রকে অভিভূত করিতে পারে নাই, তাহার প্রেমোন্মুখ সুকোমল নারীহৃদয়ের উপর কোন বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করে নাই। ইহার প্রবল আক্রমণের মধ্যেও তাহার রমণীসুলভ মাধুর্য্য ও উদ্বেল স্বামিভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল—শিক্ষাকালের মধ্যে একাদশীতে মাছ খাওয়ার নিষেধে অবাধ্যতার দ্বারা এই অনিবার্য্য প্রেম প্রাবল্যের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রফুল্লের প্রকৃতি কোথাও এই গুরুভার দীক্ষার চাপে বাঁকিয়া চুরিয়া যায় নাই, শারদাকাশে লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায়ই ইহাকে অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছে, তাহার চরিত্র কোথাও পৌরুষ বা স্পর্দ্ধাযুক্ত হয় নাই; মধ্যে মধ্যে এক একটা দার্শনিক সূত্রের বিচারসত্ত্বেও কোথাও পাণ্ডিত্যবিড়ম্বিত হয় নাই, গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে তাহাকে আদর্শবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তরে, ভগবানের অবতারপদে, উন্নীত করিলেও, পাঠকের কল্পনা ও সহানুভূতি এরূপ ভীতিজনক পরিণতিতে কখনও সায় দিতে চাহে না, প্রফুল্লকে আমরা বরাবরই

স্বামি-প্রেম-বিহ্বলা আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর মতই দেখি, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কোন আদর্শের সহিত তাহার সম্বন্ধ আমাদের রসানুভূতিকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে না। সুতরাং যদিও প্রথম দৃষ্টিতে, একটা বাহ্য বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া ঔপন্যাসিক ধর্ম্মতত্ত্ববিদের নিকট আত্ম-সমর্পন করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দ্বন্দ্বে ঔপন্যাসিকেরই জয় হইয়াছে; কলাকৌশলের দিক্ দিয়া ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হইতে পায় নাই।

প্রফুল্লচরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাহার নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষা তাহাকে কখনও সন্ন্যাসের দিকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করে নাই। এই বিষয়ে সীতার'মের শ্রী চরিত্রের সহিত তাহার প্রভেদ। স্বামির সহিত বিচ্ছেদের পরে শ্রীর চরিত্র যেমন জয়ন্তীর প্রভাবে রমণীসুলভ মাধুর্য্য হারাইয়া এক শুষ্ক কঠোর আসক্তি-লেশশূন্য নিষ্কামধর্ম্মের মরু-বালুকার মধ্যে নিজ স্নেহ-প্রেমের শীতল ধারাকে প্রোথিত করিয়া দিয়াছিল, নিষ্কাম-ধর্ম্ম-দীক্ষিতা প্রফুল্লের চরিত্রে নিশির সাহায্য-ফলেও তাহা হইতে পায় নাই। বাস্তবিক জয়ন্তীর মধ্যে যেমন একটা শিক্ষয়িত্রীর পরুষ ভাব ও আত্ম-প্রাধান্য-মূলক গর্ব্বের রেশ আছে, নিশি-চরিত্রে তাহার অনুরূপ কিছুই নাই; নিশির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারকের সঙ্কীর্ণতা কিছু দেখিতে পাই না। সখীর সমবেদনা তাহাকে প্রফুল্লের সুখ-দুঃখ-ভাগিনী করিয়া তুলিয়াছে; সে প্রথম হইতেই প্রফুল্লের অক্ষুণ্ণ স্বামিপ্রেম দেখিয়া তাহার সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করিয়া লইয়াছে, প্রেমের প্রাকার-মূলে বেদান্তের dynamite লাগাইবার কোন চেষ্টা করে নাই; বরঞ্চ নিজেকে বেদান্ত-ধর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতই সর্ব্বান্তঃকরণে সখীর প্রেমের দৌত্য-কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় নিশি জয়ন্তী অপেক্ষা গ্রন্থকারের অধিক স্নেহভাজন হইয়াছে; জয়ন্তীর গুরুগিরির জন্যই তিনি তাহার বিরুদ্ধে একটা গূঢ় প্রতিশোধ লইতে ছাড়েন নাই, সন্ন্যাসিনীর গৈরিক-বস্ত্রের নীচে একটা স্বভাবদুর্ব্বল, লজ্জাসঙ্কুচিত নারীহৃদয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে বেশ যথেষ্ট রকমই অপ্রতিভ করিয়াছেন; আর নিশি-দিবার নিকট যে চেলা কাঠের উপঢৌকন দিয়া বিদায় লইয়াছেন, তাহার অন্তরালে তাঁহার সহজ স্নেহ ও কৌতুকমণ্ডিত প্রীতিরই পরিচয় নাই।

গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রগুলি বিশেষ আলোচনা-যোগ্য নহে। নিশি চরিত্রের আংশিক অবাস্তবতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব এক প্রবন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী, সাগর-বৌ, নয়ান-বৌ, ব্রজেশ্বরের মাতা সকলেই সজীব চরিত্র, দুই একটী স্বল্প-রেখাতেই তাহাদের বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবানী পাঠক, আদর্শ বাদের বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়াও, বাস্তবতা হারায় নাই; প্রফুল্লের প্রতি তাহার অপ্রত্যাশিত সস্নেহ ব্যবহার ও তাহাকে নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষা-প্রদান, একটু অসাধারণ হইলেও আমাদের বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে না। উপন্যাসটির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র হরবল্লভের। হরবল্লভের কঠোর বৈষয়িকতা ও নির্ম্মম সমাজানু-বর্ত্তিতা, মিথ্যাঅপবাদকলঙ্কিতা পুত্রবধূর নির্দ্দয় প্রত্যাখ্যান ও তাহার সকরুণ অনুরোধের হৃদয়হীন উত্তর—আমাদের বাঙ্গালী পরিবারের একটী সুপরিচিত শ্রেণীর (type) কথা মনে করাইয়া দেয়; কিন্তু দেবী চৌধুরাণীর প্রতি তাহার অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতা, ও দেবীর

নিকট বন্দী হইবার পর তাহার নিতান্ত হেয় কাপুরুষতা তাহাকে সাধারণ সঙ্কীর্ণমনা বাঙ্গালী গৃহকর্ত্তার শ্রেণী হইতে বিভিন্ন করিয়া চরম দুর্ব্বৃত্ততার অতল গহ্বরে নামাইয়া দিয়াছে ও ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিকে আরও কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছে। অথবা এই হরবল্লভের উপর গ্রন্থকারের যথেষ্ট আবজ্ঞার সহিত অনেকটা অনুকম্পার ভাবও মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার আত্মাবমানার গভীরতাই তাহাকে আমাদের ঘৃণা হইতে রক্ষা করিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে।

প্রকৃতিবর্ণনাতেও বঙ্কিম নিজ কবিজনোচিত অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। চন্দ্রালোকে বর্ষা-স্ফীতা ত্রিস্রোতার চিত্র খুব উচ্চ অঙ্গের বর্ণনাশক্তির নিদর্শন, কিন্তু ইহা কেবল বর্ণনা-শক্তির পরিচয় দেয় না, ইহাতে মানবমনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির একটা গূঢ় অন্তরঙ্গ সহানুভূতির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। দেবীর উদ্বেল প্রেমোন্মুখ হৃদয়ের সহিত এই অন্ধকারমিশ্র চন্দ্রালোকের তলে প্রবাহিতা বেগবতী নদীর একটী সুন্দর সুসঙ্গতি ও নিগূঢ় ভাব গত যোগ রহিয়াছে। বঙ্কিমের প্রকৃতিবর্ণনা কেবল বহিঃসৌন্দর্য্যের নিপুণ সমাবেশমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই, বহিঃসৌন্দর্য্যের পশ্চাতে যে ভাবের ব্যঞ্জনা রসগ্রাহী দর্শকের মনের সহিত একটা গূঢ় ঐক্য স্থাপন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে বঙ্কিম তাহাকে অন্তরাল হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন, ও প্রকৃত কবির ন্যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অবশ্য গ্রন্থের অসাধারণ ঘটনাগুলি যে সম্ভাবনীয়তার দিক্ হইতে সর্ব্বত্র প্রমাদশূন্য হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রফুল্লের অতর্কিত অন্তর্দ্ধান যে ভাবে তাহার মৃত্যু সংবাদে রূপান্তরিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহা একটু অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়; এবং রূপান্তরের প্রকৃতি ও সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত গতিরই অনুসরণ করিয়াছে। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ঘটনাই অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে অলৌকিকে রূপান্তরিত হয়, ইহার বিপরীত রকমের পরিবর্ত্তন বড় একটা হয় না। সাধারণ রোগে মৃত্যু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের দ্বারা ভৌতিক ঘটনাতে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু একটী ভৌতিক ঘটনা যে লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে তাহার অতিপ্রাকৃত অংশ বর্জ্জন করিয়া একটী স্বাভাবিক মৃত্যুতে রূপান্তরিত হইবে, তাহা নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যেখানে দুর্লভচন্দ্র ও ফুলমণির নিকট প্রফুল্লের প্রকৃত অবস্থা অবিদিত নাই, সেখানে যে তাহার অলীক মৃত্যুসংবাদ একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে তাহার স্বগ্রামে ও শ্বশুরালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অথচ এই অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের উপরই উপন্যাসটী প্রতিষ্ঠিত; এই মৃত্যুসংবাদের উপরেই ব্রজেশ্বরের গভীর প্রেম স্থিতিলাভ করিয়াছে। প্রফুল্ল ডাকাইতের দ্বারা আহত হইয়াছে এই সংবাদ পাইলে ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে এত গভীর দাগ পড়িত কি না সন্দেহ। আর ইংরাজ পণ্টনের হাত হইতে প্রফুল্লের অনুকূল দৈববশে উদ্ধারলাভও আকস্মিকতার মাত্রা যেন একটু অধিক বলিয়াই মনে হয়; বিশেষতঃ তাহার উদ্ধারের জন্য প্রাকৃতিক আনুকূল্যের উপর একান্ত নির্ভর ও বিপৎকালে নিষ্কাম ধর্ম্মশিক্ষার পরিচয় দান একটু আতিশয্য-দুষ্ট হইয়াছে। তবে এইখানেও প্রফুল্লের সমস্ত তেজস্বিতা ও নিষ্কামধর্ম্মাচরণের মধ্যে তাহার রমণীসুলভ কোমলতা ও চরিত্রের অবর্ণনীয় মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

মোটের উপর দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসটী অসাধারণ ঘটনাভারাক্রান্ত ও ধর্ম্মপ্রভাবগ্রস্ত হইলেও একটী বাস্তব জীবনচিত্র বলিয়াই আমাদিগকে আকর্ষণ করে; এবং ইহার মধ্যে যে একটা প্রবল ভাবাবেগ বহিয়া গিয়াছে, তাহাই ইহার বাস্তব চিত্রের উপর একটা গভীরতা ও গৌরব আনিয়া দিয়াছে।

'সীতারাম' (১৮৮৭) 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণীর সহিত একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে—তিনখানি উপন্যাসেই ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক চরিত্রচিত্রণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'আনন্দমঠে' আদর্শবাদ উপন্যাসের বাস্তব স্তরকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, 'দেবী চৌধুরাণীতে' ধর্ম্মতত্ত্ববিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রবল হইয়াও বাস্তব চরিত্র-চিত্রণকে অভিভূত করিতে পারে নাই। 'সীতারামে'ও একটা ধর্ম্মতত্ত্বের সমস্যাই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু এখানেও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাধান্য ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিতে পারে নাই, পরন্তু চরিত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনসংঘটনে ও তাহার কারণবিশ্লেষণে গ্রন্থকার আশ্চর্য্য নিপুণতাই দেখাইয়াছেন।

এখানে বঙ্কিমের ধর্ম্মতত্ত্বালোচনার প্রকৃতি ও উপন্যাসের উপর ইহার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইংরেজী উপন্যাসে ধর্ম্মতত্ত্বালোচনার প্রভাব এতই কম, এমন কি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের বিরুদ্ধে এমন একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে, যে ইংরাজী-সাহিত্যপুষ্ট আমাদের রুচি সহজেই, উপন্যাসের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পর্ক অস্বাভাবিক ও কলানৈপুণ্যের দিক হইতে ক্ষতিকর, এইরূপ একটা ধারণা করিয়া বসে। অবশ্য এইরূপ ধারণা করার জন্য যে যথেষ্ট হেতু নাই তাহা বলিতেছি না; অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায় যে লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেই এত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়েন, যে তিনি তাঁহার সৃষ্টচরিত্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে ভুলিয়া যান, ও তাহাদের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ও পরিণতি তাঁহার মৌলিক উদ্দেশ্যের দ্বারা অযথারূপ নিয়ন্ত্রিত করেন—তাঁহার চরিত্রগুলি অনেকটা নৈতিক গুণের মূর্ত্ত বিকাশ হইয়া পড়িতে চাহে। সুতরাং এই শ্রেণীর উপন্যাসের বিরুদ্ধে আমাদের একটা সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু এই স্বাভাবিক সন্দেহ যদি অযৌক্তিক সংস্কারে গঠিত হইয়া প্রতিভাবান লেখকের রসাস্বাদনের পক্ষে বাধা উপস্থিত করে, তাহা হইলে সমালোচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। 'সীতারামে' সেরূপ কোন বাধা উপস্থিত হইয়াছে কি না, তাহা তাহা আমাদিগকে ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

সীতারাম উপন্যাসে ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যা যে বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অবিসংবাদিত, ইহার মুখবন্ধে গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক সমষ্টিই তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গীতা আলোচনাফলে বঙ্কিমের মনে গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য খুব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং তাহার শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিক চরিত্রসৃজনদ্বারা ও মানবজীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি এই ধর্ম্মের বিশেষত্ব, ইহার আদর্শ ও সাধনপথে বিঘ্নসমূহ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কথাটা আর্টের দিক হইতে শুনিতে ভাল লাগিবে না; কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা কথা মনে করিলে এবিষয়ে আমাদের অনেকটা সন্দেহ নিরসন হইবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যে মানবমনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন না, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই—প্রত্যুত তাঁহাদের অনেক উপদেশ অনুশাসন মানবমনের গভীর জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ মনের উপর পাপের সূক্ষ্ম প্রভাব ও ক্রমবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা বিলক্ষণ সচেতন ছিল বলিয়াই মনে হয়। সীতারাম উপন্যাসে একটি স্বভাব-মহান্ চরিত্রের উপর এই পাপের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চরম পরিণতির একটী বেশ গভীর আলোচনা হইয়াছে। সীতারাম পড়িতে পড়িতে যদি আমরা ইহার গীতোক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেও ইহার কলাসৌন্দর্য্যের ও human interest এর কোন হানি হয় না। যাঁহারা উপন্যাসের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের একটি চির বিচ্ছিন্ন বিরোধের কল্পনা করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই 'সীতারাম'কে ধর্ম্মতত্ত্বের আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আধুনিক কালের ধর্ম্মপ্রভাবমুক্ত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আবেষ্টনের মধ্যে অনায়াসেই ফেলিতে পারেন। সীতারামের মধ্যে যে দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত ছিল, তাহা মনুষ্য হৃদয়ের একটী সাধারণ, চিরন্তন মোহ, গীতাকার কেবল তাহাকে একটী বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন উহা হইতে উদ্ধার পাইবার সাধন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। বঙ্কিম তাঁহার সমৃদ্ধ কল্পনাভাণ্ডার হইতে এই বাস্তব মোহের একটী উদাহরণ লইয়াছেন; এবং যদিও সীতারামের জীবন-সমস্যার উপর হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রভাব আসিয়া ইহাতে জটিলতা করিয়া তুলিয়াছে—শ্রীর সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্কই হিন্দুর সামাজিক ও ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—তথাপি তাহার নৈতিক অধঃপতনের চিত্রাঙ্কণ ও ইহার কারণ বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। নিতান্ত বাস্তবপ্রিয় পাঠকেরও এ বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

অবশ্য বঙ্কিম ধর্ম্মতত্ত্ব ও অতি-প্রাকৃতিক দিকটা একেবারে অবহেলা করেন নাই—শ্রী ও জয়ন্তীর ভিতর দিয়া এই দিকটা বেশ যথেষ্টই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীর সহিত সীতারামের সম্পর্কের বিশেষত্বটুকু হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসেরই ফল; আবার উপন্যাসের শেষের দিকে জয়ন্তী-শিষ্যা শ্রীর সন্ন্যাসের প্রতি অমায়িক নিষ্ঠাই সীতারামের চিত্ত বিভ্রম জন্মাইয়া তাহার অধঃপতনের গতি দ্রুততর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সীতারামের নিজের জীবনের উপর ধর্ম্মতত্ত্বের লক্ষিত হয় না। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাকে জীবনের মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণের সহিত এমন নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন। সীতারামের অপরিমিত রূপমোহ কিরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল ও অনুকূল ঘটনাযোগে দুর্দ্দমনীয় হইয়া তাঁহার রাজত্ব ও মনুষ্যত্বের যুগপৎ ধ্বংস সাধন করিল তাহার কাহিনীর রসোপলব্ধির জন্য আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

সীতারামের চরিত্রে অতৃপ্ত রূপ-মোহের দুর্ব্বলতা যে প্রথম হইতেই সুপ্ত হইয়া ছিল, তাহা বঙ্কিম বিপন্না সাহায্যপ্রার্থিনী শ্রীর সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ কালেই একটী সূক্ষ্ম অথচ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।—"তুমি, শ্রী, এত সুন্দরী"। পিতৃআজ্ঞা-অনুসারে নিরপরাধিনী শ্রীকে নিশ্চিন্তভাবে পরিত্যাগ, ও তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বোধের সম্পূর্ণ

বিসর্জ্জন—ইহাও চরিত্র দৌর্ব্বল্যেরই সূচক। তাহার পর যে এত দিনের বিস্মৃত কর্ত্তব্যজ্ঞান এরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবে জাগিয়া উঠিল, শান্ত হৃদয়ে যে গভীর তরঙ্গ-বিক্ষোভ জন্মিল, তাহার মূলে, সমবেদনা, আত্মগ্লানি প্রভৃতি সমস্ত উচ্চভাবকে ছাপাইয়া যে শক্তি ছিল তাহাও এই রূপ তৃষ্ণা। গঙ্গারামের জন্য তাঁহার অভাবনীয় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাবও এই মূল ভাব হইতে প্রসূত। অবশ্য রূপমোহ যতই প্রবল হউক না কেন, তাহা সাধারণ প্রকৃতির লোককে এরূপ আত্মোৎসর্গে প্রণোদিত করিতে পারে না। সীতারামের চরিত্রের অসাধারণ মহত্ত্ব না থাকিলে কোন শক্তিই তাঁহার মনকে এত উচ্চ সুরে বাঁধিয়া দিতে পারিত না। সুতরাং এই দৃশ্য যেমন একদিকে সীতারামের স্বাভাবিক মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে, তেমনই অন্যদিকে তাঁহার উপর রূপমোহের প্রবল প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—এখানে তাঁহার মহত্ত্ব ও দুর্ব্বলতা একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া দেখা দিয়াছে। তার পর যুদ্ধের সময় শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্ত্তি সীতারামের অন্তরস্থ সুপ্ত উচ্চাভিলাষের দ্বারে আঘাত করিয়াছে, তাঁহার স্বাধীনতার কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া শ্রীর প্রতি আকর্ষণকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে। রূপমুগ্ধ সীতারাম এই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তাহার নেশাকে আরও রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে, ও তাহার রূপমোহের উপর আর একটা উন্নততর আকাঙ্ক্ষার প্রলেপ দিয়াছে।

তারপর শ্রীর সহিত প্রথম বোঝা-পড়া; শ্রীকে পরিত্যাগ করিবার কারণ প্রকাশ করিতেই স্বামির অমঙ্গল-ভয়-ভীতা শ্রীর অন্তর্দ্ধান। এই অপ্রাপণীয়া শ্রী সীতারামের ধ্যানে আরও উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল, শ্রী সীতারামের নিকট অজ্ঞাত অনন্তের বিচিত্র রহস্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিব। রূপমোহ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইল; সমস্ত কল্পনা ও ধ্যান ধারণার উপর জুড়িয়া বসিয়া জীবনের উপর প্রবলতম প্রভাব হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে গঙ্গারামের ব্যাপার লইয়া যে সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা, তাহা একটা ক্ষুদ্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরব ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া বসিল। সীতারাম অনেকটা অজ্ঞাতসারে, অনেকটা ঘটনার প্রবল স্রোতে বাধ্য হইয়া আপনাকে একজন স্বাধীন-রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতার আসনে আসীন দেখিতে পাইলেন। এই উত্তেজনা ও কোলাহলের সময় শ্রীর চিন্তার বাহ্য প্রকাশ কতকটা মন্দীভূত হইয়া থাকিল; আত্মরক্ষা ও রাজ্যস্থাপনের প্রবল প্রয়োজন সীতারামকে শ্রীর চিন্তা হইতে কতকটা অপসৃত করিল। কিন্তু এ সময়েও যে তাহার অন্তরস্থ ইচ্ছা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় যে কেবল অবসরেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, গ্রন্থকার তাহার প্রচুর নিদর্শন দিয়াছেন;

তার পর আর এক দৃশ্যে সীতারামের শ্লাঘ্যতম গৌরবে শিখরে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অন্তরস্থ দুর্ব্বলতার বীজে নব্বারিনিষেক হইল। যে দিন ছদ্মবেশী সীতারাম সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী ও শ্রীর সাহায্যে একাকী দুর্গরক্ষা করিয়া অমানুষিক বীরত্বের পরিচয় দিলেন, সেই দিনই তাঁহার চরম গৌরবের দিন, ও শ্রীর সহিত শুভতম সম্মিলনের লগ্ন। সেই শুভদিনের পর হইতেই তাঁহার সাংসারিক ও নৈতিক উভয়বিধ অধঃপতনের আরম্ভ হইল। রাজ্য-রক্ষার পুরস্কার-স্বরূপ যে রত্ন তিনি পাইলেন, তাহা তাঁহার জীবনে দীর্ঘকালসঞ্চিত দাহ্যপদার্থের নিকট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই আসিয়া পড়িল। আবার রমার গঙ্গারামঘটিত কলঙ্ক-ব্যাপার ও তাহার প্রকাশ্য দরবারে বিচার, একদিকে সীতারামের মনে একটা গভীর বিক্ষোভ জাগাইয়া, ও

অন্যদিকে রমার প্রতি একটা বদ্ধমূল বিরাগের সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে উন্মত্ত, সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের আবর্ত্তের দিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিল।

অতঃপর অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তিতা সন্ন্যাসিনী শ্রীর সহিত মিলনের পর সীতারামের চির পোষিত রূপ-তৃষ্ণা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া সাংঘাতিক বিষের ন্যায় তাঁহার সমস্ত মনে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার নৈতিক জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলমল করিতে লাগিল। গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে এই প্রতিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ভীষণ ক্রিয়া সীতারামের কার্য্য-কলাপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষে' জমিদার নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর প্রেমে পড়িয়া ও আপনার সহিত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মদ খাইতে লাগিলেন, ও দুই একটা নিরীহ ভৃত্যকে প্রহার করিয়া নিজ অন্তর্দ্দাহের পরিচয় দিলেন। স্বাধীন রাজা সীতারাম, নিজ পরিণীত ভার্য্যার উপর স্বামীর অধিকার প্রয়োগ করিতে না পারিয়া উগ্রতর রক্তের নেশায় মাতাল হইয়া উঠিলেন, ও নিজ উন্মত্তপ্রায় অস্থিরমতিত্বে একটা রাজত্বের উপর বিশৃঙ্খলার স্রোত বহাইয়া দিলেন, এখনও সংযমের শেষ বন্ধন ছিন্ন হয় নাই; শ্রীর প্রতি প্রকৃত প্রেম সীতারামকে পাশবিক অত্যাচারের পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল; এখনও পর্য্যন্ত তাহার অপরাধ কর্ত্তব্য-চ্যুতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, অত্যাচার ও পাপাচরণের চরম সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই; এই কর্ত্তব্যচ্যুতির ফলেই একদিকে রমা মরিল, অন্যদিকে চন্দ্রচূড় তিরস্কৃত হইলেন ও রাজকর্ম্মচারীরা শূলে গেল। তবে এখন পর্য্যন্ত সীতারাম নিজেরই ক্ষতি করিয়াছেন; ইন্দ্রিয়দাস পশুতে পরিণত হন নাই।

কিন্তু এই চরম দুর্গতি ও অধঃপতনও বাকী রহিল না। শ্রী, কতকটা নিজ সন্ন্যাস-পালন-ক্ষমতায় আস্থা হারাইয়া, কতকটা রাজাকে অধঃপতনের গতিরোধ করিবার জন্য, জয়ন্তীর পরামর্শে ও তাহারই ছদ্মবেশের সাহায্যে প্রমোদ-উদ্যান হইতে অন্তর্হিতা হইল। সীতারামের ক্ষিপ্ততা চরমে উঠিল; বিজাতীয় ক্রোধ আসিয়া তাহাকে হিংস্র পশুর ন্যায় জয়ন্তীর প্রতি দংষ্ট্রা-নখর-প্রয়োগে উত্তেজিত করিল; অন্তঃরুদ্ধ রূপ-তৃষ্ণা এইবার প্রচণ্ড সর্ব্বগ্রাসী কামানলের শিখায় উঠিল; আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা মহিমাময় সীতারাম একটা ঘৃণিত কামার্ত্ত পশুতে পরিণত হইলেন, সীতারাম চরিত্রের এই ভীষণ পরিবর্ত্তন অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করিয়া ধরা হইয়াছে; সীতারামের এই অধঃপতনের চিত্র সর্ব্বতোভাবে বীর ম্যাকৃবেথের রক্তপিপাসু পশুতে পরিণতির সহিত তুলনীয় এবং এই চরিত্রবিশ্লেষণে বঙ্কিম সগৌরবে ধর্ম্মতত্ত্বের ক্ষীণতম প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছেন।

অবশ্য শেষ দৃশ্যে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দুর্গপ্রাচীর-ভেদ-কারী কামানের শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনির মধ্যে সীতারামের নৈতিক পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়াছেন। এইখানে ইংরেজ কবির সহিত হিন্দু গ্রন্থকারের প্রভেদ। ইংরেজ জাতি এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তাদৃশ বিশ্বাস করে না। সেইজন্য শেকশ্‌পিয়ার তৃতীয় রিচার্ড ও ম্যাকবেথকে হিংস্র পশুবৎ রাখিয়াই শমনসদনে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের নৈতিক পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য মৃত্যুর প্রাক্কালে এই সমস্ত অধঃপতিত

বীরের মুখে কবি যে সমস্ত গভীর ভাব ও উদাস খেদপূর্ণ বাণী দিয়াছেন, তাহাতে ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে তাহাদের মধ্যে নিষ্ফল ক্ষোভ ও অনুতাপের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমের সীতারাম এক মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত দৌর্ব্বল্য ও চরিত্র গ্লানি ধূলিজঞ্জালবৎ ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন; গ্রন্থের এইরূপ পরিসমাপ্তি করিয়া বঙ্কিম তাঁহার জাতিগত ও ধর্ম্মবিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় দিয়াছেন; ইহাতে বাস্তবতার বিশেষ হানি হইয়াছে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষ রকম রোমান্সের দিকে প্রবণতা আছে, এবং এই রোমান্সের প্রকৃতি তাহার বাস্তব জীবনের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। ইউরোপীয় রোমান্স আমাদের বাঙ্গালী-জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে ঠিক মিলিবে না; আমাদের জাতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরই আমাদের রোমান্সের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই মানদণ্ডে বিচার করিতে গেলে সীতারামের শেষ মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের যে রোমান্স তাহা আমাদের বাস্তব জীবনের অবস্থার সহিত বেশ সুসঙ্গতই হইয়াছে। সীতারামের পূর্ব্বজীবনের স্বাভাবিক মহত্ত্বও এই পুনরুদ্ধারের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্কিম যেরূপ গভীর আবেগ, ও সংযত অথচ মর্ম্মস্পর্শী সহৃদয়তার সহিত এই পরিবর্ত্তনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে যে তিনি কেবল একটা সুলভ ভাবাতিরেক (sentimentality) চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, এরূপ সন্দেহের কোন অবসর থাকে না; তাঁহার অস্থিমজ্জাগত গভীর ধর্ম্মভাবই এই দৃশ্যের প্রত্যেক ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতারামচরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব্ব সৃষ্টি; সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও বাস্তবের সহিত রোমান্সের সংমিশ্রণের সুসঙ্গিতে ইহা পাশ্চাত্য উপন্যাসের যে কোন সমজাতীয় চরিত্রের সহিত সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে।

রোমান্সের যাহা কিছু আতিশয্য ও অসঙ্গতি, তাহা শ্রী ও জয়ন্তীর যুগ্ম-চরিত্রের উপর দিয়াই ব্যয়িত হইয়াছে। জয়ন্তীকে আমাদের খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিবার প্রয়োজন নাই —সে রোমান্স-প্রাসাদের একটা আবশ্যকীয় গৃহ-সজ্জা মাত্র। শ্রীকে সন্ন্যাসে ব্রতী করিবার জন্য ও সীতারামের জীবনে একটা প্রলয়-ঝটিকা তুলিবার জন্য এরূপ একটা অবিমিশ্র-সংসার-বন্ধনশূন্যা, প্রলোভনাতীতা সন্ন্যাসিনীর প্রয়োজন ছিল; গ্রন্থকার নিজ কল্পনার ইন্দ্রজালবলে এরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণা সন্ন্যাসিনীকে পাঠকের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন—তাহার অতীত জীবনের কোন আভাস দেন নাই। পাঠকের কৌতূহল ও অনুসন্ধানস্পৃহা যে লেখক-নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অসুবিধাজনক প্রশ্ন উত্থাপন করিবে বঙ্কিমের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না; এবং রোমান্সের জগতে এরূপ তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্তিও অনেকটা অনধিকার-প্রবেশ-কারী বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। যেমন আমাদের দ্বার-প্রান্তপ্রবাহিনী নদী কোন সুদূর পর্ব্বতশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনস্রোতের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেয়, উহার অতীত জীবন সম্বন্ধে আমরা কোন প্রশ্নই উত্থাপন করি না, সেইরূপ জয়ন্তীও অজ্ঞাতের রাজ্য হইতে আসিয়া উপন্যাসের কর্ম্মস্রোতের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। সুতরাং জয়ন্তীতে বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখিবার আশা আমরা করিতে পারি না। কিন্তু বঙ্কিম এরূপ একটী গৌণ রকমের চরিত্রেও যথেষ্ট মাধুর্য্য ও human interest সঞ্চার করিয়াছেন।

অবশ্য শ্রীর সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষা ও তাহার চরিত্রগত গভীর পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য কৃতিত্ব, আর্টের দিক্ হইতে, জয়ন্তীর প্রাপ্য নহে; কেননা এই পরিবর্ত্তন পাঠকের চক্ষুর অগোচরে, যবনিকার অন্তরালে সম্পাদিত হইয়াছে। আবার শ্রীর সহিত জয়ন্তীর নিষ্কামধর্ম্মসম্পর্কীয় যে সমস্ত দার্শনিক আলোচনা হইয়াছে, তাহাতেও তাহার সজীবতার পরিমাণ বাড়ে নাই। কিন্তু বঙ্কিম এমন একটা সন্ন্যাসের অশরীরী আদর্শকে এমন অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়াছেন যে তাহার মুখ হইতে মানুষের মর্ম্মের কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতে জয়ন্তী আমাদের নিকট কেবল আদর্শ সন্ন্যাসিনী নহে, একটা সজীব ঘাত-প্রতিঘাতচঞ্চল মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জয়ন্তীর বিচারের দৃশ্য যেমন একদিকে বঙ্কিমের বর্ণনাশক্তি ও সৃজনী প্রতিভার পরিচয়, তেমনি অপরদিকে তাঁহার সূক্ষ্ম নৈতিক অনুভূতিরও নিদর্শন। জয়ন্তীর মনে যে মুহূর্ত্তে একটু সূক্ষ্ম অহঙ্কারের ভাব প্রবেশ করিয়াছে, যে মুহূর্ত্তে তাহার সন্ন্যাসের মধ্যে বাহ্যাড়ম্বরের একটু সামান্য স্পর্শ হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা আসিয়া তাহার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমের প্রতিভা এখানে অতিসূক্ষ্ম তাপমান যন্ত্রের ন্যায় অন্তরস্থ অহঙ্কারের সামান্য তারতম্য, ঈষৎ মাত্রাভেদও অভ্রান্তভাবে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীর চরিত্রেই উপন্যাস-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবাস্তবতা দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীর চরিত্রের গুরুতর পরিবর্ত্তনটা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে সাধিত হওয়ায় তাহার গৌরব অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে। শ্রীর স্বামিপ্রেমের যে গভীর, মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ পাই, তাহাতে তাহার পরিবর্ত্তনের কাহিনীটা বিশ্বাসের উপর মানিয়া লইতে আমাদের আরও অনিচ্ছা হয়। বিশেষতঃ ইহার পরে শ্রী জয়ন্তীর প্রভাবে পড়িয়া একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। জয়ন্তীর একান্ত অনুগতা শিষ্যার অপ্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। সীতারামের আজীবন-ব্যাপী আকুল বাসনা, শ্রীর নিজ অন্তঃকরণের সন্ন্যাসের আদর্শ ও স্বামি-প্রেমের মধ্যে ক্ষীণদ্বন্দ্ব, ও বিলম্বিত (belated) অনুতাপ—কিছুতেই তাহার ধমনীতে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্ত্তিই আমাদের কল্পনার চক্ষে গভীর রেখায় ফুটিয়া উঠে, তাহাই আমাদের তাহার সম্বন্ধে শেষ এবং সত্য ধারণা। সন্ন্যাসিনী শ্রী একটা আদর্শ-জ্যোতিঃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, সীতারামের অনির্ব্বাণ কামনার আগুনে রাঙ্গা হইয়া, কিন্তু নিজে প্রভাত-নির্ব্বাপিত-জ্যোতিঃ তারকার ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে অবাস্তবতার তরল অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে।

বাস্তব-চরিত্রদের মধ্যে রমাই সর্ব্বপ্রধান। রমাই আমাদিগকে উচ্চ আদর্শ ও বীরত্বের রাজ্য হইতে আমাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। সীতারামের উচ্চাভিলাষ ও স্বাধীন রাজ্যস্থাপন তাহার দুই চক্ষের বিষ; মুসলমানের ভয় তাহার দিবসের শান্তি ও রাত্রির নিদ্রা হরণ করিয়াছে—উপন্যাসের যুদ্ধ কোলাহল ও সন্ন্যাসধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের মধ্যে সে খাঁটী বাঙ্গালী নারীর সুরটী তুলিয়াছে—একমাত্র রমাই সীতারামকে বাঙ্গালী বলিয়া নিঃসন্দেহে চিনাইয়া দিয়াছে। কিন্তু অসাধারণ প্রতিবেশের প্রভাব এ হেন রোদন-প্রবণা, অতিমাত্র স্নেহ-দুর্ব্বলা নারীকেও রোমান্সের দীপ্তি ও গৌরব আনিয়া দিয়াছে।

প্রথমতঃ গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণের ব্যাপারে তাহার শঙ্কাতিশয্যই তাহাকে দুঃসাহসের চরম-সীমায় ঠেলিয়া দিয়াছে। আর প্রকাশ্য দরবারে বিচারের দিন পুত্রস্নেহ তাহার সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ-দুর্ব্বলতাকে সরাইয়া দিয়া তাহার কণ্ঠ অতুলনীয় বাগ্মিতায় ভরিয়া দিয়াছে, ও সেই ক্ষীণপ্রাণা রমণীর উপর মহামহিমময়ী সম্রাটীর জয়মুকুট পরাইয়াছে। রোমান্সের অসাধারণত্ব ও আমাদের সাধারণ জীবনের উপর তাহার অনমুমেয় প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমের দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ছিল, রমার চরিত্রই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রমার, সীতারামের অবহেলাজনিত শোচনীয় মৃত্যু তাহার পাণ্ডুর মুখে একটা করুণ আভা আনিয়াছে, এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক্ দিয়াও, সীতারামের অধোগতির একটী সোপানস্বরূপেও উপন্যাসের তাহার সার্থকতা আছে।

অন্যান্য চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের বিশ্বাস ঘাতকতা একটা অতর্কিত বিকাশ বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে অনুভূত হয়। কিন্তু লেখক উপন্যাসের প্রথম অংশে তাহার আত্মসর্ব্বস্বতার একটু ক্ষুদ্র ইঙ্গিত দিয়া বোধ হয় তাহার শোচনীয় পরিণামের জন্য আমাদিগকে কতকাংশে প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছেন। কাজীর নিকট গঙ্গারামের বিচারের দিন, সীতারাম তাহার উদ্ধারের জন্য কতখানি আয়োজন করিয়াছেন, মুসলমানের সহিত লড়াই করিবার জন্য কত খানি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, তাহা গঙ্গারামের জানিবার কোন উপায় ছিল না; তাহার সহিত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সীতারামের নিশ্চয়ই কোন পরামর্শ হইতে পায় নাই। অথচ গঙ্গারাম আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কিছু না ভাবিয়া সীতারামকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া রাখিয়া সীতারামের অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া অনায়াসে পলায়ন করিল, অবশ্য কামারকে ঘুষ দিয়া গঙ্গারামের হাত পা বেড়ীমুক্ত করিয়া লওয়াতে গঙ্গারামের সহিত পূর্ব্ব-পরামর্শের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্য এই যে সুযোগ উপস্থিত হইলে যাহাতে গঙ্গারামের পলায়নের পক্ষে কোন বিঘ্ন না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। গঙ্গারাম যে এরূপ অতর্কিতভাবে ও অপরকে বিপদে ফেলিয়া নিজ পলায়নের উপায় নিজেই করিয়া লইবে, কোন উপদেশের অপেক্ষা রাখিবে না, ইহার জন্য বোধ হয় কেহই প্রস্তুত ছিল না। আমাদের এইরূপ ব্যাখ্যা যদি অযথার্থ না হয়, তবে গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই গঙ্গারামের মধ্যে স্বার্থপরতার বীজের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন; পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অনুকূল ঘটনার আশ্রয়ে এই মৌলিক স্বার্থপরতার স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

সীতারামে অসাধারণ ও রোমান্টিক দৃশ্য বর্ণনায় বঙ্কিমের কল্পনার বিশাল প্রসার ও পরিধি প্রস্ফুট হইবার অবসর পাইয়াছে। বিশাল, উদ্বেল, জন-সমুদ্র-বর্ণনে বঙ্কিম যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। এইরূপ তিনটি দৃশ্য উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—গঙ্গারামের উদ্ধার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা, রমা ও গঙ্গারামের বিচার, ও জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞা। এই তিনটী দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ জনতার বিশেষ বিশেষ mood—কোথাও উত্তেজনা-ও-কোলাহল-ময়, কোথাও কৌতুহলী, কোথাও বা রুষ্ট-গাম্ভীর্য্য-ভীষণ বা অজ্ঞাত বিপদের ছায়াপাত-শঙ্কিত—বঙ্কিম অতি দক্ষতার সহিত বিচিত্র করিয়াছেন। সীতারামের পুনরুদ্ধারের চিত্রের মহনীয়তার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু রোমান্সের প্রাচুর্য্য-সত্ত্বেও সীতারামের বাস্তবতার কোন অভাব অনুভূত হয় না। কি উপায়ে এই বাস্তবতার impression সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহারও কতক বিচার করা হইয়াছে। সীতারামের চরিত্রে যে সংঘাত তাহা মূলতঃ একটী বাস্তব দ্বন্দ্ব রমা, নন্দা, গঙ্গারাম প্রভৃতি বাস্তব চরিত্রগুলি উপন্যাসকে শ্রীজয়ন্তী-ঘটিত অবাস্তবতার ছায়া হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রী ও জয়ন্তীর অলৌকিকত্ব সাধারণ লোকের মুখে মুখে কিরূপ উদ্ভট আকার ধারণ করিতেছিল, তাহা আমরা রামচাঁদ শ্যামচাঁদের কথোপকথনেই বুঝিতে পারি। এই জনসাধারণের মুরটী—মুরলার দৌত্য ও দুরবস্থা, যমুনার কৌতুকপ্রদ নীতিজ্ঞান, কবিরাজ-মণ্ডলীর চিকিৎসা-নৈপুণ্য, এমন কি জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নির্ব্বাচিত চণ্ডাল ও মুসলমান কসাইসকলের সমবেত আবির্ভাবের ফলে—গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে, রোমান্সের শোভাযাত্রার কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া যায় নাই। মোটের উপর সীতারাম বাস্তব ও অসাধারণের মধ্যে একটী সুন্দর সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্য; ইহার মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রভাব ইহাকে উপন্যাসোচিত আদর্শ হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। ইহার চরিত্র-বিশ্লেষণ ও ঘটনাপরিণতি কোথায়ও নীতিবিদের বা তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই; পাপপুণ্যের তারতম্য অনুসারে দণ্ড-পুরস্কার বিতরণের যে ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি (narrow poetic justice) তাহা উপন্যাসের বিশালতাকে সঙ্কুচিত করে নাই। শেক্স্‌পিয়ারের উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডিগুলির মত সীতারামও মানবমনের দুর্জ্জেয়তার, ইহার মধ্যে একদিকে পাপের গোপন সঞ্চার ও বিশাল পরিণতি ও অপরদিকে অপ্রত্যাশিত মহিমা-এককথায় মানবের রহস্যময় প্রকৃতির উপর একটী উজ্জ্বল আলোকরেখাপাত করিয়া আমাদিগকে বিহ্বলতামণ্ডিত অথচ বিশ্বাসপূর্ণ বিস্ময়ে অভিভূত করে।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এলোরা

মনমদ জি, আই, পি রেলওয়ের মেন লাইনে একটী বড় জংসন ষ্টেসন। এখান হইতে N, G. S. R (Nizam's Guaranteed State Railway) বাহির হইয়া হায়দ্রাবাদ গিয়াছে। বম্বে বা কলিকাতা হইতে এলোরা যাইতে হইলে মনমদে আসিয়া গাড়ী বদল করিতে হইবে। নিজাম সরকারের ডাক গাড়ী দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। যে গাড়ীতে ডাক যায় (mail van) তাহা দুই কম্পার্টমেণ্টে বিভক্ত। এক কম্পার্টমেণ্টের উপর লেখা আছে "British mail service" ও দ্বিতীয় কম্পার্টমেণ্টে লেখা আছে "Nizam's mail service" কয়েকটী ষ্টেসন পার হইলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে গাড়ী নিজাম রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বরোদা রাজ্যেও দেখিয়াছি ষ্টেসনে পুলিসের ইউনিফর্ম্মে লেখা আছে "Govt. Railway Police" কিন্তু নিজাম রাজ্যে এই নিয়মের

অন্যথা দেখি, রেলওয়ের পুলিসের ইউনিফর্ম্মেও লেখা আছে "Nizam's Railway Police."

দৌলতাবাদ ষ্টেসনে নামিয়া এলোরা যাইতে হয় ষ্টেসন হইতে প্রায় ১১ মাইল দূর; অনেক গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। যখন ষ্টেসনে নামিলাম তখন গভীর রাত্রি, নামিয়াই দেখি ষ্টেসনে একটী খুব বড় Saloon দাঁড়াইয়া আছে; শুনিলাম নিজাম রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা রেসিডেণ্ট সাহেব এখন এলোরায় আছেন; বুঝিলাম আমাদের কপাল মন্দ, ষ্টেশনের নিকটেই এক ডাক বাংলো আছে, মনে করিলাম সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সকালে এলোরা রওয়ানা হইব; কিন্তু গাড়োয়ানদিগের নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতে সেখানে থাকা আর উপযুক্ত বিবেচনা করিলাম না। তাহারা বলিল, "রেসিডেণ্ট সাহেব শীকার করিতে এলোরায় আসিয়াছেন—তিনি কাল ফিরিয়া যাইবেন; তাঁহার মোটর গাড়ী এলোরা হইতে ষ্টেশনে না আসা পর্য্যন্ত কাহারও সাধ্য নাই রাস্তায় গরুর গাড়ী চালায়।" আমরা বলিলাম, "আলবৎ, তাহাত ঠিক; কিন্তু তাঁহার মোটর গাড়ীত সমস্তদিন যাওয়া আসা করিবে না; তিনি যদি সকালে আসেন আমরা বিকালে যাইব; আর তিনি যদি বিকালে আসেন আমরা সকালে যাইব।" তাহারা বলিল, "তিনি সকালে আসিবেন কি বিকালে আসিবেন তাহার কিছুই ঠিকানা নাই; তবে আমাদের প্রতি হুকুম জারি হইয়াছে তাঁহার মোটর ষ্টেশনে না আসা পর্য্যন্ত আমরা রাস্তায় গরুর গাড়ী লইতে পারিব না।" বুঝিলাম আজ রাত্রির শেষেই এলোরা না পৌছিতে পারিলে কাল সমস্ত দিনই হয়ত এখানে পড়িয়া থাকিতে হইবে। এই ১১ মাইল পথ তিনি মোটরে হয়ত আধ ঘণ্টায় আসিলেন—কিন্তু ঠিক কখন আসিবেন তাহা যখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া স্থির করেন নাই, অথবা তিনি হয়ত স্থির করিয়াছেন কিন্তু পুলিশ কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া সব অস্থির করিয়া তুলিয়াছে তখন বলিতেই হইবে আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। পরদিন অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা অপেক্ষা আজ রাত্রিতেই রওনা হওয়া ভাল মনে করিয়া তখনই যাত্রা করিলাম।

সকালে এলোরা ডাক বাংলোতে আসিয়া পৌছিলাম; অজন্তার ন্যায় এখানেও একটী ডাক বাংলো ও একটী Guest House আছে; সর্ব্বসাধারণের জন্য ডাক বাংলো, এবং বড় বড় কর্ম্মচারী ও নিজাম বাহাদুরের মাননীয় অতিথিদের জন্য Guest House; এই অতিথিশালার কথা আর কি বলিব? ডাক বাংলোটী প্রকৃতই খুব সুন্দর; উচ্চ পাহাড়ের শিখর দেশে ইহা নির্ম্মিত। এই পাহাড়ের তলদেশেই, এই পাহাড়ের গাত্রেই এলোরার গুহাগুলি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট মন্দ; ডাকবাংলোর খানসামা বলিল, "ডাকবাংলোতে এখন স্থান নাই, কারণ রেসিডেণ্ট সাহেব এলোরায় আসিয়াছেন।" আমরা বলিলাম, "রেসিডেণ্ট সাহেব তো অতিথিশালায় আছেন, আমরা ডাকবাংলাতে স্থান চাই।" খানসামা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিল রেসিডেণ্টের সঙ্গে সর্ব্বদাই অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ থাকে। বুঝিলাম ও বিদায় লইলাম। অগ্রসর হইলাম, পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় ২ মাইল দূরে এলোরা গ্রামে আসিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট যখন মন্দ তখন কে আর

কি করিতে পারে? এলোরার পাণ্ডারা যথারীতি আক্রমণ করিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল তাহারা বাসের জন্য যে সুন্দর গৃহগুলি দেখাইয়া দিল তাহাতে গরু ভেড়া থাকিতে পারে কিনা গবেষণার বিষয়—মানুষের কথা পৃথক। আমরা হতাশ হইয়া ফিরিয়া চলিলাম; আমাদের অদৃষ্টচক্রও বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গেল। গুহাগুলির নিকটে আসিয়া যখন পর্ব্বত আরোহণ করিতে যাইতেছি, তখন দেখি কাছেই একটী পুলিসের চৌকী। এখানে ৪।৫টী পুলিস থাকে, তাহাদের কাজ গুহাগুলি পাহারা দেওয়া ও নিকটস্থ গ্রামগুলিতে শান্তি রক্ষা করা। তাহাদের নিকট যাইয়া আমরা আমাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিলাম। তাহারা বলিল, "আমাদের একটী মাত্র কুঠরী, ভিতরে কোনই স্থান নাই—আপনারা যদি বারান্দায় থাকিতে রাজী হন তবে আমাদের কোনই আপত্তি নাই।" পুলিসের এই প্রকার ব্যবহার আমরা কখনও আশা করি নাই; তাহাদের এই সহৃদয়তায় আমরা মুগ্ধ হইয়া সেইখানেই আস্তানা গড়িলাম।

অজন্তার গুহাগুলি পাহাড়ের মধ্যভাগে; এলোরার গুহাগুলি পাহাড়ের তলদেশে, অজন্তা গুহাগুলির সম্মুখে পর্ব্বত শ্রেণী। দৃষ্টি পর্ব্বতে আবদ্ধ হইয়া যায়; এলোরা গুহাগুলির সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর,—যতদুর দেখা যায় কেবল প্রান্তরের পর প্রান্তর। অজন্তায় গুহার সংখ্যা ২৮; এলোরায় গুহার সংখ্যা ৩২; অজন্তায় সমস্ত গুহাই বৌদ্ধদিগের; এলোরায় কতকগুলি গুহা বৌদ্ধের, কতকগুলি জৈনের এবং কতকগুলি হিন্দুর। অজন্তায় বিশেষত্ব রঙীন চিত্র, এলোরায় সে প্রকার কোন চিত্র নাই।

অজন্তা হইতে এলোরায় আসিলে মনে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আসিলাম। হিন্দুগুহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গুহার নাম কৈলাস মন্দির। কৈলাস মন্দির দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। এক বিশাল পর্ব্বতকে কাটিয়া খুদিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। একটী ইট কিম্বা পাথর বাহির হইতে আনিয়া মন্দিরের কোন অংশে যুক্ত করা হয় নাই; যোগের কাজ একেবারে নাই; এক বৃহৎ অখণ্ড মন্দির—তাহার প্রত্যেক অংশই এক বিশাল পর্ব্বতকে খুঁদিয়া খুঁদিয়া করা হইয়াছে। মন্দিরের উচ্চশিখর হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ, সমস্ত কারু-কার্য্য, সমস্ত মূর্ত্তিই পর্ব্বতের পরিবর্ত্তিত অঙ্গ। ইহা এক সুবিশাল মন্দির—মন্দিরের চারিদিকে বড় বড় গুহা; সব গুহাগুলিই দ্বিতল; গুহাগুলিও বেশ আলোকিত। গুহা বলিতে সাধারণ লোক যাহা মনে করে এ গুহাগুলি সে প্রকার নহে; প্রত্যেক গুহাই এক সুবিশাল হল ঘর, যেন এক বড় দরবার গৃহ; বড় বড় মোটা মোটা স্তম্ভ নানা কারু-কার্য্যখচিত। বারান্দায় বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। মূর্ত্তির সংখ্যাও অনেক; মূর্ত্তিগুলি পুরাণের গল্প বর্ণিত করিতেছে। কোথাও রাবণ মহাদেবের পূজা করিতেছে; কোথাও গণেশ তাহার মাতার নিকট দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও অন্নপূর্ণা অন্নবিতরণ করিতেছেন। কোন মূর্ত্তিতে দেখি মহাদেবের বিবাহের আয়োজন হইতেছে, মহাদেব সতীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন; আবার অন্য মূর্ত্তিতে দেখি তিনি ধ্যানে বসিয়াছেন, তাঁহাকে প্রলুব্ধ করা হইতেছে এবং ধীরে ধীরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে কোন মূর্ত্তিই প্রস্তুত করিয়া আনিয়া বারান্দায় বসান হয় নাই; পাহাড় খুঁদিয়া বারান্দা

হইয়াছে—পাহাড় খুঁদিয়া এই মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়ি; বিশ্বাস হয় না কোন মানুষ এই ভীষণ কাজ করিতে পারে; স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা না করিলে মানুষের একাজ সম্ভব নহে। কি অমানুষিক পাশবিক বলে একটা বিশাল পাহাড়কে ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া, মাজিয়া, ঘসিয়া, খুঁদিয়া খুঁদিয়া নানা কারু-কার্য্যখচিত ও বহু গুহা সম্বলিত এই মন্দিরটী নির্ম্মান করা হইয়াছে ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হই বটে, কিন্তু আনন্দে তেমন পুলকিত হই না। মন্দিরের সর্ব্বত্রই এক অমানুসিক শক্তির পরিচয় পাই; কিন্তু কোথাও কমনীয় সৌন্দর্য্যের কোন নিদর্শন নাই; যাহা দেখিলাম তাহা Art বটে, কিন্তু ললিত কলা (Fine Art) নহে; কোমলতা বা রমণীয়তার কোন চিহ্ন কোথাও নাই যাহা অজন্তার চিত্রে ভূবি ভূরি দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই এক নগ্ন কঠোর রুদ্র ভাব, যাহারা এই মন্দির ও মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাদের শক্তি অসীম ছিল কিন্তু তাহাদের শিক্ষা ও রুচি যেন তেমন সুমার্জ্জিত ছিল না—ইহাই মনে হয়। ইংরাজিতে যাহাকে fineness or delicacy বলে তাহার লক্ষণ কোথাও নাই। কঠোরতা আছে, কমনীয়তা নাই; শক্তি আছে, ভক্তি নাই।

কৈলাস মন্দিরে আর একটী অভাব দেখিলাম সে অভাব অজন্তাতে মোটেই নাই। অজন্তার আর্ট humanistic কিন্তু কৈলাস মন্দির সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কৈলাস মন্দির দেবদেবীর কাণ্ডকারখানা লইয়াই ব্যস্ত; এখানে মানুষের সুখ দুখের কোন স্থান নাই। দেবদেবীর জন্ম, তাহাদের বিবাহ, তাহাদের স্নেহ ভালবাসা, তাহাদের হিংসাদ্বেষ তাহাদের মাহাত্ম্য, সর্ব্বত্রই তাহাদের কথা। অজন্তায় ঠিক ইহার বিপরীত; দেবদেবী, যক্ষ রক্ষ সেইখানে তাণ্ডবনৃত্য করে না, প্রাণীর সেবাই বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ ভগবান—তাই সেখানে দেখি মানুষের হাসি, মানুষের অশ্রু, পিতার প্রেম, মাতার ব্যাকুলতা, ভ্রাতার স্নেহ, ভগিনীর মমতা। সেখানে দেখি পরের কার্য্যে নিজের স্বার্থত্যাগ, পরের দুঃখে আত্মবলিদান, পরের জন্য জীবনধারণ। মানুষ মানুকে আকর্ষণ করে; অজন্তার চিত্র ও দর্শকের মধ্যে এক আন্তরিক সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এখানে সেপ্রকার কোন সম্বন্ধ নাই; কৈলাস মন্দিরের দেব দেবীর মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আমরা উদাসীন থাকি, ইহা আমাদিগের অন্তরাত্মাকে তেমন আকর্ষণ করিতে পারে না; আমরা বুঝি যে আমরা এখানে সাক্ষী মাত্র, দেবদেবীর কার্য্য কলাপের দর্শক, কিন্তু অজন্তায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই স্মরণ থাকে যে আমরাই অভিনেতা—দর্শক নহি।

কৈলাস মন্দিরের আর একটী গুরুতর দোষ—অশ্লীলতা, মন্দিরের গাত্রে, বারান্দায়, প্রাচীরে ও হল ঘরের মধ্যে অনেক কুৎসিত মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলি এত কুৎসিত যে দুই বন্ধুও একত্র দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিগুলি অবলোকন করিতে সাহস করিবে না, লজ্জায় তাহাদের মুখ নিশ্চয়ই অবনত হইবে। মানুষের কতদূর অধঃপতন হইলে এবং তাহার হৃদয়ের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলি কি ভাবে তিরোহিত হইলে সে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ও পরামর্শ করিয়া এই মূর্ত্তিগুলি গড়িতে পারে এবং প্রকাশ্য স্থানে রাখিতে সাহস করে—তাহা পাঠক পাঠিকা বিবেচনা করুন। দেশের তখনকার নৈতিক চিত্রের কথা

স্মরণ করুন, যখন বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অসীম ধৈর্য্যসহকারে শিল্পীগণ এই সব ভীষণ কুৎসিত মূর্ত্তি গড়িয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিল। কি শক্তিই তাহারা এই প্রকারে ক্ষয় করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবারও বলি—তাহাদের শক্তি ছিল অসীম, কিন্তু শিক্ষা ও রুচি ছিল অধম। তাই বলিতেছিলাম অজন্তা হইতে এলোরা আসিলে মনে হয় স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আসিলাম। অজন্তায় আছে কমনীয় সৌন্দর্য্য, এলোরায় আছে অমানুষিক শক্তির নগ্নদৃশ্য, অজন্তায় আছে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, এলোরায় দেখি দেবদানবের তাণ্ডব নৃত্য; অজন্তায় আছে সুমার্জ্জিত রুচির সংযত চিত্র, এলোরায় আছে পাশবিক রুচির উদ্দাম মূর্ত্তি। অজন্তায় হাজার হাজার চিত্র আছে কিন্তু একটী চিত্রও কুৎসিত নহে। যাহারা কৈলাস মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাদের নিকট নিশ্চয়ই ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অন্যান্য হিন্দুগুহা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, সমস্ত হিন্দু গুহাতেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে—সর্ব্বত্রই মহাদেব ও পার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি। এখানে একদিন শৈব যোগী ঋষিগণ তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু কয়েকটী গুহা দেখিলেই বুঝা যায় যে সে গুলি একদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুকের আশ্রয়স্থল ছিল, গুহাগুলি হয়ত বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া শিবমন্দিরে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, বুদ্ধদেবের যোগাসীন মূর্ত্তি সরাইয়া দিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। হিন্দু গুহাগুলিতে যে বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রায় কোন মূর্ত্তিই মানুষের ন্যায় দেখিতে নহে, কাহারও ছয় হাত, কাহারও আট হাত, কাহারও কাহারও তিন মুখ, কাহারও দশ মুখ, কাহারও তিন চোখ, কাহারও বা কুড়ি চোখ—এই ভাবে দেব দেবী, যক্ষ রক্ষের ধারণা করা হইয়াছে। গ্রীকেরাও দেবতাকে মানুষ ভাবে কল্পনা করিয়াছে —জুপিটার, ভিনাস, মারকারি সকলেই মনুষ্যাকৃতি দেবতা, কিন্তু এ দেবতাগুলি বিকৃত নহে, পাঁচ হাত বা দশ মুণ্ড দিয়া দেবতা গুলিকে কোন অস্বাভাবিক জন্তুতে পরিণত করা হয় নাই, সকলেরই দেহ-সৌন্দর্য আছে, দেখিতে কেহই বিকট নহে। কিন্তু গ্রীক-মূর্ত্তিগুলির তুলনায় হিন্দুমূর্ত্তিগুলি দেখিতে কদাকার, গ্রীক মূর্ত্তিগুলিকে দেখিয়া যেমন আনন্দ হয়, হিন্দু মূর্ত্তিগুলিকে দেখিয়া তেমন আনন্দ হয় না। তিন মুণ্ড বা হস্তিশুণ্ড বা অর্দ্ধ পশু দেখিলে সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্যের উদ্রেক হইতে পারে বটে কিন্তু সৌন্দর্য্যপিপাসা বর্দ্ধিত হয় না। Sir William Archer হিন্দু মূর্ত্তিগুলির বিকট আকার দেখিয়া এই আর্টকে Barbarous Art বলিয়াছেন; Barbarous কথাটা হয়ত খুব কঠোর, তবে Barbarous না হইলেও এ আর্ট যে Fine Art নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রীক মূর্ত্তিগুলিতে যে দেহলালিত্য আছে তাহা হিন্দুমূর্ত্তিগুলিতে মোটেই নাই। গ্রীক শিল্পীগণ মনুষ্যশরীরের গঠন প্রণালী (Anatomy) সম্বন্ধে ভালরূপ শিক্ষা লাভ করিত; তাহা শিখিবার তাহাদের সুযোগও বেশ ছিল; সর্ব্বসাধারণের জন্য যে স্নানাগার থাকিত সেখানে যাইয়া তাহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন প্রণালী অবলোকন করিত; কোথায় মাংসপেশী বেশী, কোথায় চর্ব্বি বেশী, কোথায় বা হাড়ের পরিমাণ অধিক, কোন মাংস-

পেশী কখন কি প্রকার অবস্থা ধারণ করে, ইহা তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অবলোকন করিত। রঙ্গমঞ্চে যোদ্ধাগণ যখন কেবল মাত্র এক ল্যাঙ্গোট পড়িয়া আসিয়া বাদ্যের তালে তাল রাখিয়া হিংস্রপশুদের সহিত যুদ্ধ করিত,তখনও শিল্পীগণ মনুষ্যদেহ অবলোকন করিবার সুযোগ পাইত; কখন কোন মাংসপেশী ফুলিয়া ওঠে, কি ভাবে কতখানি ফুলিয়া ওঠে, কখনইবা আবার নরম হইয়া যায় তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তাহাদের কার্য্যে নিয়োগ করিত; সেইজন্ত গ্রীক্ মূর্ত্তি গুলি দেখি জীবন্ত, অন্তরের ভাবটী চোখে মুখে দেহে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু হিন্দু-মূর্ত্তিগুলিতে ভাব যেন তেমন প্রকাশ পায় নাই। এই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া মনে হয় দেহের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে হিন্দুশিল্পীদের তেমন বিশেষজ্ঞান ছিল না; তাহারা ধারণা করিয়া মূর্ত্তি গড়িয়াছে, দেখিয়া গড়ে নাই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ, মাংসপেশীর ক্রিয়া কিছুই তেমন জীবন্ত ভাবে রচিত হয় নাই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার মধ্য দিয়া ভাবের সমন্বয় আনিতে একেবারে হিন্দু শিল্পীগণ সক্ষম হয় নাই।

এতক্ষণ হিন্দুগুহা সম্বন্ধে বলিতেছিলাম; এক্ষণে বৌদ্ধ ও জৈন গুহা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। হিন্দু গুহা হইতে বৌদ্ধ গুহাতে যাইবামাত্র বুঝা যায় যে এক নূতন যায়গায় আসিয়াছি। কোথাও কোন প্রকার কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি নাই; যে দুই একটী মূর্ত্তি আছে তাহা বুদ্ধ দেবের যোগাসীন শান্তমূর্ত্তি, দেখিলেই স্বভাবতঃই ভক্তির উদ্রেক হয়। হিন্দুদের কল্পনা শক্তি যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সকল আইন কানুন ভঙ্গ করিয়া এক প্রবলঝঞ্ঝার ন্যায় বহিয়া গিয়াছে কতপ্রকার অদ্ভুত কল্পনাই তাহারা করিয়াছে, কত অনাবশ্যক মূর্ত্তিই না তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া গিয়াছে, কোনটীর যে প্রয়োজন আছে আর কোনটীর যে প্রয়োজন নাই তাহা বিবেচনা করিবার সময় তাহারা যেন পায় নাই; আবশ্যকতা থাকুক বা না থাকুক তাহারা কেবলই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ গুহা গুলিতে এ প্রকার কোন অসংযমের বা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ পাওয়া যাইবে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত মূর্ত্তি তাহারা নির্ম্মান করে নাই, তাহাদের সৃষ্টি শক্তি তাহারা অযথা অপব্যয় করে নাই, জীবনের কঠিন সংগ্রামে তাহারা সংযম অভ্যাস করিয়াছে, কল্পনার রচনা প্রবৃত্তিতেও তাহারা সেই সংযমের পরিচয় দিয়াছে। সংযমের এই কঠোর অভ্যাস শিল্পীর চিত্ত ও হস্তকে সংযত রাখিয়াছে, হিন্দু মন্দিরের ন্যায় এখানে তেমন হৈ চৈ, ধুমধাম, জাঁকজমক, তোলপাড় কিছুই নাই, বরং এই সংযতভাবের জন্য বৌদ্ধমন্দিরে যে সরলতার আবহাওয়া পাই তাহা অন্যত্র বিরল। আর্টের দিক হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে হিন্দুমন্দির ও মুসলমান মসজিদ পরস্পর বিরোধী, দুইটীই চরমপন্থাবলম্বী, মন্দির গিয়াছে জাঁকজমকের আতিশয্যের দিকে, আর মসজিদ গিয়াছে সরলতার আতিশয্যের দিকে। কিন্তু কোন আতিশয্যই ভাল নহে, জাকজমকের ধুমধামের এবং সরলতার নগ্নদৃশ্য—দুইএর একটীকেও "সুন্দর" (beautiful) এই বিশেষণে অভিহিত করা যায় না। মূর্ত্তি যতই মহান ও পবিত্র হউক না কেন মসজিদে তাহার স্থান নাই; আর মন্দিরে সুন্দর ও অসুন্দর সকল প্রকার মূর্ত্তিই বিরাজ করিতেছে; কিন্তু বৌদ্ধ বিহারগুলি মধ্যপন্থাবলম্বী; খৃষ্টানদের গির্জাও এই দলভুক্ত।

এখানে মন্দিরের জাঁকজমক নাই, অথচ মসজিদের শূন্যভাবও নাই। আবশ্যকীয় কয়েকটী মাত্র মহান পবিত্র মূর্ত্তি গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া শোভা পাইতেছে।

জৈনগুহা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; গুহাতে বুদ্ধদেবের পরিবর্ত্তে মহাবীরের মূর্ত্তি আছে; এবং এই মূর্ত্তি দেখিতেও প্রায় বুদ্ধের মত; যাঁহারা জানে না তাহারা অনেকেই এই মূর্ত্তিকে বুদ্ধ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। তবে বৌদ্ধগুহাগুলিতে সরলতার যে আবহাওয়া আছে, এখানে তাহা নাই; অথচ ধূমধামের আড়ম্বরও তেমন নাই—যেন হিন্দুদের মত আড়ম্বর করিতে গিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। মোটের উপর, জৈন গুহাগুলি হিন্দুগুহা ও বৌদ্ধগুহার ব্যর্থ অনুকরণ বলিয়া বর্ণনা করিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

অজন্তা গুহার সহিত এলোরা গুহার তুলনা করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। গুহা হিসাবে এলোরা গুহা অজন্তা গুহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অজন্তা গুহার মুখ ছোট, ভিতরে যাইয়া বড় হইয়াছে; মুখ ছোট হওয়াতে ভিতরে আলো ও বাতাস বেশী যাইতে পারে না; কিন্তু এলোরার গুহাও যেরূপ বৃহৎ, ইহার প্রবেশ দ্বারও তদ্রূপ। সেই জন্য ভিতরে আলো বাতাসের কোন অভাব নাই। অনেকগুহা (বিশেষতঃ বৌদ্ধগুহা) দেখিতে কোন আধুনিক স্কুল বা কলেজ গৃহের ন্যায়। ত্রিতল গুহাগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর; সম্মুখে খোলা বারান্দা, ভিতরে বৃহৎ হল ঘর, প্রচুর আলো ও বাতাস। গুহার মধ্যে দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিতে পাই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। স্তম্ভের উপর যে সব কারুকার্য্য রহিয়াছে তাহাও অজন্তার কারুকার্য্য অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। পাথরের উপর এরূপ রেখাভঙ্গিমা অজন্তায় পাওয়া যায় না। তবে মোটের উপর অজন্তা এলোরা অপেক্ষা অনেক সুন্দর; অজন্তা আছে স্বপ্নজগতে, এলোরা আছে বাস্তব জগতে, অজন্তা স্বর্গীয়, এলোরা পার্থিব।

শ্রীইন্দু ভূষণ মজুমদার

শিখ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আকালীরা কোন দিনই সম্পূর্ণভাবে কোন শাসনকর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করে নাই; গুরুই এবং গুরুর বাণীই তাহাদের একমাত্র প্রভু, সঙ্গতই বা গুরুমত্তাই তাহাদের জীবনের বিধায়ক, অন্য কোন শাসন তাহারা মানিবে না। ১৭৬৪খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ দুরানী যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন শিখগণ বিভিন্ন নেতার অধীনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা এইবার অমৃতসরে মিলিত হইয়া গুরুমত্তা করিল। এইখানেই বারজন বিভিন্ন নেতার অধীনে বারটী বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভিত্তিপত্তন হইল। বৎসরের পর বৎসর "সরবৎ খালসা" অর্থাৎ সমগ্র শিখ সম্প্রদায় এইভাবে দিপালীর দিন সমবেত হইত; এখনও

সেই প্রথা চলিয়া আসিতেছে যদিও এই সম্মেলনীর এখন কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই ; কিন্তু সমাজের অত্যাচার অবিচার দূর করা, নিজেদের অন্যান্য উন্নতির ব্যবস্থা করা এই সম্মেলনী ভালভাবেই করিয়া আসিয়াছে। দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া এই সম্মেলনী যোগদান করা শিখগণের পক্ষে অন্যতম ধর্ম্মানুষ্ঠানের মতই হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্মেলনী উপলক্ষেই ১৯১৯খৃষ্টাব্দে জালিবানবালাবাগের হত্যাকাণ্ড অভিনীত হয়। Cunringham এই প্রকার সম্মেলনীকে theocratic confederate feudalism নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৭৬৪খৃষ্টাব্দে এই সম্মেলনীতে বারটী মিসিল হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নেতা পরবর্ত্তীকালের শিখ ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে "শুকরজাতিয়া" মিসিলে মহারাজা রণজীৎ সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ রাজ্যগুলিকে একত্রিত করিয়া বিরাট শিখ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেন। অন্যতম মিসিল "ফুলকিয়া"র নেতৃবৃন্দই পাতিয়ালা নাভা ঝিন্দ প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আকালীরা কোন মিসিলেরই অন্তর্ভুক্ত না হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল Cunningham লিখিয়াছেন

"Besides the regular confederacies with their moderate degree of subordination, there was a body of men who threw off all subjection to earthly governors, and who peculiarly represented the religious element of Sikhism. These were the "Akalis", the immortals or rather the soldiers of God, who with their blue dress and bracelets of steel, claimed for themselves a direct institution by Govind Singh The Guru had called upon men to sacrifice everything for their faith, to leave their homes, to follow the profession of arms; but he and all his predecessors had likewise denounced the inert asceticism of the Hindu sects, and thus the fanatical feeling of a Sikh took a destructive turn. The Akalis formed themselves in their struggle to reconcile warlike activity with the relinqueshment of the world. The meek and the humble were satisfied with the assiduous performance of menial offices in temples but the fierce enthusiasm of others prompted them to act from time to time as the armed guardians of amrittas or suddenly to go where blind impulse might lead them and to win their daily bread, even singlehanded at the point of the sword. They also took upon themselves something of the authority of censors and although no leader appears to have fallen by their hands for defection to the Khalsa, they inspired

awe as well as respect, and would sometimes plunder those who had offended them or had injured the commonwealth. The passions of the Akalis had full play until Ranjit Singh became supreme and it cost that able and resolute chief much time and trouble at once to suppress them and to preserve his own reputation with the people".

(Cunningham—History of the Sikhs Chap. IV)

রণজীৎসিংহকে আকালী ফুলাসিংহের সহায়তাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সত্য বটে তাঁহার শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্যে শিখজাতি ও ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত গণতন্ত্রবাদে আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাহা অনেকঅংশেই বিনষ্ট হইয়াছিল, সত্য বটে আকালীগণের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা কোন কোন সময়ে মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাইত, তবুও আকালীগণের এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, ধর্ম্মানুরাগ ও গুরুভক্তি কোন কালেই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই সুপ্ত গুণগুলিই পরবর্ত্তী কালে শিখজাগ্রতি সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল।

গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যতীত অন্য সকল প্রকার রাষ্ট্রেই অভিজাতবর্গের সহিত শাসকবর্গের একটা স্বার্থের যোগ থাকে যাহার বলে অভিজাতবর্গ শাসকসম্প্রদায়ের সম্মুখেই অনেক অত্যাচার করিতে সাহস পায়। শাসক সম্প্রদায় ও অভিজাতবর্গের অনেক দোষ দেখিয়াও দেখেন না; কারণ অভিজাতবর্গের স্থায়িত্বে তাঁহাদের নিজেদের অবস্থা নিশ্চিত থাকে। মহারাজা রনজীৎ সিংহের মৃত্যুর পর, স্বার্থান্ধ ক্রুর বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীগণের হাতে পড়িয়া প্রকাণ্ড শিখ সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ইংরেজ সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া তাহা ছলে বলে হস্তগত করিলেন; গৃহবিবাদে আর একবার ভারতের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইল।

এই অরাজকতার সময় বহু দুষ্ট শিখ গুরুদ্বারাগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; গুরুদ্বারা ও তাহাদের সংশ্লিষ্ট প্রকাণ্ড ভূসম্পত্তিগুলি এইরূপ কতকগুলি দুরাচার লোকের হাতে আসিয়া পড়ায় তাহারা যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল; শিখধর্ম্ম তখন নিজেদের বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারের সর্ব্বথা প্রতিকূলাচরণের আদর করিতে ভুলিয়াছে; শিখগণ তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর মোহন্তদিগের কর্ম্মে বাধা দেওয়া তখন সম্ভবপর হয় নাই। শিখসমাজও তখন গৃহবিবাদে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল, জনসাধারণ গুরুগণের প্রচারিত কঠোর ধর্ম্ম ভুলিয়া, আদর্শ ভুলিয়া বিলাসিতা, নির্জ্জীবতার পঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গুরুদ্বারগুলি শিখগণের নিকট কত প্রিয়, শিখধর্ম্মে গুরুদ্বারগুলির স্থান কত উচ্চে। এখন এই সকল বিলাসী ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কুটিল মোহন্তগুলির জন্য সেগুলি পাপের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। শিখধর্ম্মে পৌত্তলিকতার স্থান নাই, স্থানে স্থানে গুরুদ্বারগুলিতে দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজিত হইতে লাগিল; ধর্ম্মে ও সমাজে যখন ব্যাধি প্রবেশ করে তখন সহজেই তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়ে।

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট গুরুদ্বার তথা শিখধর্ম্ম ও সমাজের এই কেন্দ্রগুলির পবিত্রতা রক্ষার

জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন না ; কারণ বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী এই মোহন্ত গুলির সহিত তাহাদের নিজেদের স্বার্থ অনেক অংশে জড়িত ছিল। গুরুদ্বারের সম্পত্তিগুলি কোন মতেই মোহন্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে না ; মোহন্তগুলির হস্তে সেগুলি শুধু সমাজ ও ধর্ম্ম সেবার জন্য ন্যস্ত মাত্র ; সাধারণতা লঙ্গর প্রভৃতির জন্য সেগুলি ব্যয়িত হইবে কিন্তু মোহন্তগুলি সুযোগ পাইয়া সেগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিতে লাগিল ধর্ম্মের জন্য সেগুলি না লাগিয়া মোহন্তগণের ব্যভিচার ও বিলাসের আয়োজন যোগাইবার জন্য লাগিল।

অত্যাচারী ব্যভিচারী মোহন্তদিগের পদচ্যুত করিবার জন্য আইন হইল বটে কিন্তু ততদিনে মোহন্তগণ নিজেদের অধিকার এমন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল আর আইন এতদূর কুটিল ছিল যে কোন প্রতিকার করা প্রায় অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছিল।

ধর্ম্মের ও সমাজের এই দুর্দ্দশার সময় কয়েকজন মহাপ্রাণ শিখের হৃদয়ে সমাজ ও ধর্ম্মকে নিষ্কলুষ করিয়া অতীতের মহাআদর্শকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ইহাই সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত। এইরূপ প্রথম আন্দোলন নিরঙ্করী নামে অভিহিত গুরুদ্বারগুলিতে যে দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজিত হইয়া ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার গ্লানি আসিয়া পড়িতেছিল ইহা তাহারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। পেশবারের বাবাদয়াল এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ; তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন ; শিখগুরুগণ মদ্যপান নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে শিখগণের মধ্যে মদ্যপান বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়া পড়িতেছিল, তিনি ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করেন, কিন্তু এই আন্দোলন বিশেষভাবে সফলতা লাভ করে যাই।

দ্বিতীয় উল্লেখ যোগ্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বাবা বালক সিংহ ও তাঁহার শিষ্য বাবা রামসিংহ। ইহা নামধারী আন্দোলন নামে অভিহিত ; ইঁহাদের শিষ্যগণ নামধারী সম্প্রদায়রূপে পরিচিত। বাবা রামসিংহ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন ; তিনি গুরুদ্বারের মোহন্তগুলির অত্যাচার ও ব্যাভিচারে সমাজের ও দেশের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা ও লঙ্গরের প্রতিষ্ঠা করেন ; পাশ্চত্য সভ্যতা যে ভাবে দেশের স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব হরণ করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন ; প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে অসহযোগের প্রচার তিনিই প্রথম করেন ; তিনি গবর্ণমেণ্টের সকল প্রকার সংশ্রব ছিন্ন করিতে, আইন আদালত ও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষায়তন ও চাকুরী বর্জ্জন করিতে শিষ্যগণকে উপদেশ দেন ; প্রথমত নামধারী সম্প্রদায়ের শিখগন গুরুর এই আদেশ পালন করে ; শুনিতে পাই কতকগুলি বিশেষ ভক্ত নামধারী রেলগাড়ী চড়ে না, গবর্ণমেণ্টের ডাক বিভাগের সাহায্য পর্য্যন্ত লয় না। রামসিংহের প্রবর্ত্তনায় দেশময় জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

পুরোহিত মোহন্ত সম্প্রদায় বাবা রামসিংহের উপদেশে বিরক্ত হইয়া উঠিল, গবর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্য সভ্যতার এই নিন্দাবাদে ও অসহযোগের প্রবর্ত্তনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন ;

তাঁহারা পাশ্চত্য সভ্যতার এই নিন্দাবাদকে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন বলিয়া ধরিয়া লইলেন।

বাবা রামসিংহ দয়া, সত্যনিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছিলেন; অশিক্ষিত জনসাধারণ তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। কোন কোন স্থলে ধর্মান্ধতা অসহিষ্ণুতারূপে দেখা দিতে লাগিল; মালেরকোট্‌লা নামক স্থলে জনৈক মুসলমান কসাই কর্তৃক গোবধ বন্ধ করিতে গিয়া কয়েকজন নামধারী দাঙ্গা করিয়া বসিল। অধিকাংশই ধরা পড়িল; কয়েকজনকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইল, বিচারের অভিনয়ে বহুজনের ফাঁসী হইল। বাবা রামসিংহ ধরা পড়িলেন; তিনি দাঙ্গার সম্ভাবনা দেখিয়া পুলিসকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দূর করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল; এই সুযোগ তাহারা বাবা রাম সিংহকে কয়েকজন অনুচরের সহিত ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত করিল।

তাঁহার নির্ব্বাসনের পরই তৎপ্রবর্ত্তিত আন্দোলনের শেষ হইয়া যায়। ইহার পর ১৮৮৮ খৃঃঅব্দে লাহোরে খালসা দিবান নামে একটী সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল এবং শীঘ্রই ইহার শাখা দেশ ছাইয়া ফেলিল; এই সভার উদ্দেশ্য পূর্ব্ববৎই গুরুদ্বারগুলির পবিত্রতা ও নিজেদের সামাজিক উন্নতি বিধান করা। কিন্তু সমিতি বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন শিক্ষার প্রচারে। শিখগণ এই সময়ে নিজেদের মধ্যে শিক্ষার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। এই সমিতির চেষ্টাতেই খালসা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল!

খালসা দিবান শিখ সমাজে নব জাগরণের সূচনা করিয়া দিয়াছিল! কিন্তু কিছু কাল পরেই এ সমিতি অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়ায় প্রধান খালসা দিবান নামে আর একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বতন সমিতির কাজ হাতে লইল।

এই সময়ে শিখগণ গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র, অনুগ্রহভাজন ছিল, সুতরাং এসকল কাজে অনেক সময়েই তাহারা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা পাইতেছিল। এ সহায়তা কতখানি স্বাধীনতার বিনিময়ে কিনিতে হয় পরবর্ত্তীকালে খালসা কলেজের অবস্থাতে তাহা বোঝা যায়। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে ইহার ভার নিজের হাতে লইয়া শিখগণের প্রভাব ক্ষুন্ন করিয়া দিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে ইহা গবর্ণমেণ্ট কলেজেরই মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সহিত শিখগণের প্রথম বিরোধ বাধিল ১৯১২ সালে।

দিল্লীর নবরাজধানীতে যেখানে বড়লাটের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছিল তাহারই সম্মুখে রিকাবগঞ্জ গুরুদ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

এইখানেই অওরঙ্গজেবের অত্যাচারে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত নবম্‌গুরু তেগবাহাদুরের মৃতদেহের সৎকার হয়; সুতরাং এই স্থানটী শিখদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। গুরুদ্বারটী একটী খারাপ প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল; লাটভবনের সম্মুখে এরূপ একটা কুদৃশ্য প্রাচীর রাখা যায় না; গবর্ণমেণ্টল্যাণ্ড একুইজিশনের আইনে গুরুদ্বারার মোহন্তের সহায়তায় গুরুদ্বারা ও প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী জমি কিনিয়া লইলেন। ১৯১৪ সালে এই দেওয়ালের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। লাহোরের প্রধান খালসা দিবান গবর্ণমেণ্টের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মান্ধতাই এখানে বিরোধ জাগাইয়া তুলিল। এখানে গবর্ণমেন্ট যে ধর্ম্মে হাত দিয়াছিলেন বা অত্যাচার করিতে ছিলেন এ কথা বলা চলে না। গবর্ণমেন্ট গুরুদ্বারের সম্পর্কিত যে জমিগুলি লইয়াছিলেন তাহার বিনিময়ে ভাল জমিই দিয়াছিলেন ; গুরুদ্বারার পূজা পাঠ ও গমনাগমন সম্বন্ধে কোন প্রকার বিধি নিষেধ তাঁহারা রাখেন নাই ; তাঁহারা শুধু গুরুদ্বারসংলগ্ন জমীটাকে নিজেদের অধীনে রাখিয়া সুন্দর করিতে চাহিলেন ; তাহাদের এই শেষ প্রস্তাবটী শিখদের মনোমত হইল না।

ধর্ম্মান্ধ, অন্ধভক্তিপরায়ণ লোক সকল দেশেই সকল সময়েই থাকে ; তাহারা সুযোগ পাইলেই কোলাহল করে ; তাহাদের বিশ্বাসের মূল্য আছে সত্য কিন্তু অনেক সময়ে তাহা অবাঞ্ছিত ফল প্রসব করে ; এবং বাহুল্যের সৃষ্টি করে।

রিকাবগঞ্জ গুরুদ্বার লইয়া এই বিরোধে বেশ আন্দোলনই জাগিয়া উঠিল ; স্থানে স্থানে সভা হইতে লাগিল ; অবশেষে গবর্ণমেন্টকে বাধ্য হইয়া সভা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। ঠিক এই সময়েই আরো কতকগুলি কারণে শিখগণের মন আলোড়িত হইতেছিল। রাবী নদী হইতে অমৃতসরের পবিত্র পুষ্করিণীগুলিতে ভাল জল আনিবার জন্য একটী খাল বৃটিশশাসনের বহুপূর্ব্বেই খনিত হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট কি কারণে জানি না এই খাল বন্ধ করিয়া জল সরবরাহের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করিলেন। বহুদিনের প্রচলিত প্রথায় বাধা পড়ায় শিখগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল।

কৃপান ব্যবহার ও জেলে কঙ্খা চিরুণী ব্যবহার লইয়াই আন্দোলন চলিতেছিল ; এই দুইটাই শিখগণের পক্ষে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ধর্ম্মসাধনপঞ্চকের অন্যতম ছিল। কৃপাণগুলির দৈর্ঘ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল না! গবর্ণমেন্ট কৃপাণ ব্যবহারের আন্দোলন সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না। দেশে বীর্য্যের অনুশীলন হয় ইহা বোধহয় তাঁহাদের মনোমত হয় নাই ; তাঁহারা কৃপাণের দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করিয়া কৃপাণ ব্যবহারের আন্দোলন নষ্ট করিতে চাহিলেন।

এইরূপ নানাকারণে যখন শিখগণের মন উত্তেজিত হইতেছিল তখন কোমাগাটা মারু জাহাজের ঘটনা হইয়া শিখগণের মনে অসন্তোষ ও বিরোধ বাড়িয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ভয় সিংহ

উপায় নির্দ্ধারণ

প্রসিদ্ধ লেখক এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ তাঁহার "Outline of History"তে, ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের গঠনকার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ঠিক যতটুকু পরিষ্কার করিয়া ভাবা হইয়াছিল, বিপ্লবীরা তাহার সমস্তই করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বেশী আর কিছুই কোন দিকে গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। বাংলার চিন্তাজগতের বর্ত্তমান অবস্থায় ওয়েলসের এই কথা বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং মূল্যবান।

প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, আমরা আমাদের মঙ্গলঅমঙ্গলের কথা লিখিয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার আগেও আলোচনা হইয়াছে এবং খুব ব্যাপকভাবেও হইয়াছে, কিন্তু আলোচকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এই কুড়িবৎসরে প্রায় একসহস্র লোক (এটা সম্পূর্ণ আমার আন্দাজ) নানা দিক্ হইতে এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন; কিন্তু আজও আমরা মঙ্গলঅমঙ্গলের কুয়াশা কাটাইয়া কোনও পরিষ্কার জায়গায় আসিতে পৌছিতে পারি নাই। ইহার কারণ কি? কেন এমন হয়?

এই প্রশ্ন নিতান্ত তুচ্ছ প্রশ্ন নয়; এই প্রশ্নের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই আমার উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইবে। হঠাৎ ইহার একটা উত্তর দিতে আমি মোটেই সমর্থ নই এবং উত্তর দেওয়া উচিৎও মনে করি না। তথাপি কোন্ দিক দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে, সেই বিষয়ে কিছু আন্দাজ দিতে চেষ্টা করিব।

একটা নির্দ্দিষ্ট সমস্যা লইয়া বিচার আরম্ভ করা যাউক্। সমস্যার মোটেই অভাব নাই; আমি "বঙ্গসমাজে নারীর অবস্থা" এইটাকেই বাছিয়া লইলাম। দেখা যাউক আমরা এই বিষয়ে কতগুলি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

প্রথমতঃ বঙ্গসমাজে নারীর কথা আলোচনা করিবার সময় সময় আমরা মোটেই মুসলমান রমণীর উল্লেখ করি না। কেন? বাঙ্গলাদেশের মুসলমান কি বাঙ্গালী নয়? মুসলমান রমণী কি বঙ্গসমাজের অন্তর্ভূক্ত নন? বঙ্গসমাজে নারীর কথা কাগজে যত আলোচিত হইয়াছে, এক স্বরাজ ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই এত বেশী আলোচিত হয় নাই; কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু লেখকের লেখা পড়িলে এ সন্দেহ আদৌ হয় না যে বঙ্গসমাজে মুসলমান আছে এবং এবং মুসলমানগণের মধ্যে নারীও থাকিতে পারে।

হিন্দুলেখকের পক্ষে মুসলমানরমণীর বিষয় আলোচনা করা উচিত কিনা ইহা এক বিভিন্ন প্রশ্ন—এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বুদ্ধিজীবন যদি সজাগ থাকিত তাহা হইলে কোন' লেখকই শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমানের কথা বলিতে গিয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী এই দুইটা শব্দের অপব্যবহার করিতে সাহস পাইত না।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দু সমাজের নারীর কোন শ্রেণী বিভাগ করা কেহই আবশ্যক মনে করেন না। হিন্দু সমাজের সমস্ত নারীর অবস্থা কি একই? কায়স্থ পরিবারের নববিবাহিতা বধূ এবং আগুরী চাষীর কর্ম্মঠ স্ত্রী কি সমানই পর্দ্দানশীন? অধ্যাপক কন্যা এবং কুম্ভকার কন্যার শিক্ষার সমস্যা কি একই? মৌলিক কায়স্থকন্যা এবং রজককন্যার বিবাহে কি সমানই পণ দিতে হয়? এই সকল প্রশ্নের কোনই উত্থাপন দেখি না। যাহা কোন বিশেষ শ্রেণী-সম্বন্ধে খাটে তাহা সমস্ত হিন্দু সমাজের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যে ভুল এবং এই রূপ ভুল করা যে অপরাধ, এই বিষয়ে কোন সজাগ কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় খুব অল্প লেখকের মধ্যেই দেখিতে পাই।

অবশ্য অধিকাংশ লেখায় যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত এবং ভদ্র পরিবারের নারীর কথাই আলোচিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু যে সকল শব্দ ব্যাবহার

করি তাহার অর্থ যথাসম্ভব স্থির থাকা দরকার। একজন বিখ্যাত লেখক Philosophyর সংজ্ঞা দিয়াছেন "A Criticism of Categories"; কথাটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। Terms ও Concepts, শব্দ ও কোন বিশেষ শব্দে ঠিক কি কি বুঝায়, তাহা নির্দ্দিষ্ট ভাবে সংজ্ঞীভূত না হইলে, পরিষ্কার চিন্তা করা ও অপরের চিন্তায় যোগ দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহা এতদূর সত্য যে ইহার উল্লেখ মানুষের বুদ্ধির পক্ষে অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের চিন্তাজগতে এই সহজ সত্যের ব্যতিক্রমটাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত এবং ভদ্র পরিবারের নারী সম্বন্ধে যদিও অসংখ্য আলোচনা হইয়াছে, তথাপি আমরা কি চাই, আমাদের লক্ষ্য ঠিক কি কি, বর্ত্তমান অবস্থার ঠিক কি কি পরিবর্ত্তন হইলে মঙ্গল নামক আমাদের অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কতটা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে তাহা এতটুকুও পরিষ্কার হয় নাই, এমন কি তাহা নির্দ্দিষ্ট করার কোনরূপ চেষ্টাও হয় নাই। ফলে হইয়াছে, একজন লেখক কিছু লিখিতে ইচ্ছা হইলেই, গোড়া হইতেই সমস্তই আলোচনা সুরু করিয়া দেন এবং আর একজন লেখক তাহার কিছুই না বুঝিয়া, অতি সহজে সমস্তটাই ভুল দেখাইয়া দেন।

ধরা যাউক্ স্ত্রীস্বাধীনতা! সকলেই এই শব্দের সহিত সুপরিচিত। কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতা বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি? বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের নারীর অবস্থার ঠিক কি কি পরিবর্ত্তন হইলে, স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের আকাঙ্ক্ষার ও দাবীর পূরণ হইতে পারে? এ বিষয়ে কোনই মতৈক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার কারণ স্ত্রীস্বাধীনতা বলিতে অধিকাংশই লেখকই যদিও ইউরোপীয় নারীর এবং ব্রাহ্ম নারীর সামাজিক অবস্থা যেরূপ তাহাই বুঝিয়া থাকেন এবং হিন্দু সমাজে তাহা হইতে পারিলে ভালই হইত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা তাঁহারা দরকার মনে করেন না। তাহা না করিয়া তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করেন হিন্দু নারীর অবস্থাটা একবার ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিলেই তাহার মধ্যে অনেক ভাল জিনিষ দেখিতে পাইব এবং ব্রাহ্ম নারীর অবস্থার মধ্যে একবার দোষ খুঁজিতে আরম্ভ করিলে বিস্তর দোষ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িবে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া যে সকল লেখক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তাঁহারা ইঁহাদের মতের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবাদে মনোযোগ দেন। এইরূপে আসল কথাটা পূর্ব্বেকার মতই অপরিষ্কার থাকিয়া যায়।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। লেখকের পর লেখক এখনও আলোচনা করিতেছেন, শিক্ষা না পাইয়াও রাম বাবুর প্রপিতামহী কোনরূপ দুঃখের আত্ম-জীবনী লিখিয়া যান নাই, কাজেই রাম বাবুর স্ত্রীর যদি কোন দুঃখ থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাল্মিকীর কাব্যে সীতা রামের অনুগামী হইয়াছিলেন, সুতরাং সুরেশচন্দ্রের স্ত্রী যে স্বামীর কথার উত্তর দিতে শিখিয়াছে তাহা কেবল বেথুন কলেজে পড়িয়াই। এক কথায় শিক্ষা না পাইয়াও কতকগুলি লোক সুখী হইয়াছেন সুতরাং শিক্ষাই আমাদের সমস্ত দুঃখের একমাত্র কারণ। দক্ষতর লেখকেরা, এই সমস্ত প্রলাপের মধ্যে কোথায় কোথায় সঙ্গতির অভাব

হইয়াছে, তাহা দেখাইতেই নিজেদের ব্যস্ত রাখিয়াছেন। এদিকে নারীদের কতটা শিক্ষা চাই এবং কিরূপ শিক্ষা চাই, তাহাদের রোমের ইতিহাস পড়া দরকার না মৎস্যপুরাণ পড়া দরকার, শিক্ষা পাইতে কি সকলকে বাধ্য করা উচিত না শিক্ষা ব্যাপারটা লোকের মর্জ্জির উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, এই সকল ও আরও অসংখ্য জটিল প্রশ্ন সমানই জটিল হইয়া রহিয়াছে। কিছু একটা ঠিক করিয়া ফেলা যে দরকার এবং তাহা না হইলে বেশ চেতনভাবে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়িয়া তোলা যে একেবারে অসম্ভব, এই সত্যের প্রভাব আমাদের চিন্তাজগতে খুবই অপরিস্ফুট।

চতুর্থতঃ, লক্ষ্য কি তাহা স্থির না থাকার দরুণ, উপায় স্থির করার চেষ্টা আমরা আদৌ করি নাই। কি চাই তাহাই যখন জানি না, তখন তাহা লাভ করার উপায় স্থির করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু চিন্তা করার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে তাহা হইল, দুঃখের নিকট, অসত্যের নিকট পরাজয় স্বীকার না করিয়া, কাহার উপর নির্ভর করিয়া এই দুঃখ ও এই অসত্য এতদূর বলবান্ হইয়া উঠিয়াছে তাহা নির্ণয় করা, এবং অনুসন্ধান করা কোন্ উপায়ে তাহাদের আক্রমণ করিলে তাহারা দূরীভূত হইবে। যদি চিন্তা করার উদ্দেশ্য ইহা না হয় তবে চিন্তা করা বিফল, এমন কি অনিষ্টকর। দুঃখের বিষয়, চিন্তা করিয়া কোনরূপ উপায় ঠিক করা আমরা এতদূর অসম্ভব মনে করি, যে কতকটা এই কারণেই আমরা লক্ষ্য ঠিক রাখা দরকার মনে করি না এবং যাহা ইচ্ছা খানিকটা বকিয়া গিয়া মনের ঝাঁজ কতকটা মিটাইয়া লই।

জোড়াসাঁকোর আনন্দময়ীর কথা অনেকের মনে থাকিতে পারে। "বঙ্গসমাজে নারীর অবস্থা" সম্বন্ধে যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন তাঁহারা সেই ব্যাপারে অনেক মশলা পাইয়াছিলেন এবং লিখিয়া মনের ঝাঁজ মিটাইবার এক অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল হইয়াছিল কি? আনন্দময়ীর দুঃখের ঠিক কারণ কি আবিষ্কৃত হইয়াছিল? ভবিষ্যতে আর যাহাতে এইরূপ ঘটনা না হয় তাহার কি কোন উপায় ঠিক হইয়াছে? কিছুই হয় নাই। কেন না, কিছু যে হইতে পারে এই বিশ্বাস লইয়া রীতিমত চিন্তা করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই।

যে কোন বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে, সেই বিষয়ে যতগুলি প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহার সমস্তগুলির ঠিক উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ এই আনন্দময়ীর ব্যাপারকেই ধরা যাক্। তাহার পিতা তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে পারেন নাই কেননা তাহার স্বামীর ও শাশুড়ীর ইহাতে অমত ছিল। তাহাদের মতের এত জোর কোথা হইতে আসিল? শুনিয়াছি আইনমতে স্বামী তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীকে কাছে থাকিতে বাধ্য করাইতে পারেন। যদি তাহা হয়, তবে সেই আইন বদলান দরকার; সুতরাং আমাদের একটা লক্ষ্য এই আইন তুলিয়া দেওয়া। এইরূপে লক্ষ্য স্থির হইলে, তখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় ঠিক করা চলিতে পারে। আনন্দময়ীর স্বামী তাহাকে বেত্রাঘাত করিলেও ও লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিলেও, বাহিরে কেহই তাহা জানিতে পারিত না। আমাদের সমাজে নারীর ইচ্ছামত বাটীর বাহিরে যাইবার ক্ষমতা থাকিলে কখনই এইরূপ সম্ভব হইত না। সুতরাং দেশে আনন্দময়ীর সংখ্যা কমাইতে হইলে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নারীর ইচ্ছামত

চলাফেরা করার অধিকার লাভ। এই লক্ষ্য কতদূর সম্ভব বা অসম্ভব ইহা পরের কথা। কিন্তু কার্য্যকে তাহার কারণের সহিত যুক্ত করিতেই হইবে। আমরা অক্ষম বা দুর্ব্বল হইতে পারি কিন্তু ভুল বুঝিব কেন?

বঙ্গসমাজে নারীর অবস্থা আলোচনা করাই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি এই প্রশ্ন লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা মঙ্গলজনক নয় বুঝিয়াও আমরা কেন অমঙ্গলের কতকগুলি কারণ এবং সেই কারণগুলি দূর করার কয়েকটি উপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। বঙ্গনারী প্রসঙ্গে দেখিয়াছি আমরা রীতিমত চিন্তা করি না, কার্য্যকারণসম্বন্ধ অনুসন্ধান করি না, conceptগুলিকে সংজ্ঞাভূত অর্থে ব্যবহার করি না, চিন্তা করিয়া লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করি না এবং সকলের উপরে ভাবিয়া উপায় ঠিক করিয়া যে নিজেদের অমঙ্গল নিজেরাই দূর করিতে পারি, এইরূপ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। হয়ত আমার প্রসঙ্গে এই কথাগুলি ঠিক ফুটিয়া উঠে নাই; হয়ত এই কথাগুলি খুব পুরাণো এবং চেনা চেনা বলিয়া ঠেকিতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার প্রধান প্রশ্নটির উত্তর যে কতকটা এই দিকে, এইটুকু পরিষ্কার হইয়া থাকিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

কিন্তু ইহার প্রতিকার কি? অর্থাৎ আলগাভাবে চিন্তা করার প্রবৃত্তির মূল কারণ কি এবং কি উপায়ে আমাদের মধ্যে রীতিমত চিন্তা ও অনুসন্ধান করার প্রবৃত্তি আসিতে পারে? এই প্রতিকার সম্বন্ধে আমার সামান্য কিছু বলিবার আছে।

প্রথমে আলগা চিন্তা ও রীতিমত চিন্তা বলিতে কি বুঝায়, তাহাদের প্রভেদ কি তাহা পরিষ্কার বুঝা দরকার। বাঙ্গালাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন হইতেই, দেশে এখন একদল লোক দেখিতে পাই যাঁহারা বিশ্বাস করেন দেশে নারীস্বাতন্ত্র্যের দরকার, অর্থাৎ সোজাকথায়, নারীরা ইচ্ছামত বেড়াইতে পারে, পরস্পরের সহিত মিশিতে পারে, খোলা মাথায় পুরুষের সহিত সাহস করিয়া কথা বলিতে পারে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, সেরূপই হওয়া উচিত। এমন কি কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, নারীস্বাতন্ত্র্যের অভাবই আমাদের দেশের সব চেয়ে বড় অমঙ্গল। আমি হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কথা বলিতেছি। আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি নারী স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন। এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় দল, কি উপায়ে, আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে নারী স্বাতন্ত্র্য বাস্তবিকই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়া, উদ্দেশ্য লাভের প্রত্যেক ধাপটী মনে মনে গাঁথিয়া লইবার চেষ্টা না করিয়া, শুধু অপর পক্ষের সহিত নিজেদের বিশ্বাস ভুল কি ঠিক এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া, এবং নারী স্বাতন্ত্র্যের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের সমস্ত চিন্তাশক্তি ক্ষয় করিতেছেন। ইহাই আমার মতে আলগা চিন্তা।

এখন রীতিমত চিন্তার একটি উদাহরণ দেখা যাক্। ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবসায় বিপ্লবের ফলে যখন ক্রমে ক্রমে শ্রমিকরা ধনিকদের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িল তখন দেশের অর্থবিভাগের ন্যায় অন্যায়ের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। যাহারা কাজ করে তাহাদের খাইতে পাইবার ও সুখে থাকিবার অধিকার আছে এই বিষয়ে সাধারণ ভাবে অনেক আলো-

চনা ও অশেষ বাদ প্রতিবাদ চলিতে লাগিল; কিন্তু আলোচনা ঐখানেই থাকিল না Fourier, St. Simon, Marx ইত্যাদি জনকতক লোক ভাবিতে বসিলেন, কর্ম্মীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অধিকার ত আছেই, কিন্তু সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিরূপে; যে জনকতক লোক পৃথিবীর যাহা কিছু তাহার তিনভাগ দখল করিয়া বসিয়া আছে তাহাদের বেদখল করা যায় কিরূপে। তাঁহারা সমাজবন্ধনের কোন শৃঙ্খলকেই হাতুড়ী মারিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; সম্ভব অসম্ভব সবরকম সুবিস্তৃত খসড়া তৈয়ার করিতে লাগিলেন। কেহ ঠিক করিলেন রাষ্ট্রকে হাত করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রতে হইবে, কেহ ঠিক করিলেন দেশে বিপ্লব আনিতে হইবে, কেহ ঠিক করিলেন রাষ্ট্রকে একেবারে তু'লয়া দিতে হইবে। তাঁহাদের এই সব নানা ফন্দী ও মতলব প্রথম প্রথম অনেকেরই ঠাট্টার জিনিষ ছিল। কিন্তু আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এই সব ফন্দীবাজ লোকেদের মতলবের ফলেই রুষিয়ার বিপ্লবের মত এতবড় যুগান্তকারী ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারিয়াছে। ইহাই রীতিমত চিন্তা।

ইউরোপের চিন্তার এই বিস্ময়কর সাফল্যের মূল কারণ সেখানকার চিন্তাশীল লোকেদের মনে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অন্ত ছিল না। মানুষের ব্যক্তিত্বের চেয়ে পবিত্রতর জিনিষ তাঁহাদের নিকট আর কিছুই ছিল না। ইহাতে একদিকে যেমন বুদ্ধিকে তাঁহারা বাইবেল, পোপ, গীর্জ্জা, গণতন্ত্র, পালিয়ামেণ্ট, শ্রমবিভাগ, অবাধবাণিজ্যনীতির চেয়ে বেশী বিশ্বাস করিতেন, অপরদিকে তেমনই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নরনারীদের সমস্ত দুঃখ যে কোন উপায়ে দূর করাই তাঁহারা সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। আর একটা কথা, মানুষের শক্তিতে তাঁহারা সন্দিহান ছিলেন না কাজেই কিসে মানুষের মঙ্গল হয়, এই বিষয়ে বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে বাস্তবে পরিণত করার দিকেই তাঁহারা সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের সাফল্যের মূল কারণ।

আলগা ভাবে চিন্তা করার প্রবৃত্তির মূল কারণ কি তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি—মূল কারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। রীতিমত চিন্তা ও অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদের মানুষকে এবং মানুষের বুদ্ধিকে অকুণ্ঠিত ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সেই বিশ্বাসের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করিতে হইবে। আমি বলিতে চাই, এই বিশ্বাস লইয়া সমাজের মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি, ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন বাধা না মানিয়া তাহাকে এই বাঙ্গলাদেশে বাস্তব করিবই, এই উদ্দেশ্যে এখন হইতে উপায় ঠিক করা আরম্ভ হউক্। এই উদ্দেশ্য লইয়া দেশে একটা চিন্তাসংঘ গড়িয়া উঠুক্। আমাদের সমস্ত দাবী সংজ্ঞীভূত হউক্ এবং সেই দাবী আদায়ের যত রকম উপায় থাকিতে পারে, তাহার আলোচনা চলিতে থাকুক্। আজ সময় প্রতিকূল বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু কি চাই তাহা ঠিক না থাকিলে, যেদিন সুবিধা আসিবে সেই অনুকূল মুহূর্ত্তে আমরা কিছুই ভাল করিয়া গুছাইয়া লইতে পারিব না। আমি ওয়েলসের যে কথা দিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই কথার সত্যতা সেইদিন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিব!

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই সকল বিভিন্ন কারণ ও শক্তির সমবায়ে পঞ্চম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপীয় সমাজকে বর্ব্বরতার কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নানা বিচিত্র চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছিল।

প্রথম চেষ্টাটি স্বল্প পরিমাণেই কার্য্যকরী হইয়াছিল, কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, কারণ এ চেষ্টা বর্ব্বর জাতিদের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। ষষ্ঠ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন বর্ব্বর জাতির বিবিধ বিধান সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ হইল। ইহার পূর্ব্বে এগুলি কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। রোমীয় সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব্বে বর্ব্বরদিগের জীবনযাত্রা অলিখিত রীতি নীতির দ্বারাই শাসিত হইত। যে সকল বিধি বিধান লিপিবদ্ধ হইল তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই উল্লেখযোগ্য—বর্গণ্ডীয় বিধি, সালীয় বিধি, রিপুয়ারীয় ফ্রাঙ্কদিগের বিধি, বিসিগথ্ বিধি, লম্বার্ড বিধি, স্যাক্সন বিধি, ফ্রিসীয় বিধি, বাভেরীয় বিধি ও আলেমানী বিধি। এখানে স্পষ্টতঃই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইবার একটা প্রথম চেষ্টা দেখা যাইতেছে, সমগ্র সমাজকে একটা সাধারণ বিধিনিয়মের অধীনে আনিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এ চেষ্টার সফলতা যে খুব অধিক হইবে এরূপ আশাকরা যায় না, কারণ বর্ব্বর সমাজ যখনও রোমীয় সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে আসিয়া বাস করে না, যখনও তাহারা যাযাবর সামরিক জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তে স্থাবর ভূ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুস্থির জীবনযাত্রা আরম্ভ করে না, সেই আদিম সমাজের বিধিবিধান এখন লিপিবদ্ধ হইল মাত্র। এই সকল বর্ব্বর সংহিতার মাঝে মাঝে কোথাও বা এমন দুই একটা বিধান পাওয়া যায় বটে যাহাতে বিজিত ভূসম্পত্তির উল্লেখ আছে অথবা প্রাচীন অধিবাসীবর্গের সহিত বিজেতৃবর্গের সম্বন্ধনির্দ্দেশের চেষ্টা আছে, কিন্তু এই সকল বিধির অধিকাংশই জার্ম্মান জাতির প্রাচীন অবস্থার পক্ষেই প্রযোজ্য। নবীন জার্ম্মান সমাজে এই সকল বিধি অধিকাংশ স্থলেই অপ্রযোজ্য ছিল, এবং এই সমাজের বিকাশ সাধনে ইহাদের কার্য্যকারিতা অতি সামান্য।

এই সময়েই ইটালী ও দক্ষিণ গলে আর এক প্রকার চেষ্টা আরম্ভ হয়। সেখানে অন্য স্থানের মত রোমীয় সমাজ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। নগরগুলির মধ্যে অন্য দেশ অপেক্ষা কিছু অধিক শৃঙ্খলা ও জীবনী শক্তি ছিল। এই নগরগুলির মধ্যে সভ্যতা পুনরায় মাথা তুলিতে চেষ্টা করিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি থিয়োডোরিকের শাসন কালে ইটালীর অষ্ট্রোগথ্ রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দেখিব বর্ব্বর জাতি ও বর্ব্বর রাজার শাসনেও প্রাচীন পৌরতন্ত্র বেশ টিকিয়া আছে এবং চারিদিকের ঘটনাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার

করিতেছে। দক্ষিণ গলেও ঐ ব্যাপার দেখা যায়। অষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভে আলারিক নামক টুলুস্ নগরের একজন বিসিগথ্ রাজার আদেশে রোমীয় ব্যবহার বিধি সঙ্কলিত হইল; তিনি ঐ সংহিতা গ্রন্থ তাঁহার রোমীয় প্রজাবর্গের জন্য Brevia rum Ariani নামে প্রকাশিত করিলেন।

স্পেনে আর এক পক্ষ হইতে সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইল। চর্চ্চই এই চেষ্টার প্রবর্ত্তক। প্রাচীন জার্ম্মান যোদ্ধৃ সভার পরিবর্ত্তে টোলেডোর চর্চ্চ সংসদেরই স্পেনে প্রাধান্য হইল। যদিও সম্ভ্রান্তপদস্থ বাহিরের লোকও এই সংসদে উপস্থিত হইতেন, তথাপি বিশপদিগেরই তথায় প্রাধান্য। বিসিগথ্ দিগের ব্যবহার বিধির আলোচনা করুন, দেখিবেন তাহা মোটেই বর্ব্বর বিধি নহে; এ সংহিতা নিশ্চয়ই সেকালের দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া ছিল। ইহার মধ্যে সাধারণ নীতির, সাধারণ তত্ত্বের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য, সে সকল নীতি ও তত্ত্বের সহিত বর্ব্বর রীতি নীতির কোনই সম্পর্ক নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। আপনারা জানেন বর্ব্বরদিগের সমস্ত বিধি বিধান ব্যক্তিগত ও জাতিগত; অর্থাৎ এক জাতির লোকের পক্ষেই এক বিধি প্রয়োজ্য। রোমীয়গণের পক্ষে রোমীয় বিধির প্রয়োজন হইবে, ফ্রাঙ্কদিগের পক্ষে ফ্রাঙ্ক বিধির প্রয়োজন হইবে; প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র বিধি, যদিও সকলেই এক দেশে এক রাজ শাসনে বাস করিতেছে। ইহারই নাম হইল ব্যক্তিগত বিধান; এবং ইহার উল্টা বিধানের নাম বাস্তব বিধান, যে বিধান জাতি-কুলনির্ব্বিশেষে এক ভূখণ্ডের অধিকারী সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য। এখন, বিসিগথদের বিধান ব্যক্তিগত বা জাতিগত নহে, দেশগত। বিসিগথ্ই হউক, রোমীয়ই হউক, স্পেনের সমস্ত অধিবাসী একই বিধানের বশবর্ত্তী। এই আলোচনায় আরও কিছুদূর অগ্রসর হউন, দেখিবেন দার্শনিকতার আরও নিদর্শন পাওয়া যাইবে। বর্ব্বর দিগের মধ্যে বিভিন্ন লোকের অবস্থা ও পদবী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইত। বর্ব্বর, রোমীয়, স্বাধীন ভূস্বামী, আশ্রিত প্রজা, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনের মূল্য আইনের চক্ষে এক ছিল না। বিসিগথ্দের শাসন কালে আইনের চক্ষে সকলেরই জীবনের এক মূল্য এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বিচার পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখিবেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বারা ন্যায় পরীক্ষার পরিবর্ত্তে সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ, যুক্তিমূলক বিচার প্রভৃতি সভ্য সমাজোপযোগী বিচার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এক কথায় সমগ্র বিসিগথ্ বিধির মধ্যে একটা সুচিন্তিত, সুসম্বদ্ধ ও সামাজিক ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

অতএব স্পেনে আরব আক্রমণের অব্যবহিত কাল পর্য্যন্ত যাজকতন্ত্রই সভ্যতাকে বাঁচাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

ফ্রান্সে এই একই চেষ্টা আর এক শক্তির দ্বারা আরদ্ধ হইল। এখানে মহাপুরুষের চেষ্টা, বিশেষতঃ শার্লেমেনের চেষ্টাই উন্নতির মূল। নানা দিক হইতে তাঁহার শাসন কালের পর্য্যালোচনা করুন; দেখিবেন প্রজাবর্গকে সভ্য করিয়া তুলিবার সংকল্পই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয়। প্রথমে তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহের আলোচনা করুন। তিনি সর্ব্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে কাল কাটাইতেছেন, দক্ষিণ হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিকে পর্য্যন্ত, এব্রোনদী হইতে

এল্‌ব্‌ অথবা ওয়েজার নদী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত। আপনারা কি বিশ্বাস করিতে পারেন যে এ যুদ্ধগুলি সমস্তই খামখেয়ালী ব্যাপার, অথবা কেবল মাত্র বিজয় লিপ্সার পরিচয়? কিছুতেই না। আমি এ বলিতে চাই না যে তাঁহার যুদ্ধপ্রণালীর মধ্যে অনেক পরিমাণ চাতুরী, কৌশল বা নীতিকৌটিল্য ছিল না; কিন্তু তিনি এক বৃহৎ প্রয়োজনের তাড়নায় এই সকল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন; সে প্রয়োজন আর কিছুই না, বর্ব্বরতায় উৎসাদন। তাঁহার সমগ্র রাজত্বকাল ব্যাপিয়া তিনি একদিকে মুসলমান আক্রমণ, অপর দিকে স্লাব্‌ আক্রমণ, এই উভয় আক্রমণ প্রতিরোধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শার্লমেনের রাজত্বের যে যুদ্ধবিগ্রহ, ইহাই হইল তাহার প্রকৃতি, সাক্‌সিনদিগের বিরুদ্ধে যে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়িয়া তাঁহার আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী যদি আলোচনা করেন, সেক্ষেত্রেও ঐ একই প্রকৃতি দেখিতে পাইবেন। তাঁহার অধিকারভুক্ত সমস্ত দেশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও একত্ব স্থাপন করা—ইহাই হইল তাঁহার শাসনতন্ত্রের মূলনীতি। শার্লমেনের অধিকার নির্দ্দেশ করিতে হইলে রাজ্য (kingdom) বা রাষ্ট্র (State) কোন আখ্যাই ঠিক খাটে না, কারণ ঐ শব্দ দুইটির দ্বারা যে নিয়ম শৃঙ্খলার ভাব ব্যঞ্জিত হয় শার্লমেন শাসিত সমাজের পক্ষে সে ভাব প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া চারিদিকে বিশৃঙ্খলা অরাজকতা ও বর্ব্বরতার দৃশ্য তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি এই বীভৎস দৃশ্যের পরিবর্ত্তন সাধনে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র একদল কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন, যাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশের রীতিনীতি লক্ষ্য করিবেন ও সংস্কার করিবেন অথবা তাঁহার নিকট সমস্ত বিজ্ঞাপন করিবেন। পরে পরে তিনি কতকগুলি সাধারণ সম্মিলনীর সাহায্যে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে এই সম্মিলনীগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মিত অধিবেশন হইতে লাগিল। এই সকল সভায় তাঁহার রাজ্য মধ্যে গণ্যমান্য যে কেহ আছে সকলকেই উপস্থিত করাইতেন। সেগুলি অবশ্য জনগণের স্বাধীন সম্মিলনী নহে; অথবা আমরা যেরূপ স্বাধীন আলোচনায় এখন অভ্যস্ত, সেরূপ আলোচনা অবশ্য সেখানে হইত না, এই সম্মিলনগুলি শার্লমেনের নিকট কেবল তথ্যসংগ্রহের ও উচ্ছৃঙ্খল প্রজাবৃন্দের মধ্যে কোন প্রকার শৃঙ্খলা ও একতা স্থাপনের উপায় স্বরূপ ছিল।

শার্লমেনের রাজত্বের যেদিক দিয়াই বিচার করুন সর্ব্বত্রই এই এক ব্যাপার—বর্ব্বরতার উৎসাদন ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ, পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি প্রীতি, যাজক সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন—এক কথায় তিনি সমাজের উন্নতি কল্পে বা ব্যক্তির উন্নতি কল্পে যাহা কিছু করিতে যাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই একই মূলনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুকাল পরে ইংলণ্ডে রাজা আল্‌ফ্রেড্‌ এইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা গেল যে সভ্যতামুখী যে কয়টি শক্তি ইউরোপকে বর্ব্বরতার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইউরোপের কোন না কোন অংশে পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত সেই সমস্ত শক্তি সমূহের ক্রিয়া চলিতেছিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটীই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। শার্লমেন তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যশাসনপদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। স্পেনে খৃষ্টীয় চর্চ্চও সেইরূপ যাজকতন্ত্রনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। ইটালী ও দক্ষিণ গলে রোমীয় সভ্যতা বারম্বার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই যুগের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে এ সকল চেষ্টার বিশেষ কোন ফল হয় নাই। রোমীয় সভ্যতা যথার্থই কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি পুনরর্জ্জন করিয়াছিল অনেক পরে, দশম শতাব্দীর শেষের দিকে। সেই সময় পর্য্যন্ত ইউরোপে বর্ব্বরতার উৎসাদন ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকল্পে যত কিছু চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছিল। সংস্কার চেষ্টার প্রবর্ত্তকগণ জনবৃন্দকে যতখানি উন্নত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন বাস্তবিক পক্ষে মানুষ তখনও তত উন্নত হয় নাই; তাঁহারা সকলেই নানা আকারে এমন একটা সুবিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন যাহার পক্ষে তাঁহাদের ক্ষমতাও পর্য্যাপ্ত ছিল না, লোকসমূহের মানসিক অবস্থাও উপযোগী ছিল না। তথাপি তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে নিরর্থক হয় নাই। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে শার্লমেনের বিশাল সাম্রাজ্যের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। টোলেডোর যাজকসংসদেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু বর্ব্বর শাসনেরও যে তখন অন্তিমকাল উপস্থিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ইতিমধ্যে দুইটী বড় রকমের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।—

১। উত্তর ও দক্ষিণ হইতে বর্ব্বরদিগের আক্রমণবেগ নিরুদ্ধ হইয়াছে। শার্লমেনের সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া গেলে রাইন নদীর পূর্ব্বতীরে যে সকল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারা, যে সকল বর্ব্বরজাতি জার্ম্মাণী হইতে পশ্চিমদিকে আসিবার জন্ত ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের পথ রোধ করিয়া বসিল। নরম্যান আক্রমণের ইতিহাস হইতেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকল টিউটনজাতি সমুদ্র পথে ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, এই যুগে সামুদ্রিক অভিযানের দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দী হইতে এই সামুদ্রিক অভিযান নিত্য ও ব্যাপক হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই যে স্থল পথে আক্রমণ ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, স্থল পথে রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত তখন স্থায়ী ও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সকল বর্ব্বরজাতিকে একেবারে ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইল, তাহাদিগকেও বাধ্য হইয়া স্থল পথ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রপথ আশ্রয় করিতে হইল। নরম্যান আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের যতই ক্ষতি হউক না কেন, সে ক্ষতি পূর্ব্ববর্ত্তী স্থলপথে আক্রমণের মত সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে নাই, উদীয়মান সমাজকে সেরূপ ব্যাপকভাবে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে নাই।

দক্ষিণেও সেই এক ব্যাপার দেখা যায়। আরবরা তখন স্পেনে আড্ডা লইয়াছে; তাহাদের সহিত খৃষ্টানদের যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকিল বটে কিন্তু তাহাতে এমন আর নূতন করিয়া কোন অধিবাসীবর্গের স্থানচ্যুতি ঘটিল না। তখনও সারাসেনদের ভিন্ন ভিন্ন দল ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে উপদ্রব করিতেছিল বটে কিন্তু মুসলমান আক্রমণের প্রথম বড় বেগটা তখন একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।

২। এই যুগে ইউরোপের মধ্যভাগেও সর্ব্বত্র লোকসমূহের চলাচল, বাসভূমির অনু-

সন্ধানে দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ এ সমস্ত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। লোকবর্গ তখন স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে, তাহাদের সম্পত্তি স্থায়ী ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এবং মানুষে মানুষে পরস্পর সম্বন্ধ তখন আর আকস্মিক উৎপাত ভিন্ন অন্য কারণে দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে না। মানুষের আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক অবস্থার মধ্যেই একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনপ্রণালী যেমন স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তা, ভাব, ধারণা সমস্তই স্থায়ী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। যে যে স্থানে সে বাস করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানে সে যেসকল নূতন নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিল, যে যে ভূসম্পত্তি সে সন্তানবর্গের জন্য রাখিয়া যাইবে বলিয়া সংকল্প করিতে লাগিল, যে বাসগৃহ একদিন সে নিজের দুর্গ (castle) বলিয়া পরিচিত করিবে, যে মুষ্টিমেয় ঔপনিবেশিক ও ক্রীতদাসের সমষ্টি একদিন গ্রামে পরিণত হইবে—এই সকলের প্রতিই সে আসক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হইল। সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে লাগিল, যেন সেগুলি মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির মাপ অনুসারে ছোট করিয়া কাটা। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমশঃ একটি সংহতি নীতি অনুপ্রবিষ্ট হইল, যাহাতে কোন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না হইয়াও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলিয়া এক একটি রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া উঠিল। বর্ব্বরদিগের রীতিনীতির মধ্যেই এই সংহতি নীতির বীজ নিহিত ছিল। একদিকে প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজ নিজ ভূসম্পত্তির মধ্যে পরিবার ও ভৃত্যবর্গ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; অন্যদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সকল যুদ্ধপ্রবণ ভূস্বামিবর্গের মধ্যে একটা দায়াধিকারক্রম গড়িয়া উঠিল। এ ব্যাপারটি কি? ইহা আর কিছুই নহে, বর্ব্বরসমাজের মধ্য হইতে ভূস্বামীতন্ত্রের, ফিউডালিজ্‌মের উদ্ভব। ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জার্ম্মাণীর অংশটুকুই যে প্রথমে প্রাধান্য লাভ করিবে ইহা স্বাভাবিক। জার্ম্মাণদের হাতেই তখন শক্তি, তাহারা ইউরোপ বাহুবলে জয় করিয়াছে; তাহাদের নিকট হইতেই ইউরোপকে তাহার প্রথম সামাজিক গঠন ও সমাজ ব্যবস্থা লইতে হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ফিউডালিজ্‌ম্ বা ভূস্বামীতন্ত্র, তাহার প্রকৃতি, ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান ও কার্য্যকারিতা কি, ইহাই আমার পরবর্ত্তী বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়। এই বিজয়ী ভূস্বামীতন্ত্রের আধিপত্যের মাঝখানেই আমরা পদে পদে দেখিব যে ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ—রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, পৌরতন্ত্র—সকলেই বাঁচিয়া আছে, কেহই বিনষ্ট হয় নাই; এবং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে ইহাদের কেহই ফিউডালিজ্‌মের চাপে একেবারে তলাইয়া যাইবে না, ফিউডালিজ্‌মের সঙ্গে সংঘর্ষে তাহারা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইবে, ফিউডালিজ্‌মের প্রকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে আত্মসাৎ করিবে, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অভ্যুদয়কাল কখন আসিবে তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকিব।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

আমেরিকায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিকাগোতে প্রথম রাত্রি

১৯০৬ সালের ২রা জুন আমার জীবনে এক বিশাল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরী কাশীতে সাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলাম; এমন অবস্থায় সাংসারিক আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমার মত একজন লোকের পক্ষে, কোনও প্রকার জানাশুনা না থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিকাগো নগরে প্রবেশলাভ করা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। কোনও বন্ধু বান্ধবের নামে কোনও প্রকার পরিচয়পত্র আমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি নাই। এমন কি ইহার পূর্ব্বে জীবনে কোনও দিন কোন হোটেলে খাই নাই। ছুরীকাঁটা দিয়া কেমন করিয়া খানা খায়, কেমন করিয়া লোকে এখানে আলাপ পরিচয় করে—ইত্যাদি বিষয় আমার নিকট সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

সকাল বেলা ১০টার সময় "ভ্যাঙ্কোভর" হইতে শিকাগো সহরে পঁহুছিলাম, ভ্যাঙ্কোভর হইতে শিকাগো ২৮০০ মাইলের মত হইবে। গাড়ী যখন এক ষ্টেশনে থামিল আর "শিকাগো" "শিকাগো" এই শব্দ যখন আমার কানে আসিল তখন বুঝিলাম যে ষ্টেশনে আসিয়াছি। গাড়ীতে যে সকল লোক ছিল তাহারা নামিয়া পড়িল ও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম এখন যাই কোথায়? সকলের পরে ট্রাঙ্ক লইয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। টিকেট দিয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন এক কোচম্যান, আমি কোথায় যাইব, জিজ্ঞাসা করিল। কোথাকার কথা বলি? আমি ত এখন কোনও জায়গার নামই জানিতাম না যেখানে গিয়া থাকিতে পারি। ভাবিতে ভাবিতে "ওআই, এম্, সি, এ" (Young Men's Christian Association) এর নাম মনে পড়িল। খ্রীষ্টানদের মূল্য দেশের বাহিরে গেলে ভালরকমেই বোঝা যায়। এই সমস্ত সমিতি কি চমৎকার! এখানে নবীন যুবক দেশের ও জাতির সেবা করিতে শিখে; বিদেশী কেহ আসিলে তাহার সাহায্য করে। আর আমাদের দেশে এক ধার্ম্মিক সভা আছে। উহার সময় কেবল শাস্ত্র বিচারে ও পরের মানহানিকর আলাপে নষ্ট হয়। সেই জন্যই ত এই দুর্দ্দশা!

গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া আমি এদিক্ ওদিক্ লোকজন দেখিতেছিলাম, সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; নূতন বুট্ পায়ে, নূতন সুট্ গায়ে, মাথার চুল বেশ বিন্যস্ত। কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চার দিন ক্রমাগত পথ চলিয়া আমার কাপড় ময়লা হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ প্যান্টালুনটি তো খুবই ময়লা হইয়াছিল। আমার সমস্ত কাপড়ই এক বড় বাক্সের মধ্যে। সে বাক্সটী আবার মালগাড়ীতে। নতুন সুট্ না পাইলে, আমার কাপড় বদলাইবার উপায় ছিল না। আমি বারে বারেই কাপড় চোপড়ের দিকে নজর করিতে ছিলাম; আর রাস্তায় যাহারা যাইতেছিল তাহাদের সহিত তুলনা করিতে-

ছিলাম। ইহার মধ্যেই গাড়ী Y. M. C. A. এর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; কোচম্যান দরজা খুলিয়া দিল। একটী বালক জিনিষ পত্রগুলি উঠাইবার জন্য অগ্রসর হইল; কিন্তু যেই সে আমার ময়লা কাপড় আর চারদিনের দাড়ী দেখিল, অমনি সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। আমি উহার মুখচ্ছবিতে উপহাসের ভাব দেখিতে পাইলাম। নিজের ট্রাঙ্ক নিজেই উঠাইয়া লইয়া, ঐ সুবৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুইতলার উপর "এসোসিয়েসন"এর আফিস। ভিতরে গেলে, এক যুবক আমাকে সেক্রেটারীর নিকট লইয়া গেলেন। যথেষ্ট বিনয়ের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। আমাকে কোনও হোটেলে যাইবার পরামর্শ দিলেন। কোনও জাপানী ছাত্রের খবর পাইলে ভাল হয়, আমি এইরূপ জানাইলাম। এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী কয়েক স্থানে "টেলিফোন্‌" করিলেন, কিন্তু কোনও সংবাদ পাইলেন না। মহাবোধী সোসাইটীর ঠিকানা আমার জানা ছিল; কাজেই ওখানে গিয়া কোনও জাপানী ছাত্রের খবর লইব, স্থির করিলাম। Y. M. C. A. তে ট্রাঙ্ক রাখিয়া, এই সোসাইটীর খোঁজ লইতে বাহির হইলাম।

রাস্তায় চমৎকার দৃশ্য। নরনারী সকলে এদিকে ওদিকে যাইতেছিল। সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রসন্নমুখ; নিজ নিজ কাজে যেন মধুমক্ষিকার মত লাগিয়া আছে। কাহাকেও একটুও অলস বলিয়া বোধ হইতেছিল না। সকলেরই বেশ স্ফূর্ত্তি। কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি বালক, কি বালিকা সকলেই চক্রের মত ঘুরিতেছে। একদিকে ছোট ছোট বালক "ডেলি-নিউজ," "রেকর্ড" "হেরাল্ড্‌" প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকা বিক্রী করিয়া বেড়াইতেছিল। বৈদ্যুতিক গাড়ী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ চলিতেছিল। ঘোড়ার গাড়ী ও মালপত্রে বোঝাই "ছকড়" দেখিতে পাইলাম। অন্যদিকে এক রকম গাড়ী ছিল বড় বড় লোহার থামের উপর। রাস্তা হইতে ৪০ গজ উঁচুতে আকাশে আর এক রাস্তা। উহার উপর দিয়া আর এক প্রকার ইলেক্‌ট্রিকের গাড়ী ("এলিভেটরকার্‌") গড়্‌ গড়্‌ শব্দে এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

পথে সর্ব্বপ্রথমে "ম্যাসোনিক টেম্পল্‌" (Masonic Temple) এর গগনস্পর্শী প্রাসাদ দেখিলাম। ইহা একটী বাইশতলা বাড়ী। যেন আকাশের সঙ্গে কথা বলিতেছে। দেখিয়া মনে হইল, বিজ্ঞান কি না করিতে পারে।

পুলিসের এক সেপাইর নিকট হইতে সোসাইটীর খোঁজ খবর জানিয়া লইলাম ও শীঘ্র সেই পথে রওয়ানা হইলাম। শিকাগো পৃথিবীর বড় বড় সহরের মধ্যে তৃতীয়। ইহার ২০ মাইল পর্য্যন্ত লম্বা রাস্তাও আছে; একটী তো ২৭ মাইল। এইজন্য ঐ এসোসিয়েসনের বাড়ীতে পৌঁছিতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিল। পথের দৃশ্য আমার ভারী মনোরম লাগিল। যখন "মার্‌শাল ফিল্‌ডের" (Marshallfield) প্রকাণ্ড দোকানের নিকট আসিলাম, তখন উহা দেখিয়া আমি একেবারে বিস্ময়ান্বিত হইয়া গেলাম। কত বড় দোকান! কোটি কোটি টাকার মাল, অনেক রকম জিনিষ বিক্রীর জন্য মজুত ছিল। এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল যে ইহার মধ্যে গিয়া সকল মাল ভাল করিয়া দেখিয়া লই। কিন্তু তখন সময় ছিল না; রাত্রে থাকিবার চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

"ডিয়াব-বর্ণ" লেনে মহাবোধী সোসাইটীর আফিস ছিল। ঐ অট্টালিকার নিকট যখন গেলাম তখন জানিতে পারিলাম যে আফিসঘর বিশ তলাতে। দালানের উপর চড়িবার কি চমৎকার উপায়। একটী ঘেরা কুঠুরি প্রকাণ্ড শিকলে বাঁধা, উহার ভিতর প্রায় দশ জন লোকের দাঁড়াইবার স্থান আছে। কুঠুরিটীকে একপ্রকারের দোলা বলা চলে। উহার প্রত্যেক তলার সঙ্গেই সম্বন্ধ আছে। ইহার ভিতর দাঁড়াইয়া যে তলায় যাইতে হইবে চাকরকে বলিয়া দিলেই সে সেই তলাতেই পৌঁছাইয়া দরজা খুলিয়া দিবে। বাস্ আপনি আপনার গন্তব্য গৃহে গমন করুন। প্রত্যেক দালানেই উপরে নীচে যাতায়াত করিবার জন্ম এই প্রকার তিন চারটী স্থান আছে। এখানে সকল জায়গাতেই এক নিয়ম, সময় অল্প, লাভ বেশী।

দালানের উপর গিয়া খবর লইয়া জানিতে পারিলাম যে মহাবোধী সোসাইটী আফিসের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এক জন মহিলা অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত আমাকে নূতন আফিসঘরের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। আমি উহার তল্লাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঘোরাঘুরিতে হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছিলাম শুধু ইহাই নয় ভ্যাঙ্কোভর হইতে শিকাগো পর্য্যন্ত চারদিন কেবল এক এক মুঠা ছোলা খাইয়া কাটাইয়াছি। যদিও প্রত্যেক রেল গাড়ীর সঙ্গে খাওয়ার গাড়ী ("ডাইনিং কার্") থাকে এবং সে গাড়ীর যাত্রীরা সময় মত খাবার পাইয়া থাকেন; তবু আমার পক্ষে এ ব্যবস্থা না থাকারই সমান। জন্মাবধি মাছ মাংসের প্রতি ঘৃণা, এইজন্য চারদিন আমাকে নিরাহারে থাকিতে হইল, আবার শিকাগোতে পঁহুছিয়াও কোথাও কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না। তাহার উপর আবার চারি ঘণ্টা সহরে ক্রমাগত ঘোরা। ইহার ফলে শরীর মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। তবু মহাবোধী সোসাইটীর খোঁজ লইতে হইবে। তাই রওনা হইলাম।

পথ চলিতে চলিতে কোনও এক স্থানে ছোট ছোট হোটেলের নোটীশ ও নামের বোর্ড দেখিলাম। মনে হইল, যে ইহার কোনও একটীতে কোনও প্রকারে এক রাত থাকিয়া যাই আর পরদিন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া কোনও জাপানী ছাত্রের সন্ধান লই। এক পথিকাশ্রমের উপরে গেলাম। গিয়া ম্যানেজারের নিকট সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার নাম লিখিয়া লইলেন ও এক কামরাতে লইবার জন্ম আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই সময় আমার মনে কি হইল বলিতে পারি না। আমি বুঝিলাম যে, ঐ ব্যক্তির মনের ভাব হয়ত ভাল নয়। সিড়ি দিয়া নামিয়া গলিতে আসিলাম। পরে বুঝিতে পারিলাম যে উহা বদ্মায়েসদের আড্ডা, উহারা পথিকদের রাত্রে ওখানে শয়ন করিতে দেয় ও শয়ন করিলে পর পকেট হইতে সব কিছু বাহির করিয়া কাজ সাফ করিয়া লয়। সকালবেলা ম্যানেজার ভাড়া আদায় করিয়া লয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাত্রী বেচারি চুপ্‌চাপ করিয়া সহ্য করে এবং ওখান হইতে একেবারে নিরুপায় হইয়া চলিয়া যায়।

এক ঘণ্টা পরে মহাবোধী সোসাইটীতে উপস্থিত হইলাম। যে ভদ্রলোকটী কার্য্য পরিচালনা করিতেন তিনি অত্যন্ত আদর যত্নের সহিত আমার কথা শুনিলেন, এবং আমার সঙ্গে গিয়া কোনও ভাল হোটেলে আমার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। উঁহার

সহিত বৈদ্যুতিক গাড়ীতে চড়িয়া "টম্‌সন" হোটেলে গেলাম। পথে পোষ্টাফিসের বিশাল সৌধ দেখিতে পাইলাম। "টম্‌সন" হোটেলের ম্যানেজার আমার ময়লা কাপড় দেখিয়া ও আমাকে বৈদেশিক জানিয়া স্থান দান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেইজন্য আমার সহচর মহোদয় ও আমি নিরাশ হইয়া অপর হোটেলে গেলাম। ওখানে কোনও প্রকারে থাকিবার ব্যবস্থা হইল; দুই রাত্রির জন্য ছয় টাকা লাগিবে বলিয়া ঠিক হইল। মহাবোধী সোসাইটী হইতে যে ভদ্রলোকটী আমার সহিত আসিয়াছিলেন তিনি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। এক চাকরের সাথে লিফ্‌টে চড়িয়া পাঁচ তলায় গেলাম। চাকরটী আমাকে বেশ সাজান গোছান একটী কাম্‌রায় লইয়া গিয়া বলিল, "মশায়! এই কামরাই আপনার"। ইহা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভৃত্যটী চলিয়া গেলে আমি ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। রাত্রে থাকিবার স্থান হইল বলিয়া আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু ভাবনা হইল এই যে এখন কাপড়ের কি করি। কাপড় ত সবই ময়লা। সঙ্গে সাবান ছিল। মনে ভাবিলাম, যদি কাল জিনিষ পত্র না পাওয়া যায়, ইহাদিয়াই কাপড় পরিস্কার করিতে হইবে। ঘরের ভিতর গরম ও ঠাণ্ডা জলের দুইটী পাইপ ছিল। ঐ খানেই সব কাপড় ধুইলাম। এই করিতে করিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। তার পরে ক্ষৌর কার্য্য সারিয়া লইলাম। ময়লা কাপড়ে কেমন করিয়া বাজারে যাইব—এ চিন্তা তখন দূর হইল। ক্লান্তশ্রান্ত দেহে অভুক্ত অবস্থাতেই শুইয়া পড়িলাম। পরিস্কার সুন্দর বিছানাতে পড়িবামাত্রই নিদ্রাদেবী আমাকে আপনার করিয়া লইলেন।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদ।

শিকাগোর রবিবার

শিকাগো পৃথিবীর প্রসিদ্ধ নগরসমূহের অন্যতম। ঐখানেই জগদ্‌বিখ্যাত ধনী জন্‌, ডি, রক্‌ফেলর স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকার অনেক বড় বড় কারখানা, যাদুঘর প্রভৃতি এখানেই। এই সকল কারখানাতে নানাবিধ লোক কাজকর্ম্ম করে। এত বড় প্রসিদ্ধ নগরের লোকেরা অবসর সময় কিরূপে কাটায়, কেমন করিয়াই বা মনের একঘেয়ে ভাব দূর করে? ঐ নগরে দর্শনীয় কি কি আছে?—এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠকের চিত্তবিনোদার্থে বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিখিতেছি। পাঠক আসুন, আপনাকে শিকাগো সহর দেখাই। ইহার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করাই। আর এই সহরে কি কি দেখিবার আছে, তাহাও বলিয়া দিই। আমি সেই প্রসঙ্গে এই নগরবাসীদের চালচলন সম্বন্ধেও কিছু না কিছু বলিতে পারিব এবং আপনিও আমেরিকার এই ভাগের লোকজনের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে আমি রবিবার মনোনীত করিয়াছি। রবিবারের মহিমা কীর্ত্তনই করিতে বসিয়াছি। ইহা দ্বারা আমারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং আপনি ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে শিকাগোবাসীরা কিপ্রকারে রবিবারের অবসর কাটাইয়া থাকে।

রবিবার ছুটীর দিন। ভারতবর্ষে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও একথা জানে। এশিয়া ও আফ্রিকাতে, যেখানে যেখানে খ্রীষ্টানদের রাজ্য, সেই সেই স্থানেই রবিবার দিন সমস্ত স্কুল, আফিস ইত্যাদি বন্ধ থাকে। কিন্তু রবিবারটি কেমন করিয়া কাটান উচিত, তাহা খ্রীষ্টানদের মধ্যে না থাকিলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। রবিবারের ছুটী কাটাইবার জন্য শিকাগোতে কেমন কেমন স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও কেমন করিয়া ওখানকার লোকেরা জীবনের আনন্দ উপভোগ করে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনুন।

খ্রীষ্টধর্ম্মঅনুসারে রবিবার দিন কাজকর্ম্ম করা নিষেধ। এইজন্য সমস্ত দোকান, পুস্তকালয়, কারখানা প্রভৃতি এই দিন বন্ধ থাকে। কি ধনী কি নির্ধন, কি প্রভু কি ভৃত্য, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলের জন্যই আজকার দিন ছুটী। সাড়ে দশটা, এগারটার সময়, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, প্রাতঃকালে, প্রায় সমস্ত লোকই নিজ নিজ গির্জ্জা বা উপাসনা-মন্দিরে যাইতেছে দেখা যায়। ওখানে ভগবানের উপাসনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, সকলে আহারাদি করে। তৎপরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া,আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য বাহির হয়।

শিকাগো অতি বৃহৎ সহর। পৃথিবীর সমস্ত নগরীর মধ্যে ইহা আকারে তৃতীয়। এখানে "ফিল্ড্ মিউজিয়ম" নামে এক যাদুঘর আছে। উহা "মিশিগান্" হ্রদের কিনারায় ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অল্প দূরেই হইবে। রবিবার সকালে নয়টা হইতে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্য্যন্ত সকলে এখানে কোনও দর্শনী না দিয়া বেড়াইতে পারে। এইজন্য এদিন এখানে বড়ই জনতা। আট নয় বৎসরের বালক বালিকারা এইপ্রকার স্থানেই বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করে। কারণ, এই স্থানেই সংসারের সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তুর সংগ্রহ রহিয়াছে। ঐ গুলির শিকাগোর প্রসিদ্ধ জগৎ মেলায় ("ওয়ার্ল্ড্'স্ ফেয়ার্") একত্রিত করা হইয়াছিল। এখানে যথাক্রমে দেখান হইয়াছে যে পৃথিবীতে প্রাণীজীবন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। ভূগর্ভবিদ্যাসম্বন্ধীয় পদার্থসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ঘরে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া উহার ক্রমবিকাশের ধারা পরিস্ফুট ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার হরিণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নিজের রঙ্ পরিবর্ত্তিত করে এবং প্রকৃতিমাতা তুষারপাতের সময় কিরূপে উহার আহার যোগাইয়া দেন, তাহা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর মেরু-প্রদেশের ভল্লুকসমূহের বরফের ভিতরকার সুদৃশ্য ঘর কেমন সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। আমেরিকার আদিম নিবাসীগণ ('রেড্ ইণ্ডিয়ান্") কোন্ দেবদেবীর পূজা করিত, কিরূপ গৃহে বসবাস করিত, কি প্রকারে ও কোন্ বস্তুর সাহায্যে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিত, এ সকল বিষয় এখানে অতি সুন্দরভাবেই দেখান হইয়াছে। উহাদের নৌকা, উহাদের পানভোজনের দ্রব্যাদি, উহাদের দেবালয়, উহাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র—এ সমস্ত জিনিষই বেশ ভাল ভাবে দেখান হইয়াছে। যে যে প্রাণী সব চাইতে সক্ষম কেবল তাহারাই যে সংসারে টিকিয়া থাকিতে পারে—এই সকল সংগ্রহ দ্রব্য দেখিবামাত্রই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। যখন আমি ঐ সকল বস্তু দর্শন করিলাম তখন আমার ইহাই মনে হইল, যে ভারতবাসীদের নাম, তাহাদের বস্তু নিচয়, তাহাদের ইতিহাস ইত্যাদি সমস্ত নষ্ট হইয়া গেলেও কোনও দিন ত "ব্রিটীশ মিউজিয়মে" তাহাদের নিদর্শন থাকিবে।

এই যাদুঘরের মধ্যে মহাত্মা কলম্বসের এক প্রকাণ্ড মর্ম্মর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই জেনোয়া নিবাসীকে দেখিয়া দর্শকের মনে বিভিন্ন চিন্তার উদয় হয় ও এক অদ্ভুত দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। প্রাচীন আমেরিকা ও নবীন আমেরিকায় কত প্রভেদ। এখানকার প্রাচীন নিবাসীরাই বা কোথায়? বিগত তিন শতকের মধ্যে এখানকার রূপ কতই না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোথায় ইউরোপ, আর কোথায়ই বা আমেরিকা। হাজার হাজার মাইল ব্যবধান। ভারতবর্ষের খোঁজ লইতে এক ব্যক্তি বাহির হইলেন এবং ভ্রমক্রমে এদিকে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার এখানে আসা যেন যমরাজের আগমনের ন্যায় হইয়া উঠিল। স্বাধীনভাবে বিচরণশীল, হাজার বৎসরের নিবাসী কি মানুষ, কি পশু, কি পক্ষী, সকলেই তিন শতাব্দীর মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। কোটী কোটি মহিষ, না জানি কত কাল হইতে, আমেরিকার বনে জঙ্গলে আনন্দে বিচরণ করিতেছিল; কিন্তু আজ তাহাদের নাম গন্ধও নাই। ঐ সকল জীব কি অপরাধ করিয়াছিল? যাহাদের কোনও অধিকার এ দেশে ছিল না এমনতর দূর বিদেশবাসী এক জাতি আসিয়া এখানকার আদিম নিবাসী দিগের বিনাশ সাধন করিল। এই কি ঈশ্বরের বিধান! এই স্থান দর্শন করিতে করিতে এইরূপ নাস্তিকভাবময় প্রশ্ন দর্শকের মনে উঠে। কিন্তু সেই সময়ে এ কথাও কর্ণে ধ্বনিত হয় প্রকৃতির ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে সকলের অপেক্ষা সক্ষমতম, এবং যোগ্যতমই পৃথিবীতে স্থায়ী হইবে। যদি তুমি নিজের অস্তিত্ব রাখিতে চাও, তবে স্বীয় প্রতিবাসীর সমান হও। যে জাতি এই নিয়ম অনুসারে চলে, সে-ই সংসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

এই যাদুঘরে বৃক্ষ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জন্তু বিদ্যা, নর-শরীর বিদ্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাসম্বন্ধেও বস্তুসমূহ রহিয়াছে। "এক ঢিলে দুই পাখী." "রথ দেখা ও কলা বেচা—ছুটীর দিন, আমোদও করুন এবং কিছু শিক্ষাও লাভ করুন। উন্নতি লাভের কত সুন্দর সুযোগ এখানকার অধিবাসীদের জন্য রহিয়াছে! বাল্যকাল হইতেই খেলার ছলে ছলে এখানকার লোকেরা এতখানি উন্নতি করাইয়া লয় যে আমাদের দেশে দশ বৎসর স্কুলে পড়িলেও সেরূপ হয় না।

যাদু ঘরের বাহিরে গিয়া দেখুন, ঝিলের ধারে ধারে রাস্তা। বেঞ্চও আছে। ওখানে স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকারা আনন্দে বসিয়া আছে, ও হাস ঠাট্টা, খেলা ধুলা করিতেছে উহাদের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় যেন "স্বাধীনতা" উঁহাদের মাথার মণির মত জ্বলিতেছে; যুবক স্বীয় প্রিয়তমার সহিত ইতস্তত বিচরণ করিতেছে ও আলাপ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কেমন আনন্দ হয়। মিশিগান হ্রদও যেন তাহাদের এই প্রেম দর্শন করিয়া প্রসন্ন হইয়াছে মনে হয়। স্বচ্ছ শীতল পবনহিল্লোলে সে যেন দম্পতীকে আশীর্ব্বাদবর্ষণ করে। তরঙ্গমালা, ছোট ছোট বালক বালিকাকে দেখিয়া যেন উহাদের সহিত মিশিবার আশায় তটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তৎকালেই পাছে কোনও বেয়াদবি হয় এই মনে করিয়া পিছনে সরিয়া যাইতেছে। এই সময়ে সবিতৃদেব আপনার দিনের কাজ শেষ করিয়া পশ্চিম প্রান্তে গমন করিলেন।

এই যাদুঘর ভিন্ন, আরও বহু স্থান শিকাগোবাসীদের রবিবার কাটাইবার জন্য রহিয়াছে। অনেক উদ্যানও আছে। সেখানে পিয়ানো ইত্যাদি বাজে; মনের শান্তি আনিবার মত আরও বহু উপকরণ থাকে। সেখানে সকলে গিয়া বসে, গান বাজনা শোনে এবং আনন্দময় হইয়া নূতন প্রাণে গৃহে ফিরিয়া যায়।

"হম্‌বোল্ড্‌পার্ক (Humboldt Park) একটী উদ্যান। এখানে বড় বড় পুকুর আছে। সেগুলি সর্ব্বদাই জলে পরিপূর্ণ। ছোট ছোট নৌকা ভাসমান। নৌকাগুলি খেলার জন্য রাখা হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এখানে নৌকার দৌড় হয়। রবিবার দিন এ উদ্যানের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। যুবকের দল নৌকায় উঠিয়া হাসিয়া খেলিয়া গানবাজনায় জীবনের আনন্দ উপভোগ করে। এক এক নৌকায় প্রায়শঃ একজন যুবক ও একজন যুবতীকে দেখা যায়। উভয়ে সহপাঠি বন্ধু অথবা পতিপত্নী। এপ্রকার মিলন এ দেশে নিন্দনীয় নহে। এবং আমাদের দেশের ন্যায় কোনও কুৎসিত ভাব ইহাতে ইঁহাদের মনে উপস্থিত হয় না। স্ত্রীজাতির এখানে বিশেষ সম্মান। তাঁহাদের সহিত নীচ ব্যবহার করে, এরূপ অনেক অসৎ পুরুষও দেখা যায়। তবে এই প্রকার পুরুষের পক্ষে আইনে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা। প্রায় সকল উদ্যানেই এরূপ পুষ্করিণী আছে। যে স্থান যাঁহার নিকট, তিনি সেখানে গিয়াই রবিবার দিবস আনন্দে যাপন করেন।

কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে ঐ সকল স্থানে অন্যদিন যাওয়ার কি নিষেধ আছে? না, সেরূপ কিছু নাই। তবে কথা এই যে রবিবার দিবস ব্যতীত অন্য দিন প্রায় কাহারও ছুটী থাকে না, এই জন্য রবিবার দিন সকলে এই উদ্যানে একত্রিত হয়। প্রত্যহ শুধু কোনও কোনও স্থানে স্ত্রীপুরুষগণকে টেনিশ খেলিতে দেখা যায়। ইহা অবশ্য গ্রীষ্মকালের কথা। শীত কালে যখন এই সকল পুষ্করিণীর জল জমিয়া যায়, তখন সকলে এখানে "স্কেটিং" করেন। প্রত্যেক বৎসরই ডিসেম্বর মাসে স্কেটিংএর সময় উপস্থিত হয়। খুব বেশী শীত পড়ে আর বালকবালিকাগণকে এখানে নাচিতে দেখা যায়।

লিঙ্কন উদ্যানও খুব প্রসিদ্ধ। এখানে আমেরিকার বিখ্যাত যোদ্ধা বীরবর "গ্র্যাণ্ট" এর মূর্ত্তি আছে। এই অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি এদেশের ইতিহাসবেত্তাকে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, এই যুদ্ধ দাসব্যবসায় বন্ধ করাইবার জন্য আমেরিকান জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তর আমেরিকার লোকেরা কহিতেছিলেন যে দাস ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাউক্। উঁহাদের সিদ্ধান্ত যে স্বাধীনতার চোখে সকল লোকই সমান—জীবন ও স্বাধীনতার স্বাভাবিক নিয়মে সকলেরই সমান দাবী। আমেরিকার মত স্বাধীন দেশে মানুষ ছাগল ভেড়ার মত বিক্রীত হইবে, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। এই সত্য নীতি রক্ষার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে এক লোমহর্ষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, এবং পরিণামে সত্যেরই জয় হইল। মহাবীর গ্র্যাণ্ট এই যুদ্ধে উত্তর আমেরিকাবাসীদের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন। ইনি 'কালো' নিগ্রোদিগের জন্য, 'শাদা' আমেরিকানদিগের সমান অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার মূর্ত্তি দর্শকের মনে এক নব জীবনী শক্তি আনিয়া দেয়, জানাইয়া দেয় যে কোনও মানুষের অপরের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিবার অধিকার নাই। এ বিষয়ে সকল মনুষ্যই

সমান। সমাজ যন্ত্রের সকল মনুষ্যই উহার অঙ্গ, নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে সকলেই সমাজের সেবক। কাহাকেও ঘৃণা করিও না; শাদা, কালা, সমস্ত লোক একই পিতার পুত্র।

এই উদ্যানের এক ভাগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ রহিয়াছে। যে বৃক্ষ যতটুকু তাপে বাঁচিতে পারে, তাহাকে ততটুকু তাপ দিয়া বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অনেক গাছ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্ বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কথা দর্শকগণ এখানে জানিতে পারেন।

উদ্যান ভিন্ন আরও বহু স্থান আছে যেখানে লোকেরা বিশ্রাম করে, হাসি খেলা করিতে পারে। শিকাগো অতি বৃহৎ নগর। এই জন্য নগরবাসীদের আরাম ও বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য মধ্যে মধ্যে রাস্তায় বুলাভার্ড (Boulavards) নামক বিহার স্থল আছে। এখানকার রাস্তা আমাদের দেশের রাস্তার ন্যায় নয়। এক এক রাস্তায় এক একটী বাজার। পাথরের দালানের সাম্‌নে দিয়া পথের দুই পার্শ্বেই পাঁচ ফুট করিয়া রাস্তা, লোকজনের চলিবার জন্য তৈয়ারী হইয়াছে। মাঝের সড়ক গাড়ী, ঘোড়া, মটর প্রভৃতির জন্য। খোলা দালান কোঠা ও চওড়া সড়কের মোড়ে মোড়ে বায়ু বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য এবং গরীব লোকদের মনোরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে কিছু দূর পরে পরেই বিহারবাটিকা রহিয়াছে। সেখানে বসিবার জন্য বেঞ্চ্ প্রভৃতিও আছে সায়ংকালে কর্ম্মক্লান্ত স্ত্রীপুরুষগণ এখানে আসিয়া থাকেন। কারণ, অন্যান্য স্থানে গান বাজনা, জল বিহার প্রভৃতির জন্য অল্পবিস্তর খরচ হইয়া থাকে। অল্প আয়ের লোকেরা উহা করিতে পারে না। তাহাদের জন্য এই সকল স্থানে উদ্যানে ও যাদু ঘরে ভ্রমণ করিবার অনুমতি আছে। যাহাতে সকলে এই স্বাধীন দেশে আনন্দ লাভের সুযোগ পায় তজ্জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হইয়াছে। এখানে যে অর্থব্যয় করা হয়, উহা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উন্নতির জন্যই হইয়া থাকে।

এই ত গেল দিনের কথা, এখন রাত্রির কথা শুনুন। এখানে বহুপ্রকার নাট্যশালা, প্রদর্শনী ও সমিতি রহিয়াছে। সেখানে নিজ নিজ রুচি অনুসারে সকলে রাত্রে যাইয়া থাকে। শিকাগোতে রাত্রেও লোকে গির্জ্জায় যাইয়া থাকে। রাত্রেও সেখানে উপদেশ গান ইত্যাদি হয়। একটী জায়গার নাম "হোয়াইট্ সিটি" (White City) বা শ্বেত নগরী। অনেক লোক সেখানে যায়। এ স্থানকে শ্বেত নগরী এই জন্যই বলে যে এখানে এমন বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হয় যাহাতে রাত্রিও দিনের মত হইয়া উঠে। ইহার বিশাল গেটের উপর বড় বড় বিজলীর অক্ষরে "দি হোয়াইট সিটি" (The White City) এইরূপ লিখিত আছে। বিদ্যুতের মহিমা এখানে খুবই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক তেজে বিভিন্ন রঙের অক্ষরচিত্র রহিয়াছে। মিনিটে মিনিটে উহার রং বদ্‌লাইতেছে। এই শ্বেত নগরীর ভিতর অনেক মনোরঞ্জক স্থান আছে; কোথাও গান হইতেছে; কোথাও বা বড় বড় "হলে" নাচ চলিতেছে; সার্কাস প্রভৃতিও আছে, পৃথিবীর সকল তামাশাওয়ালাকে এখানে আনান হয়। গরমের সময় তিনচার মাসে তাহারা হাজার হাজার টাকা উপায় করে। এই জায়গাটি এক কোম্পানীর। তাহাদের লোক সমস্ত পৃথিবীতে তামাসাওয়ালাদিগের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভারতবর্ষের যদি দুই তিন

খুব ভাল পালোয়ান কোনও দেশী কোম্পানীর সহিত আসে তবে হাজার হাজার টাকা লইয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে লোকে টাকা রোজগার করার উপায় সমূহ ভাল করিয়া শেখে নাই। সামান্য কোনও ইংরেজ, আমাদের দেশে আসিয়া কেবল বিজ্ঞাপনের সাহায্যে নিজের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা করে ও লক্ষ লক্ষ টাকা কুড়াইয়া লইয়া যায়। কিন্তু আমাদের স্বদেশী কারীগর, পালোয়ান, বাজীকর প্রভৃতি কেহই এ সকল দেশে আসিতে সাহস করে না। আমেরিকাতে কুস্তীর সখ বাড়িতেছে। যদি এই সময় কোনও পালোয়ান কিছু খরচপত্র করিয়া এখানে আসে, এবং কোনও ভাল কোম্পানীর সহায়তায় কুস্তি করে তবে সে লক্ষ মুদ্রার সংস্থান করিতে পারে।

এই শ্বেত নগরীতে রবিবার দিন প্রকাণ্ড এক মেলা বসে। স্ত্রীপুরুষে গাড়ী বোঝাই হইয়া যায়। হাজার হাজার দর্শক একত্রিত হয়। রাত্রে ৮টা হইতে ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত মেলা থাকে। এ স্থান কেবল গরমের দিনই খোলে; কারণ শীত কালে ঠাণ্ডার জন্য এখানে কেহ আসিতে পারে না। শীতের সময়ের জন্য নগরের অন্যান্য স্থানে অন্যান্য প্রকারে মনোরঞ্জক মেলার ব্যবস্থা আছে।

রবিবার দিন এই নগরে লোকে এই প্রকারেই সময় কর্ত্তন করে। এখন যদি এখানকার জীবন যাত্রার সহিত ভারতবর্ষের জীবন যাত্রার তুলনা করিতে যাই তবে কত বড় পার্থক্য দেখিতে পাইব। ঐ সকল তামাশা বা নাটকের কথা ছাড়িয়া দিন, যাহার বিষয় হয়ত আমাদের বহু পাঠক পাঠিকার বিশেষ জ্ঞান নাই; কিন্তু এমন বহুতর মনোরঞ্জক শিক্ষাপ্রদ মেলা ও তামাসা আছে, যাহার বিষয়েও আমাদের দেশের লোকদের কোনও প্রকার সখ নাই। ইহারা নিজের অবকাশ কাল, ছুটীর দিন কি প্রকারে অতিবাহিত করেন? ভাঙ্ খাইয়া, তাশ খেলিয়া, পাখী উড়াইয়া, এবং অনর্থক নিন্দা পরিবাদে লিপ্ত হইয়া তাঁহারা যে সময়ের মূল্য জানেন না তাহা প্রমাণ করেন, লেখাপড়া জানা এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এইসকল কদাচরণে লিপ্ত নহেন তথাপি ত্রিশ কোটির মধ্যে এ প্রকার লোকের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। আমাদের দেশের অর্দ্ধেকেই ত স্ত্রীলোক, তাঁহাদের বাহিরে আসিবার আদেশ পর্য্যন্তনাই। যেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা আটজনেরও কম মাত্র লিখিতে পড়িতে জানে সেখানকার লোকদের দুর্ব্যসনে হইতে কেবল ভগবানই—বাঁচাইতে পারেন।

শিকাগোর একদিনের দৃশ্য পাঠকের দৃষ্টিপথে আনিলাম। আশা করি ইহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারিবেন। আমাদের দেশের কোটি কোটি নির্ধন কিরূপে জীবনের দিন অতিবাহিত করে, একবার ভাবিয়া দেখুন। যাহাদিগকে আমরা নীচ জাতি বলি তাহাদিগকে কি ঘৃণার দৃষ্টিতেই না আমরা দেখি? তাহাদের সুখের জন্য আমরা কিই বা চিন্তা করিতেছি। নিজের গৃহ, নিজের নগর, নিজের জীবন যাপনের উপায় প্রভৃতি অন্য দেশের সহিত তুলনা করুন ও বুঝিয়া দেখুন, এ সময়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি?

সত্যদেব

স্বামীসত্যদেবের গ্রন্থ হইতে শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ীর দ্বারা অনূদিত

জাতীয় কবি গোবিন্দদাস

বর্ত্তমান সময়ে কোন কবির কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা বড়ই কঠিন। একটা কথা উঠিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রকারের আলোচনায় একটা বিশ্বজনীন অধিষ্ঠান ভূমি (universal standpoint) নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক এবং সেই ভূমি হইতে আলোচনা করিলেই আলোচনা সঙ্গত হইবে। কবিতার আলোচনায় পৃথিবীর সকল দেশের সকল কবির কাব্য আলোচনা করিলে, কবিতার একটা বিশ্বজনীন সংজ্ঞা পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সেই সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ সহজ নহে। আবার তাহাতে মতভেদও অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে অনেক বিচক্ষণ লোক সমালোচনা করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে, একটা বিশ্বজনীন অধিষ্ঠান-ভূমি আপনা হইতেই আবিষ্কৃত হইবে না। সুতরাং, কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গোবিন্দদাস সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, তিনি বাঙ্গালার একজন উচ্চাঙ্গের জাতীয় কবি। 'জাতীয় কবি' বলিলে কি বুঝিতে হইবে, তাহাই প্রথম আলোচ্য। মানুষের অন্তরতম প্রকৃতি সর্ব্বত্রই একরূপ। মানব-হৃদয়ের চিরন্তন আশা, আকাঙ্খা ও উদ্দীপনা সকল দেশে ও সকল যুগে একরূপ; কিন্তু ইহা মানবের অন্তরতম সনাতন প্রকৃতি। এই প্রকৃতি আত্ম-প্রকাশ করিতেছে—আত্ম-প্রকাশ কবিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। এই সংগ্রাম সকল দেশে ও সকল যুগে একরূপ নহে। এক এক দেশ ও এক এক জাতি, এক এক যুগে কতকগুলি বিশেষ রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়, এবং সেই সমস্যাগুলির মীমাংসা করিতে বাধ্য হয়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির যুগের সমস্যা, আর ঈশ্বরগুপ্তের বা হেমচন্দ্রনবীনচন্দ্রের যুগের সমস্যা, ঠিক একরূপ নহে। একটা যুগের সাধারণ সমস্যা ছাড়া, প্রত্যেক মানুষেরও জীবন কতকগুলি সমস্যার ছায়ায় বেষ্টিত এবং প্রত্যেক মানুষকে সেই সমস্যাগুলির সহিত সংগ্রাম করিয়া, যাহা হউক একটা মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনের এই সংগ্রাম, কেবল মাত্র ব্যক্তিগত নহে, তাহারও একটা নিত্যতা ও সর্ব্বজনীনতা আছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের জীবন-সংগ্রাম, কেবল তাহারই সংগ্রাম নহে,—গভীর ভাবে বুঝিতে পারিলে, বিশ্ব-সংগ্রামের একটি তরঙ্গ মাত্র।

কোন কবি জাতীয় কবি কি না, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, তাঁহার কবিতায় জীবনের যে সমস্যা ও সংগ্রাম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সেই সমস্যা ও সংগ্রাম আমাদের বর্ত্তমান যুগের প্রকৃত জীবনের সাধারণ সমস্যা ও সংগ্রাম কি না, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কবি যে দুঃখে কাঁদিতেছেন, যে জ্বালায় জ্বলিতেছেন—সেই দুঃখ ও জ্বালা, আমাদের সকলের জীবনের দুঃখ ও জ্বালা কি না, তাহা অবধারণ করিতে হইবে মোটামুটি এই লক্ষণ-গুলির দ্বারায় কোন কবি, 'জাতীয় কবি'—এই আখ্যা পাইবার অধিকারী কি না, তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। আমাদের দুঃখ আছে; সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য আমরা চিন্তাও করি, চেষ্টাও করি। সংসার একটি সংগ্রাম-ক্ষেত্র। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়াই মানব-

জীবনের সার্থকতা। 'জাতীয় কবি' তিনি, যিনি ভাবের দিক্ দিয়া মানুষকে এই সংগ্রামে উদ্বোধিত করিতে পারেন; এবং এমন একটা অপার্থিব রস মানব-হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে পারেন, যাহাতে মানুষ নব বলে বলীয়ান্ হইয়া আশায় ও উৎসাহে এই সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে। জাতীয়-জীবনের ইহাই প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কারের দ্বারা, কর্ম্মী তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা, যদি এই কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা বলিব— উঁহারা জাতীয় বৈজ্ঞানিক ও জাতীয় কর্ম্মী। কবির ক্ষেত্র অবশ্য স্বতন্ত্র, তিনি তাঁহার নিজের ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবেন। গীতায় ভাষায়—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন। কিন্তু তাঁহার এই ধর্ম্ম-নিষ্ঠা বা কর্ত্তব্য-পালন জাতির জীবনের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনগুলি যদি সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে 'জাতীয় কবি' বলিতে পারিব না।

কবি কে এবং কবিতা কি? তাহারও একটি সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ছন্দোবদ্ধ বাক্য,—পড়িতে ভাল লাগে—তাহাই কি কবিতা? এই সংজ্ঞায় এখনকার লোকে তুষ্ট হইবে না। কতকগুলি বড় বড়, নীতি কথা-হৃদয়ের কাছে ও কর্ণের কাছে যিনি মিষ্ট করিয়া বলিতে পারেন তিনিই কি কবি?—তাঁহারই রচনা কি কবিতপদবাচ্য? এই সংজ্ঞাতেও বর্ত্তমান যুগ তুষ্ট হইবে না। কবির প্রথম লক্ষণ এই যে, তাঁহার একটা নিজত্ব থাকা চাই। Sainte Beauve বলিয়াছেন—The end and object of every original writer is to express what nobody has expressed, to render what nobody else is able to render ইহার অর্থ—মৌলিকতা না থাকিলে, কেহ সুলেখক হয় না। তাঁহাকে এমন কথা বলিতে হইবে, যাহা আর কেহ বলে নাই। ইহার অর্থ এমন নয় যে, কবি একেবারে নূতন ব্যাপার আবিষ্কার করিবেন—তাহা অসম্ভব। একেবারে খাঁটি নূতন কিছু আছে কি না সন্দেহ। কথাটা এই যে, সত্য করিয়া কবি হইতে হইলে, তাঁহার একটি 'নিজস্ব দর্শন' (personal vision) থাকা চাই। তিনটি জিনিষ—আন্তরিকতা (sincerity), নিজত্ব (personality) ও রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য (style) এই তিনটি গুণ না থাকিলে, কাহাকেও কবি বলা যায় না। আন্তরিকতার অর্থ— সত্য-ভাষণ। সত্যকে আমরা কেহই সম্পূর্ণরূপে পাই নাই। কাজেই, আমরা প্রত্যেক লোকের কাছে, তাহার যেটি সত্য, সেটি সকল সময়ে বলিতে পারি না। কিন্তু আমার সত্য, আমার বলিবার সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। কবির প্রথম কার্য্যই এই He must tell *himself* the truth. কবি একজন শিল্পী—শব্দ তাঁহার উপকরণ। শব্দের সাহায্যে তিনি তাঁহার চিন্তা (thoughts), কল্পনা (emotions), বেদন (sensation) প্রকাশ করিতেছেন। চিত্রকরও শিল্পী—তিনি বর্ণ-বিন্যাসের দ্বারা ঐগুলি প্রকাশ করিতেছেন। গায়কও শিল্পী—তিনি সুর ও ধ্বনির দ্বারা ঐগুলি প্রকাশ করিতেছেন। এখন কথা এই—প্রত্যেক সত্য-শিল্পীকে তাঁহার নিজের চিন্তা, নিজের কল্পনা ও নিজের বেদন প্রকাশ করিতে হইবে। প্রত্যেক শিল্পী হয়ত মনে করেন—তিনি নিজেরই ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তিনি অন্য লোকের ভাব, কল্পনা ও বেদন লইয়া কেবল কারবার করিতেছেন। এই শ্রেণীর লেখকগণকে কবি বলিতে পারিব না। এই প্রকারের

চেষ্টা কেবল শক্তির অপচয় মাত্র। সাহিত্যের মধ্য দিয়া, কোন চিন্তা বা কোন 'দর্শন' (vision) দিতে হইলে, প্রথমেই বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে—ইহা আমার নিজের চিন্তা ও নিজের 'দর্শন' কি না। কবির শক্তি কম হইতে পারে, ভাষার নৈপুণ্য কম থাকিতে পারে, অর্জ্জিত বিদ্যা নাও থাকিতে পারে; কিন্তু এই দর্শন যদি তাঁহার নিজস্ব দর্শন হয়, তাহা হইলে তিনি কবি—সত্যকার কবি।

তাহা হইলে, কবি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, এই ব্যক্তিত্ব ও নিজত্ব (Personality) তাঁহার কতখানি আছে, তাহারই বিচার সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। দেখিতে হইবে, তাঁহার নিজের কিছু সত্য করিয়া বলিবার আছে কিনা। রচনা-শক্তি এই ব্যক্তিত্বের বহিঃ-প্রকাশ (The external mark of personality is Style)।

মৎ-সঙ্কলিত 'মোহন-সুধা' নামক সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছি—'রচনা-ভঙ্গী বা রচনা-রীতি, শব্দ ও পদ-বিন্যাসের একটি কৃত্রিম বিধান মাত্র নহে। কোন বিশিষ্ট লেখকের রচনা-রীতির আলোচনায়, শব্দের ব্যাকরণ-শুদ্ধি বা অলঙ্কারাদির বিশুদ্ধতার হিসাব করিলেই চলিবে না। এই হিসাবের প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্তু উহা গৌণ। সাহিত্যের রচনা-রীতি তাহার সমগ্রতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, লেখকের মানসিক-প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে। একজন প্রতীচ্য পণ্ডিত এই রচনা-রীতিকে organology of writing বলিয়াছেন।

এখনকার দিনে কোন কবির কবিতা আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার রচনা-রীতি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। সাহিত্যের বাজারে বহুকাল হইতে প্রচলিত ভাল ভাল কথা, উপমা প্রভৃতি (Conventional expressions) বহুল পরিমাণে ও নিপুণভাবে ব্যবহার করিয়া, অনেকে সুকবি বলিয়া একদল লোকের নিকট প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত কবি-পদবাচ্য নহেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব কবিগণের ব্যবহৃত শব্দ ও উপমাগুলিকে ছন্দে ও তানে মিলাইয়া একপ্রকারের কবিতা বহুল পরিমাণে রচিত হইতেছে। নানাকারণে, এই কবিতাগুলি আনন্দ বিধান করে। প্রথমতঃ প্রাচীন-কালের প্রিয়বস্তুর প্রতিধ্বনি; দ্বিতীয়ত, ভাষা ও ছন্দের কমনীয়তা, আমাদিগকে মুগ্ধ করে; কিন্তু তাই বলিয়াই কবিতা-রাজ্যে তাঁহাদিগকে উচ্চস্থান দেওয়া যাইবে না। দেখিতে হইবে, ঐ কবিতার মৌলিকতা ও আন্তরিকতা আছে কি না।

কবি ও কবিতার মূল্য নির্দ্ধারণের যে কষ্টিপাথর দেওয়া হইল, তাহা যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহারা কবিহিসাবে গোবিন্দদাসের বিশেষ সমাদর করিবেন। গোবিন্দদাস ইংরাজী লেখাপড়া জানিতেন না, সংস্কৃতও জানিতেন না। বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া যেটুকু জ্ঞানলাভ করা তাঁহার যুগে সম্ভব ছিল, সেই টুকুই তাঁহার সম্বল। কাজেই, ভাণ করিবার নকল করিবার, ও ধার করিবার ক্ষেত্র ও সুবিধা তাঁহার খুব বিস্তৃত ছিল না। অবশ্য, প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতা লইতে তিনি 'চক্রবাক চক্রবাকীর প্রেম,' 'কমল কুমুদের ভাল-বাসা' লইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই প্রণালীতে, অর্থাৎ অপর কবির রচনা হইতে, তিনি কি পরিমাণে ভাল কথা, ভাল উপমা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কবিতাকে কৃত্রিম সাজে সাজাইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। এই

আলোচনায় দেখা যাইবে, তিনি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজের সত্যকার বেদন, অনুভূতি ও দর্শন নহে—এমন কথা তিনি প্রায়ই বলেন নাই। এই আন্তরিকতা ও সত্য-দর্শন, গোবিন্দদাসের বিশিষ্টতা। কৃত্রিম সাহিত্যের এই অতি-বিস্তারের যুগে, এই বিশিষ্টতা কত মূল্যবান, ও বাঞ্ছনীয়, সুধিগণ বিচার করিবেন।

গোবিন্দদাস যেরূপ তীব্রভাষায় দেশের লোককে গালাগালি করিয়াছেন, তেমন তীব্রভাষা এই যুগে অন্য কোন কবি ব্যবহার করেন নাই বা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি,—অনেক ভাললোক নাকি এই কারণে কবি গোবিন্দদাস ও তাঁহার কবিতা পছন্দ করেন না। কিন্তু এই তীব্রভাষা প্রয়োগের মূলে যে জ্বালা রহিয়াছে, সেই জ্বালা যে সত্য—অতিশয় সত্য। সেই জ্বালায় কবি সারাজীবন জ্বলিয়াছেন ও ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন। অনেক দানশীল বড়লোকের আশ্রয় পাইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তিষ্টিতে পারেন নাই। এই গঞ্জনার তাড়নায় পুনঃ পুনঃ নিরালম্ব অবস্থায় দারিদ্র্য সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন। এই জ্বালা দাসত্বের জ্বালা—এই জ্বালা সহায়হীন শক্তিহীনতার জ্বালা। এই জ্বালা যখন সত্য, অন্যের কাছে না হউক, কবির নিজের কাছে যখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য, তখন এই তীব্রতার মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে এবং এই কারণে তিনি প্রকৃত কবি। আর এই জ্বালা যদি আমাদের সকলের জ্বালা হয়, তাহা হইলে তিনি—জাতীয় কবি।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

সে কালের রাইয়ত

(ফরাসী ধনবিজ্ঞানবিৎ পোল লাফার্গ প্রণীত গ্রন্থের এক অধ্যায়)

রাইয়তদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল সে যুগে জমিদারদের হাতে। এই রক্ষণাবেক্ষণের পারিশ্রমিক স্বরূপই জমিদারেরা পাইত কর। "ফিউদ"-প্রথার সমাজে ইহাই প্রত্যেক স্তরের জনগণের পরস্পর সম্বন্ধের গোড়ার কথা।

কিন্তু কালে এই রক্ষণাবেক্ষণের ভার ফিউদারদের হাত হইতে উঠিয়া যায়। তথাপি ইহারা রাইয়তদের নিকট হইতে সাবেক কালের পাওয়ানা ভোগ করিতে থাকে। রাইয়তেরা অনর্থক কর দিতে বাধ্য হইত। রাইয়তে জমিদারে বিরোধ জন্মে।

এই বিরোধের যুগে রাইয়তদের পক্ষে একদল লেখক ফরাসী সমাজে দেখা দেয়। তাহারা "বুর্জোআ" অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যে ধনশালী নবীন অভিজাতদের খয়েরখাঁ। ইহারা জমিদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে। জমিদারদের স্বপক্ষে কলম চালাইবার ভার লয় ফিউদতত্ত্ববিৎ উকীলেরা। ইহারা পুরাণা অভিজাতদের অন্নবস্ত্রে প্রতিপালিত লোক।

"বুর্জোআ"পন্থী আর ফিউদার-পন্থী এই দুই দলের রাষ্ট্রকে বাকবিতণ্ডা চলিয়াছিল বহুকাল। শেষ পর্য্যন্ত ১৭৮৯ সালের বিপ্লবে ফরাসীরা জমিদারদের পাওনাগুলা খারিজ করিয়া দেয়। এই বিপ্লব জমিদারপন্থীদের পরাজয় এবং বুর্জোআ-পন্থীদের বিজয়লাভ ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার ধনদৌলতের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রে ও সমাজে নতুন আর এক প্রকার ধনদৌলতের প্রভাব প্রকটিত হয়।

এই "বুর্জোআ" প্রভাব বিলাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে। হাউস অব কমন্স বা জনসাধারণের ঘর তখন হাউস অব লর্ডস্ বা অভিজাতদের ঘরের সমকক্ষরূপে পার্ল্যামেণ্ট সভায় ইজ্জত পায়। কিন্তু বিলাতী বিপ্লবে ফিউদযুগের দাবীদাওয়াগুলা একদম লুপ্ত হইয়া যায় নাই। জমিদার শ্রেণীর লোকেরা আজও রাইয়তদের নিকট হইতে অনেক কিছু অন্যায় আদায় করিতে অধিকারী। বিলাতে আজকাল জনসাধারণেরই জয়জয়কার চলিতেছে। তাহা সত্ত্বেও এখানে জমিদারদের বিশেষ অধিকার দেখা যায়। এ এক বিচিত্র দৃশ্য, বর্ত্তমান জগতেও মান্ধাতার আমলের জের !

বুর্জোআ ধনবিজ্ঞানবিদেরা ফিউদযুগটাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে অভ্যস্ত, *কিন্তু এইরূপ গালাগালিতে না মাতিয়া মধ্যযুগের জমিদারি প্রথাটার ভিতরকার কথা বুঝিতে* চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

জমিদারেরা রাইয়তদের নিকট নানা বাবদে নানা প্রকার আদায় ভোগ করিতে অভ্যস্ত। রাইয়তদের মুরুব্বি সাজিয়া বুর্জোআ পণ্ডিতেরা এই আদায়গুলার নাম শুনিবামাত্র জুলুমের মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে দেখে। কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে জানিতে পারা যায় যে জমিদারদের এই সকল আয় কালে জোর জবরদস্তি এবং অত্যাচারের আদায়রূপে দেখা দিয়াছিল সত্য। কিন্তু এইগুলার উৎপত্তি কালে রাইয়তরা স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবেই ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত ছিল। রাইয়তদের নিকট হইতে জমিদাররা যা কিছু পাইত সবই "অস্থাবর" শ্রেণীর ফিউদ সম্পত্তির অন্তর্গত।

সকল জমিদারই রাজা বাদশা বা অন্য কোনো বিজেতার সমরপ্রতিনিধিরূপে উৎপন্ন হয় নাই। অনেকে পল্লীবাসী, পল্লীর একজন, পল্লী-মোড়ল মাত্র ছিল। তাহার সঙ্গে অন্যান্য পল্লীবাসীর সম্বন্ধ ছিল সমানে সমানে। জমিজমার ভাগবাটোআরা চাষ আবাদ সম্বন্ধে এই পল্লী-মোড়ল জমিদার তাহার জাতভায়াদের বিধান মানিয়াই চলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত ইতরজনেরা তাহার জমি চষিয়া দিত। কিন্তু তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাহা হইলে সে চব্বিশ ঘণ্টা পল্লীবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণে কাটাইবার সুযোগ পাইত।

হাক্সৎহাউজেন বলেন রুশিয়ায় "মির" (পল্লী সমবায়) এর এলাকার তৃতীয় বা চতুর্থ অংশ জমিন পল্লীমোড়লের (জমিদারের) প্রাপ্য। লাক্রয় দ্যু মেলিয়ঁ ১৮২৫ সালে প্রকাশিত "দ্রু দ্রোআ দে কমুন স্যির লে বিআঁ কমুনো" (চৌথ সম্পত্তিতে জনগণের অধিকার) নামক গ্রন্থে ফরাসী পল্লী-মোড়ল বা জমিদারদের হিস্সা বিবৃত করিয়াছেন। দেখা যায় যে, চাষীরা যদি "বাবুর" বনভূমিতেও চৌথ অধিকার ভোগ করে, তাহা হইলে